মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

অগ্নিশপথ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

মাসুদ রানা

অগ্নিশপথ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7203-0

অগ্নিশপথ-১ : ৫–১০৮
অগ্নিশপথ-২ : ১০৯–২০৮

অগ্নিশপথ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

অক্টোবর শুরুই হয়েছে এবার প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস আর অসম্ভবরকম ভারী তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে পঁয়তাল্লিশ। গত তিনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি মস্কোবাসীর। সারাক্ষণ আকাশ ঢেকে রেখেছে খয়েরি রঙের মেঘ, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে, যেন বিশেষ জরুরী কোন কাজ পড়ে আছে কোথাও।

দেখলে বুক কেঁপে ওঠে অজানা আশঙ্কায়। মস্কো ঢাকা পড়ে গেছে পুরু, কঠিন বরফের আবরণে। অনেক কষ্টে শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো কোনমতে গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাখা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের দৈত্যাকার পবেদা সারফেস আইস কাটার ট্রাক বহরকে এ কাজে সহায়তা করার জন্যে মিলিশিয়া বাহিনী তলব করা হয়েছে। পুরোটা নয়, পথের মাঝখানটা কোনরকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলার মত পরিষ্কার রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে তারা।

মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি এবং পবেদার শক্তিশালী মোটরের বিরতিহীন গোঙানি মস্কোবাসীর আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। রেডিও-টিভি পনেরো মিনিট পর পর হুঁশিয়ারি সঙ্কেত প্রচার করে চলেছে। বলা হচ্ছে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। এক দশক আগে, উনিশশো সত্তরে একবার ঠিক এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল। কয়েকশো মানুষ প্রাণ হারায় সেবার প্রচণ্ড শীতে।

শহরের প্রতিটি মানুষ আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কিত, একজন বাদে। এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সে মোটেই। তার নাম ওলেগ, ওলেগ ভ্লাদিমিরোভিচ পেঙ্কোভস্কি। ম্যাক্সিম গোর্কি এমব্যাঙ্কমেন্টের এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সাত তলায় থাকে সে। ইহুদী। সোভিয়েত চীফ ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরটের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক ডেপুটি চীফ অভ দ্য ফরেন সেকশনে চাকরি করে। সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

মাঝারি উচ্চতার মানুষ ওলেগ পেঙ্কোভস্কি। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়। আট ইঞ্চি কপাল। টাকের গুণে ওরকম অস্বাভাবিক আকার পেয়েছে কপালটা। আরও একটা পরিচয় অবশ্য আছে তার, তবে সেটা খুবই গোপনীয়–অন্তত পেঙ্কোভস্কির সেরকমই ধারণা।

দুই রুমের ছোট্ট ফ্ল্যাটের বেডরুমে নিজের পড়ার টেবিলের সামনে বসে আছে ওলেগ চুপ করে। টেবিলের ওপর একগাদা টাইপ করা কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। ওগুলোর দিকে চেয়ে আছে অপলক। একটু পর উঠল সে।

অফিসের ধড়াচূড়া বদলে ফেলল। খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেতে হবে। গরম এক মগ কফিও পেটে ঢালতে হবে, তারপর কাজে লাগবে সে। কিচেনে এসে আলো জ্বালল ওলেগ, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডিম-পাঁউরুটি নিয়ে।

গত কদিন ধরে একাই আছে সে। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে স্ত্রী গেছে সেরপুখেভ–বাপের বাড়ি। সামনে ভাল একটা সুযোগ আসতে পারে, এই আশায় দিন দশেক আগে জোর করেই তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে ওলেগ। কারণ গোপন কাজের কোন সাক্ষী রাখতে নেই, জানে সে।

আধা ঘণ্টা পর কাজে লেগে পড়ল ওলেগ। দুহাতে দস্তানা পরে একটা মিনিয়েচার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল টেবিলের ওপরকার কাগজগুলোর। অনেকগুলো কাগজ, হাত চলছে তার মেশিনের মত। এ মুহূর্তে খানিকটা উত্তেজিত সে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

ছবিগুলো জায়গামত পৌঁছলে কী ভয়ঙ্কর তোলপাড় ঘটবে ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে তার সারা দেহ। এ নিয়ে আলোচনার জন্যে কর্তারা যখন বৈঠকে বসবেন তখন তার মর্যাদা কোথায় গিয়ে ঠেকবে কল্পনা করতে গিয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠছে পেঙ্কোভস্কির।

সামনের প্রতিটি কাগজ ঠাসা রয়েছে 'টপ সিক্রেট' তথ্যে। যার একটিও যদি কোনরকমে ফাঁস হয়ে যায়, নতুন করে আরেকবার বেকায়দায় পড়বে মস্কো এবং মধ্যপ্রাচ্যে তার বন্ধু ভাবাপন্ন মুসলমান দেশগুলো। এ পর্যন্ত তাদের কাকে কি সামরিক সহায়তা দিয়েছে মস্কো এবং অদূর ভবিষ্যতে দিতে যাচ্ছে, তার পুরো বিবরণ আছে এতে।

ওয়ারশ জোটের প্রধানের অবগতির জন্যে তথ্যগুলো প্রয়োজন। অসুস্থতার কারণে তালিকাটা তৈরি করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বস্ ওলেগের ওপর। কাজটা শেষ করতে তার পুরো আটদিন লেগেছে। কি করে তালিকাটার একটা কপি জোগাড় করা যায় তা নিয়ে দায়িত্ব পাওয়ার দিন থেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করে দেয় পেঙ্কোভস্কি। সুযোগটা আজ হঠাৎ করেই পাওয়া গেল।

আজ অফিসে গিয়ে জানতে পারে সে যে তার বস্ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হার্টের অসুখ। সপ্তাহখানেকের জন্যে ছুটি নিয়েছেন। তিনি কাজে যোগ না দেয়া পর্যন্ত এগোবে না এ ফাইল। অতএব সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ফেলল ওলেগ বুদ্ধিমানের মত। বেচারা জানে না যে প্ল্যান করেই সুযোগটা সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্যে। গত কয়েক মাস ধরে তার ওপর নজর রাখছে কেজিবি, সে ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না তার।

অফিস শেষে ক্রেমলিনের প্রত্যেককে যার যার ফাইলপত্র নিজের জন্যে বরাদ্দ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত ক্যাবিনেটে তুলে রেখে আসতে হয়। রোজকার মত ওলেগও তাই-ই করেছে আজ। অন্য সব ফাইলের সঙ্গে এই বিশেষ ফাইলটাও তুলে রেখে এসেছে। তবে ওটা ছিল শুধুই ফাইল কভার, ভেতরের সব কাগজ আগেই বের করে রেখেছিল সে।

কাল রোববার, সাপ্তাহিক ছুটি। পরশু অফিসে গিয়েই কাগজগুলো শূন্য কভারে ভরে ফেলবে ওলেগ কেউ কিছু টের পাওয়ার আগে। আরও অনেকবার

একই কায়দায় কাজ সেরেছে সে, অসুবিধে হয়নি কখনও।

জিরিয়ে নেয়ার জন্যে একটু থামল পেঙ্কোভস্কি। উল্টে-পাল্টে দেখল আর মোটে গোটা বিশেক স্ন্যাপ নিতে পারলেই কাজ শেষ। ক্যামেরা রেখে দস্তানা খুলল সে। কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে দুহাতের আঙুল ফোটাতে লাগল। থেকে থেকেই হাসি ফুটছে তার মুখে। কি হবে? ভাবছে সে, এগুলো জায়গামত পৌঁছুলে ঠিক কি ঘটবে? নিশ্চয়ই আনন্দের ঢেউ বয়ে যাবে তে···।

বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাতের আওয়াজে প্রায় লাফিয়েই উঠল আনমনা ওলেগ পেঙ্কোভস্কি। হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাত পড়ল যেন বুকের খাঁচায়। পলকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। কলে পড়া ইঁদুরের মত দিশেহারা অবস্থা হল তার। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। আবার আওয়াজ উঠল দরজায়, সেই সঙ্গে একটা সুরেলা নারীকণ্ঠ কানে এল।

'ওলেগ! দরজাটা খুলুন।'

ফ্যাকাসে মুখে রঙ ফিরে এল পেঙ্কোভস্কির। সশব্দে বুকে আটকে থাকা বাতাস ছাড়ল সে। সামনের ফ্ল্যাটের ভেরা দিমিত্রিয়েভনার গলা ওটা। মেয়েটি অল্পবয়সী, বিধবা। ক্রেমলিনের অনুবাদ সেলের উঁচু পদে চাকরি করে। কিন্তু কি চাই ওর আমার কাছে? ভাবতে ভাবতে দ্রুত সামনের রুমে চলে এল সে। ভারী একটা টেবিল দিয়ে দরজা চাপা দিয়ে রেখেছিল কাজ শুরু করার আগে, ওটায় ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকল পেঙ্কোভস্কি। ও ঘরের হিটারের উত্তাপ এ ঘরে তেমন আসছে না। ভীষণ ঠাণ্ডা এখানে।

'ব্যাপার কি, ভেরা?'

'ইয়ে, আপনার কাছে পঞ্চাশ রুবল ভাংতি হবে? খুচরো একদম নেই, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে পারছি না।'

'ও, দাঁড়ান। দেখছি,' বলল সে। সেই সঙ্গে খানিকটা বিস্মিতও হল। একই গাড়িতে অফিস থেকে ফিরেছে তারা ঘণ্টা দুয়েক আগে। এসেই আবার কোথায় গিয়েছিল ভেরা এই আবহাওয়ায়? চিন্তাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না মনে। দুহাতে টেবিলটা উঁচু করে নিঃশব্দে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে রাখল পেঙ্কোভস্কি। ছিটকিনি নামিয়ে হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হল দরজাটা। এ ধরনের আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। নাক-মুখ আর চওড়া কপালে দরজার জোরাল আঘাত খেয়ে রুমের মাঝামাঝি পর্যন্ত উড়ে গেল পেঙ্কোভস্কি। হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল দড়াম করে, থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো ফ্লোর।

ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল বিশালদেহী ছয় ব্যক্তি। সবার পরনে পুরু অস্ত্রাখান গ্রেট কোট, গলায় মাফলার। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসতে গেল ওলেগ পেঙ্কোভস্কি, চট্ করে দুপা এগিয়ে এল একজন, অনেকটা ফুটবলে কিক্ করার মত করে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল তার চোয়ালে।

'ঠকাশ্' শব্দে তার মাথাটা ফ্লোরে আঘাত করল। খোলা মুখের ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল সাদামত কি যেন একটা। জ্ঞান হারাল ওলেগ

পেঙ্কোভস্কি। কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা, তারপর কাছে গিয়ে সাদামত জিনিসটা তুলে নিল। একটা নকল দাঁত ওটা, মাড়ির।

ওদিকে খোলা দরজার সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ভেরা দিমিত্রিয়েভনা। দুচোখ কপালে উঠে গেছে। সুন্দর মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে। এতবড় কাণ্ডটা ঘটে যেতে পুরো এক সেকেন্ড সময়ও লাগেনি মনে হয়। পেঙ্কোভস্কিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, দেখতে পাচ্ছে না তাকে ভেরা।

যে লোকটি লাথি মেরেছিল ওলেগকে, ঝুঁকে মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে নিতে দেখল সে তাকে। জিনিসটা রুমালে পেঁচিয়ে পকেটে ভরল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণে করিডরে দাঁড়ানো ভেরার ওপর চোখ পড়ল তার।

নিচু গলায় সঙ্গীদের কিছু বলল সে, তারপর হাসিমুখে ভেরার সামনে এসে দাঁড়াল। 'সহযোগিতার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কমরেড ভেরা দিমিত্রিয়েভনা,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল লোকটা। 'এবার আপনি ঘরে যেতে পারেন।'

কিছু বলার জন্যে কয়েকবার মুখ খুলেও গলায় স্বর ফোটাতে ব্যর্থ হল মেয়েটি। সাহস হল না।

'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কমরেড,' আবার মুখ খুলল লোকটা। 'শুনুন, কমরেড, এই লোকটা বিদেশী স্পাই। দেশের শত্রু। আমাদের উপস্থিতি টের পেলে ও হয়ত আত্মহত্যা করত, সে জন্যেই আপনার সহায়তা নিতে হল।' একটু বিরতি দিয়ে বলল সে, 'আশা করি কৌতূহল মিটেছে আপনার? যান, ঘরে যান।'

কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল ভেরা দিমিত্রিয়েভনা। বিদেশী স্পাই? ওলেগ পেঙ্কোভস্কি? ওহ্, গড! বলে কি! বুকের ভেতর ধড়াশ্ ধড়াশ্ করে লাফাচ্ছে কলজে। নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে চাইল ভেরা। এখনও এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা একভাবে। মুখটা কঠিন। ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠল ভেরা। দ্রুত ভেতরে ঢুকে লাগিয়ে দিল দরজা।

তবে জায়গা ছেড়ে নড়ল না সে। ওখানেই কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলোর কথাবার্তা শোনা যায় কি না, সেই আশায়। কিন্তু শোনা গেল না। ওলেগের ফ্ল্যাটের দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেছে সশব্দে।

যে ভেরার সঙ্গে কথা বলছিল, সে কেজিবি-র একজন লেইটেনেন্ট পলকভনিক বা লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ক্রাইলভ। ভ্যাসিলি ইভানোভিচ ক্রাইলভ। দরজা বন্ধ করে ওলেগের বেডরুমে এসে দাঁড়াল সে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল টেবিলে স্তূপ হয়ে থাকা কাগজ আর মিনিয়েচার ক্যামেরাটার দিকে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্রেট কোটের পকেট থেকে পলিথিন ব্যাগ বের করল সে। সব ভরল ওতে ধীরেসুস্থে। ওদিকে সামনের রুমে তার সঙ্গীরা জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে পেঙ্কোভস্কির। পাঁচ মিনিট পর তাকে নিয়ে রওনা হয়ে

গেল দলটা।

বাইরে তখন আরও বেড়ে গেছে তুষারপাত।

দযেরঝিনস্কি স্কয়ার। বিস্তৃত শান বাঁধানো স্কয়ারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক খেলনার দোকান। দেতস্কি মির-শিশুদের ভুবন। দুনিয়াতে যত রকম খেলনা তৈরি হয়, তার সবই পাওয়া যায় দেতস্কি মিরে। সে যে দেশেরই হোক। চোরাপথে সবই আসে।

দেতস্কি মিরের উল্টোদিকে কালো গ্র্যানিট পাথরের আরেক প্রকাণ্ড ভবন-লুবিয়াঙ্কা। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-র হেডকোয়ার্টারস। অনেক ঐতিহ্যবাহী পুরানো বিল্ডিং। দোতলা। কিন্তু বাইরে থেকে উচ্চতা দেখলে মনে হবে বুঝি পাঁচ-ছয়তলা। লুবিয়াঙ্কার খোলা ছাতের চার কোণে চারটে মেশিনগান পোস্ট। প্রতিটি পোস্টে দুজন করে গার্ড, চব্বিশ ঘণ্টা স্কয়ারের ওপর শ্যেনদৃষ্টি লেপটে থাকে তাদের।

ওর নিচতলায় খুদে এক ইন্টারোগেশন সেলে চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে ওলেগ ভ্লাদিমিরোভিচ পেস্কোভস্কি। তার কপালের ইঞ্চি তিনেক তফাতে লম্বা তারের মাথায় ঝুলছে কড়া পাওয়ারের শেডওয়ালা একটা বাল্‌ব্। শেডের ভেতরে বসানো বিল্ট-ইন কনডেন্সার মাইক্রোফোন। আলোর উত্তাপে থুতনি পর্যন্ত গরম হয়ে আছে পেস্কোভস্কির।

তার সামনে লম্বা একটা কাঠের টেবিল। ওপাশে মূর্তির মত বসে আছে কর্নেল ক্রাইলভ এবং কেজিবি-র আরও তিন অফিসার। কিছুক্ষণ পর পরই উঁচু ছাতওয়ালা ছোট রুমটা গমগম করে উঠছে ক্রাইলভের কণ্ঠস্বরে।

'মুখ খুলুন, কমরেড। বলে ফেলুন কাদের হয়ে কাজ করছেন আপনি। আমাকে আরও কঠোর হতে বাধ্য করবেন না দয়া করে। বলে ফেলুন সব। তাতে আপনিও বাঁচবেন, আমরাও রেহাই পাব।'

ঘামে জব জব করছে পেস্কোভস্কির বড়সড় মুখটা। বিকৃত হয়ে আছে বিশ্রীভাবে। ঠোঁট সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে। বিস্ফারিত চোখে দাঁত কামড়ে ধরে বসে আছে সে শক্ত হয়ে। এখানে ধরে আনার পর পরই দুটো ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে ওলেগের দেহে। প্রথমটা কড়া ঘুমের ওষুধের সঙ্গে সমপরিমাণ ট্রুথ সেরাম-ফুল ডোজ। দ্বিতীয়টা লোকাল অ্যানেসথেটিক, পুশ করা হয়েছে চোখের পাতায়। সেই থেকে একটু ঘুমের জন্যে নিঃশব্দে আর্তনাদ করে চলেছে ওলেগের মস্তিষ্ক, দেহের প্রতিটি পেশী। একই সঙ্গে, তার চাইতেও বহুগুণ বেশি ভোগাচ্ছে তাকে ট্রুথ সেরাম। ভীষণরকম চুলকাচ্ছে দেহের যেখানে-সেখানে। কিন্তু হাত বাঁধা বলে তারও কোন বিহিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ওদিকে আলোর অসহনীয় অত্যাচার থেকে চোখ দুটোকে যে রক্ষা করবে, দু-দণ্ড চোখ বুজে থাকবে, সে পথও রাখেনি লোকাল অ্যানেসথেশিয়া। পুশ করার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে টায়ার হয়ে গেছে চোখের পাতা। বহু চেষ্টা করেছে ওলেগ পেস্কোভস্কি, নড়ে না একচুলও। আপনাআপনি বিস্ফারিত হয়ে আছে।

এত কিছু পরেও লাভ হয়নি। মুখ খোলার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না ক্রাইলভ তার মধ্যে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বসে আছে ওলেগ। ওপাশে বসা লোকগুলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না সে। বাল্‌বের শেডটা সামান্য কাত করে বসানো, যে কারণে তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারছে না আলো।

তবে চারটে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছে সে। একটা না একটা জ্বলছেই সর্বক্ষণ। বিরতিহীন সিগারেট টানছে লোকগুলো। ধোঁয়ায় ভরে গেছে সেল। ওলেগ অধূমপায়ী। এ-ও আরেক অত্যাচার তার জন্যে।

রাত বারোটার দিকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ভ্যাসিলি ইভানোভিচের। প্রথম ইঞ্জেকশনটা আরেক ডোজ পুশ করল সে পেস্কোভস্কির দেহে। সেই সঙ্গে খুলে নিল তার জামা কাপড়। পুরোপুরি উলঙ্গ এখন লোকটা। গায়ে একটা সুতোও নেই। নতুন একটা আইডিয়া এসেছে কর্নেলের মাথায় হঠাৎ করেই, পরখ করে দেখতে চায়।

পন্থাটা কোন এক সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানীর-ই আবিষ্কার। যত আত্মবিশ্বাসী আর কঠিন মানুষই হোক না কেন, বাগে আনতে না পারলে গা থেকে কাপড়-চোপড় খুলে নাও। দেখবে মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেছে তার আত্মবিশ্বাস। একটি ছোট্ট শিশুর মতই নিজেকে অসহায় মনে হবে তার। নিজের ভেতরে ইচ্ছেশক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

'বলে ফেলুন, কমরেড ভ্লাদিমিরোভিচ। অনর্থক আর কত কষ্ট দেবেন নিজেকে? একবার ভাবুন তো, যাদের হয়ে আপনি কাজ করেছেন এতদিন তারা কি আপনার এই চরম বিপদে কোন সাহায্য করতে পারছে? কী অমানুষিক কষ্টই না পাচ্ছেন সেই সন্ধে থেকে। কোন অর্থ হয় এসবের? কেন যে আপনি...'

পেস্কোভস্কির চোখের মণি ঘন ঘন এদিক ওদিক করছে। মনে হল কাউকে খুঁজছে সে। ঠোঁটজোড়াও নড়ে উঠল। তাই দেখে নীরব উল্লাসে ফেটে পড়ল ক্রাইলভ। 'কিছু বলবেন, কমরেড?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা দোলাল পেস্কোভস্কি, বলবে।

'বলুন, বলুন,' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে পলকভনিক ক্রাইলভ। সদ্য ধরানো সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দিল। 'একটু জোরে বলবেন, কমরেড, কেমন?' মনে মনে কষে গালমন্দ করছে সে নিজেকে। ইশ্‌শ্, কেন যে আরও আগেই ন্যাংটো করলাম না হারামজাদাকে! মিছেমিছি এত কষ্ট করলাম।

সে যা ভাবছে; মনোবিজ্ঞান ফনোবিজ্ঞান কিছুই নয়। আসলে দ্বিতীয় দফা ইঞ্জেকশনটা পড়ামাত্র ঘুম ঘুম ভাব আর চুলকানির সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন এক যন্ত্রণা। অদ্ভুত এক জ্বালা-পোড়া শুরু হয়ে গেছে চামড়ার নিচে। মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে যেন সারাদেহে। দেখতে দেখতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে তা।

এখানে আসার পথে গাড়িতেই আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল ওলেগ।

কিন্তু জিভের ডগা দিয়ে ছুঁতে গিয়ে দেখে দাঁতটা নেই জায়গামত, ওখানটা ফাঁকা। ওর মধ্যে ছিল পটাশিয়াম সায়ানাইড। আজকের এই আশঙ্কার কথা ভেবেই তার নিয়োগকর্তারা ওখানে নকল দাঁতটা বসিয়ে দিয়েছিল আসলটা উপড়ে ফেলে। কেমন করে যে ওটা স্থানচ্যুত হল তা নিয়ে কম মাথা ঘামায়নি ওলেগ এতকিছুর মধ্যেও। মুখ খোলার আগে দাঁতটার কথা আরেকবার স্মরণ করল পেঙ্কোভস্কি। রাগে, দুঃখে আর অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে পানি এসে গেল। কেঁদে ফেলল সে ভেউ ভেউ করে।

কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকল ক্রাইলভ অপলক চোখে। আস্তে আস্তে বসে পড়ল। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল তৃপ্তির সঙ্গে। পুরো আধঘণ্টা বুক ভাসাল পেঙ্কোভস্কি, তারপর শান্ত হল। এবার ক্রাইলভের ইঙ্গিতে অন্য এক অফিসার আসন ছাড়ল। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল সে ওলেগের। দুটো পুরু কম্বল দিয়ে মুড়ে দিল তার ঠাণ্ডায় অসাড় দেহ। আগুনের মত গরম এক মগ কফিও খেতে দেয়া হল। অবশেষে মুখ খুলল পেঙ্কোভস্কি, ঘড়িতে তখন বাজে কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটো।

একটা একটা করে প্রশ্ন করে চলল ক্রাইলভ। প্রতিটির উত্তর দিতে লাগল সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে। স্বীকার করল পেঙ্কোভস্কি যে সে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের মস্কো এআইপি (এজেন্ট-ইন-প্লেস)। হ্যাঁ, মস্কোয় আরও সাতজন মোসাদ এজেন্ট আছে।

তাদের তিনজন ক্রেমলিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-অসামরিক শাখায় চাকরি করে। একজন বিমান সংস্থা অ্যারোফ্লোটের পাইলট, একজন ভয়টোভিসা উলিসায় এক কাফের মালিক। বাকি দুজনের একজন লিটারেচারনায়া গেজেটা পত্রিকায় এবং অন্যজন সংবাদ সংস্থা 'তাস'-এ চাকরি করে।

'আর কেউ?' প্রত্যেকের নাম-ধাম লিখে নিয়েছে লেইটেনেন্ট পলকভনিক।

দু'পা চেয়ারের ওপর তুলে কম্বল দুটো আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসল ওলেগ। 'না।'

'আপনি যা যা বললেন, তার এক বর্ণও যদি মিথ্যে হয়, আপনার অবস্থা কি হবে বুঝতে পারছেন, কমরেড?'

বিকারগ্রস্তের মত ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগল সে। 'পারছি।'

'অলরাইট।' ছোট নোটপ্যাডটা গ্রেট কোটের পকেটে চালান করে দিল ভ্যাসিলি ক্রাইলভ। কাঠ পেন্সিলটা গুঁজে রাখল কান আর খুলির ফাঁকে। তারপর আসন ছাড়ল। অন্য তিনজনের উদ্দেশে নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

এর আধ ঘণ্টা পর, তিনটের দিকে মস্কোর এখানে-ওখানে শুরু হল কেজিবি-র 'হান্ট অপারেশন'। আচমকা। ক্রাইলভের নেতৃত্বে ত্রিশজন কেজিবি অফিসার পথে নামল, কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে একেক ঠিকানায় গিয়ে চড়াও হল। চার মোসাড এজেন্ট ধরা পড়ল। ঘুমের রেশ পুরোপুরি কাটার

আগেই হাতকড়া পড়ল তাদের হাতে।

প্রত্যেকের দাঁতের ফাঁকে একটা করে মোটা কাঠের টুকরো গোঁজের মত ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলা হল। যাতে কেউ দুই সারি দাঁত এক করতে না পারে, কামড় দিতে না পারে। পেঙ্কোভস্কির নকল দাঁতটির কথা ভেবে সঙ্গে পর্যাপ্ত গোঁজ নিয়েই বেরিয়েছিল তারা ক্রাইলভের নির্দেশে। অন্য তিনজন পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাল। মাত্র চল্লিশ মিনিটের মাথায় নির্মূল হয়ে গেল মোসাদের মস্কো সেল। এই সেল প্রতিষ্ঠা করতে তেল আবিবের দীর্ঘ এগারো বছর লেগেছিল।

আরাম হারাম হয়ে গেছে পলকভনিক ভ্যাসিলি ক্রাইলভের। ধরে আনা চার স্পাইকে নিয়ে আবার পড়ল সে। তাদের পেট থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য বের করে ছাড়ল একই কায়দায়। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হয়ে নিল যে মোসাড এজেন্টের সংখ্যা সম্পর্কে পেঙ্কোভস্কি সত্যি কথাই বলেছে।

চারদিন পর যথারীতি মামলা উঠল সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্টে। বাদীঃ রাষ্ট্র, বিবাদীঃ ওলেগ ভ্লাদিমিরোভিচ পেঙ্কোভস্কি গং। জনাকীর্ণ কোর্ট ভবনে পুরো ছদিন ধরে মামলার শুনানি চলল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হল, গত কয়েক বছর ধরে এই দলটি নিয়মিতভাবে দেশের অত্যন্ত গোপনীয় ও মূল্যবান তথ্য, রিপোর্ট এবং দলিলপত্র তেল আবিবে পাচার করে আসছে।

যার সবগুলোই নতুন নতুন সোভিয়েত সমরাস্ত্র, যেমন বিমান মিসাইল ডুবোজাহাজ ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তো বটেই, তার বন্ধু ভাবাপন্ন বেশ কয়েকটি দেশও অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে। হুমকির সম্মুখীন হয়েছে সবার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আইন অনুযায়ী পেঙ্কোভস্কি গঙের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে সরকারের তরফ থেকে ঝানু আইনজীবীদের নিয়োগ করা হল। কিন্তু করার মত তেমন কিছু ছিল না তাদের আসলে। দলটির বিরুদ্ধে ক্রাইলভের সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ এতই অকাট্য ও নিরেট যে শেষ পর্যন্ত ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার মত হয়ে গেল ব্যাপারটা।

বিচারকরা সর্বসম্মতিক্রমে সবাইকে অপরাধী ঘোষণা করলেন। এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড ফায়ারিঙ স্কোয়াডে কার্যকর করার পক্ষে রায় দেয়া হল। নির্ধারিত দিনে চারজনের দণ্ড কার্যকর করা হল। একজন প্রাণে বেঁচে গেল। সে ওলেগ পেঙ্কোভস্কি। বিচার চলার সময়ই তার আচার-আচরণে খানিকটা অসংলগ্নতা দেখা গিয়েছিল। বাড়তে বাড়তে হঠাৎ করে তা সীমা ছাড়িয়ে গেল। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল লোকটা।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হল মেডিকেল বোর্ড সত্যিই পাগল হয়ে গেছে ওলেগ ভ্লাদিমিরোভিচ পেঙ্কোভস্কি। মৃত্যুদণ্ড রদ করে সুদূর উরালের এক পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেয়া হল তাকে।

ওদিকে আদালতের রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর ইহুদী মহলে দেখা দিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। দলে দলে রাস্তায় নেমে পড়ল তারা। প্রথম প্রথম কয়েকদিন সরকারী সম্পত্তির বেশ কিছু ক্ষতিও করল। তবে খুব একটা সুবিধে হল না, কঠোর হাতে তাদের দমন করল কর্তৃপক্ষ। ফলে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ

প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল ইহুদীদের।

কিন্তু তাই বলে থেমে থাকল না তারা। ভেতরে ভেতরে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হতে লাগল। জালের গোড়া বাঁধা থাকল তেল আবিবে।

দুই

রামাত আবিব। তেল আবিব। চারদিক লাল টাইল মোড়া একটি পুরানো একতলা ভবন। ছাতে সাদার ওপর ছয় কোণ বিশিষ্ট নক্ষত্র এবং তার ওপরে-নিচে চওড়া স্ট্রাইপওয়ালা ইসরায়েলি পতাকা উড়ছে। দুলছে জোর বাতাসে। ভবনটি প্রধানমন্ত্রী মেনহ্যাম বেগিনের অফিস।

মেইন গেটের দুদিকে দুটো এবং সীমানা দেয়ালের চার কোণ ঘেঁষে আরও চারটে গার্ড পোস্ট। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডজন দুয়েক গার্ড কাঁধে ঝোলানো দেশে তৈরি উজি সাবমেশিনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে ভবনটি সদা সতর্ক। ভেতরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস রুমটা প্রকাণ্ড। চারদিকে বিলাসের ছড়াছড়ি। তাঁর টেবিলে টেলিফোন-ই রয়েছে গণ্ডা চারেক। একেকটি একেক রঙের সেট। দেয়ালে পাশাপাশি দুটো প্রকাণ্ড পোর্ট্রেট-ইসরায়েলের দুই প্রতিষ্ঠাতার তেলছবি। একটি থিওডর হেরযল অন্যটি চাইম ওয়েইজম্যানের।

এ মুহূর্তে ভেতরে রয়েছে তিনজন। প্রধানমন্ত্রী বেগিন, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থা বা মোসাড প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) দান শমরন এবং সংস্থার মস্কো বিষয়ক উপদেষ্টা, ইয়েরুচাম আমিতাই। রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে।

অনুচ্চস্বরে একনাগাড়ে কথা বলে চলেছেন দান শমরন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন মেনহ্যাম বেগিন। শমরন ছয় ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা, পাশেও তেমনি। বিশালদেহী। মেদহীন চমৎকার ফিগার। লেডিকিলার চেহারা। হালকা নীল দুচোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। দশ মিনিট পর থামলেন তিনি। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। গভীর চিন্তায় মগ্ন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পিছনের দেয়ালে ঝোলানো মিউজিক্যাল দেয়াল ঘড়িটা বেজে উঠল। সকাল সাড়ে এগারোটা। প্রতি পনেরো মিনিট পর পর বাজায় ওটার চাইম কন্ট্রোল।

'সফল হওয়ার সম্ভাবনা কত ভাগ?' হঠাৎ করেই প্রশ্নটা ছুঁড়লেন মেনহ্যাম বেগিন। গম্ভীর।

'একশো ভাগ।' গম্ভীর দান শমরনও।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তাঁর পাশে বসা ইয়েরুচাম আমিতাই। অনেকটা অন্যমনস্কের মত প্রতিধ্বনি তুললেন। 'একশো ভাগ।'

পালা করে দুজনের দিকে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী। তাই যদি হয়, ভাবলেন তিনি, তাহলে শুরু করে দেয়া যেতে পারে। কেসেটের প্রতিটি সদস্যের; কি

সরকারী, কি বিরোধীদলীয়, গভীর আস্থা আছে দান শমরনের ওপর। আছে অগাধ বিশ্বাস। আগেও ইসরায়েলের বহু ক্রান্তিলগ্নে বহু কঠিন কঠিন দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করেছেন দান শমরন। যার মধ্যে ১৯৭৬ সালে এন্টেবি এয়ারপোর্টে ইসরায়েলি কম্যান্ডো হামলা অন্যতম। দান শমরনই ছিলেন সে অভিযানের পরিকল্পনাকারী এবং প্যারাট্রুপ কম্যান্ডার। পৃথিবী জানে সে ইতিহাস।

তবে সেবার যেমন নেসেট সর্বসম্মত অনুমতি দেয়ার পনেরো মিনিট আগেই গোপনে উগাণ্ডার উদ্দেশে ইসরায়েলের মাটি ত্যাগ করেছিলেন দান শমরন, এবারও তেমন কিছু একটা করতে হবে। বাধা আসার কোন সম্ভাবনা নেই যদিও, তবু, জাস্ট সাবধানতা আর কি! বলা তো যায় না! কি যেন নাম ছিল সে অভিযানের? হ্যাঁ, 'অপারেশন থাণ্ডারবোল্ট'।

আরেকটা ব্যাপার মনে পড়তে হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৬ সালে তিনি ছিলেন বিরোধী দলের প্রধান। প্যারাট্রুপারদের নিয়ে যে দান শমরন রওনা হয়ে গেছেন, তাঁকে পর্যন্ত ব্যাপারটা জানতে দেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, র‍্যাবিন। ভোটে যখন 'অপারেশন থাণ্ডারবোল্ট' সর্বসম্মত রায় পায়, শমরন তখন দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছেন লোহিত সাগরে।

ভেতরে ভেতরে সন্তুষ্টি বোধ করছেন বেগিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের দেশটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। শুধু তিনি কেন, কোন ইসরায়েলি-ই পারে না। ইসরায়েলের জন্ম লগ্ন থেকে দেশটি কেবল তাদের বিরোধিতাই করে আসছে সব ব্যাপারে, সব সময়।

১৯৫৪ সালে, ইসরায়েল জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার দিনটি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর 'সন্ত্রাসী কার্যকলাপ' সম্পর্কে যখনই সে নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পেশ করতে গেছে, তখনই ভেটো দিয়ে তা বানচাল করে দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। গত প্রায় সাতাশটি বছর ধরে চলে আসছে এ-প্রক্রিয়া।

অথচ ভেতরে ভেতরে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়াসহ অন্যান্য আরব দেশসমূহের সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব। চোখ বুজে তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করছে সে। যার মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রযুক্তি পর্যন্ত রয়েছে। মুখে যতই মিষ্টি কথা বলুক, আসলে ইহুদীদের দুচোখে দেখতে পারে না ওরা। নাৎসী কুত্তা হিটলারের সঙ্গে নাস্তিক ব্রেজনেভের মৌলিক কোন তফাত নেই, দুটোই একই চরিত্রের।

বংশানুক্রমিকভাবে সোভিয়েত নাগরিক, এমন ইহুদীরা পর্যন্ত চরম বৈষম্যের শিকার ওদেশে। অর্থনৈতিক তো বটেই, নানাভাবে চরম সামাজিক নির্যাতনও চালায় ওরা তাদের ওপর, এরকম হাজারো তথ্য জানা আছে তাঁর সরকারের। এর ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক এক চরম দুঃখজনক ঘটনা মোসাডের মস্কো সেল সমূলে উৎপাটিত হওয়ায় যারপর নাই বেকায়দায় পড়ে গেছে তেল আবিব।

দাঁতে দাঁত চাপলেন প্রধানমন্ত্রী, হয়ে যাক এবার একটা ওলট-পালট

গোছের কিছু। খানিকটা শিক্ষা হোক শালাদের। কিন্তু তারপরও, যতই আসন্ন মিশনের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে ভাবছেন, ততই দ্বিধা আসছে। 'একজনকে দিয়ে কি এতবড় একটা কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব?'

'আসল কাজটা তাকে দিয়ে করানো হবে কেবল। অন্যান্য ব্যাপারে মস্কোর ইহুদী অ্যানার্কিস্টরা আমাদের সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া, মিস্টার প্রধানমন্ত্রী,' পাশে তাকালেন মোসাড প্রধান। 'মিস্টার আমিতাই সে ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছেন এরই মধ্যে।'

'কিন্তু এত থাকতে এই ছেলেটিকেই কেন বেছে নিলেন আপনি?'

'প্রথম কারণ ও একজন ডেমোলিশন এক্সপার্ট,' নড়েচড়ে বসলেন শমরন। 'ওস্তাদ লোক। এ ক্ষেত্রে তাকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সার্টিফিকেট দেয়া যেতে পারে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে,' থেমে গাল চুলকালেন, 'মাসুদ রানার চ্যালা ও। অনেক ক্ষতি করেছে রানা অতীতে আমাদের। অনেকবার। এবার তার খানিকটা উসুল করতে চাই। এ ছোকরা তো যাবেই ওদের প্রেসিডেন্টসহ, সেই সঙ্গে মাসুদ রানাও যাবে।'

'কি করে?' টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী।

'যেখানেই থাকুক মাসুদ রানা, জামান শেখের উধাও হয়ে যাওয়ার খবর পেলেই ছুটে আসবে মস্কো। কোন সন্দেহ নেই। তখন ওকে কেজিবির হাতে ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু আপনি জানেন আগে একবার স্বয়ং মাসুদ রানাকে দিয়ে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। রাশিয়ার এনসোয় পাঠানো হয় ওকে প্রফেসর আনাতোলি ফিলাতভ করে। ফল হয়েছিল উল্টো। খুব সম্ভব...' মোসাড প্রধানকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেলেন বেগিন।

'ব্যাপারটা আসলে ঘটেছিল অ্যান্টি পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দেয়া ছিল মাসুদ রানাকে, সেইজন্যে। ব্যাপারটা বেশ জটিল, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। ওই বিশেষ সাজেশন নেয়া যে কোন ব্যক্তিকে হিপনোটাইজ করা যায় সহজেই। কিন্তু বেশিক্ষণ তা কার্যকর থাকে না। অল্প সময়ের মধ্যেই সম্মোহনের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে আসে ভিকটিম। মাসুদ রানার বেলায় সেবার ঠিক তাই ঘটেছিল। এবার তেমন কিছু ঘটার কোন চান্স নেই। যতরকম প্রিভেন্টিভ সাজেশনই নেয়া থাকুক জামান শেখের, কিছুতে কিছু হবে না। প্রথমে সম্মোহন করা হবে তাকে, তারপর পুশ করা হবে বিশেষ একটা ইঞ্জেকশন, যা আগের পর্যায়ে ফিরে যেতে দেবে না কিছুতেই। ধরে রাখবে তাকে আমাদের তৈরি কড়া ইহুদীবাদ এবং প্রতিশোধ স্পৃহার বলয়ে। অবশ্য বারো ঘণ্টা পর পর পুশ করতে হবে ওষুধটা। তাছাড়া...।' থেমে গেলেন দান শমরন।

'কি?'

'একটা দুর্বল দিক এই সিস্টেমেরও আছে। তা হল সম্মোহন আর ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ভিকটিমের মন থেকে তার অতীত পুরোপুরি আঁচড়ে তুলে আনা যায় ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ করে যদি খুব পরিচিত কারও সামনাসামনি সে পড়ে যায়, তাকে সে চিনতে পারবে। হয়ত এক-আধটু অতীত মনেও

পড়বে।'

'কি মুশকিল!' মুখ কালো হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর। 'তাহলে?'

মুচকি হাসি ফুটল শমরনের মুখে। 'ওটা কোন সমস্যা হবে না। মস্কোয় কাজ করবে জামান সম্পূর্ণ আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে। তেমন কারও সামনে পড়ে যাওয়ার কোন চান্সই নেই।'

'বুঝলাম!' ভাব দেখে মনে হল খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন বেগিন। 'কিন্তু ধরুন যদি পড়েই গেল, তখন? আপনিই বললেন, যেখানেই থাকুক, ছুটে আসবে মাসুদ রানা। যদি ওর মুখোমুখিই পড়ে যায়?'

'পড়বে না,' শান্ত, অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মোসাড প্রধান। 'অতটা সময় পাবে না মাসুদ রানা। তার আগেই ওর ঠাঁই হবে লুবিয়াঙ্কায়। সে ব্যাপারে আপনি একশো ভাগ নিশ্চিত থাকতে পারেন, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, স্যার।'

'আই সী।' কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে থাকলেন প্রধানমন্ত্রী। 'ইঞ্জেকশনটা কার আবিষ্কার?'

'এক রুশ, ইয়েভগেনি প্রলেকভের। মেডিসিনের প্রফেসর ভদ্রলোক। মজার কথা হচ্ছে, ওলেগ পেঙ্কোভস্কিই এর ফর্মুলা চুরি করে পাচার করেছিল তেল আবিবে। এর কোন অ্যান্টিডোট আবিষ্কৃত হয়নি আজও। যার ওপর প্রয়োগ করা হবে, ইচ্ছেমত নাচানো যাবে তাকে। তবে সাংঘাতিক কড়া ওষুধ, একনাগাড়ে বিশটা পর্যন্ত পুশ করা যেতে পারে বড়জোর। বেশি হলে চিরদিনের জন্যে উন্মাদ হয়ে যাবে ভিকটিম। পরীক্ষা করে দেখেছি আমরা।'

'ওকে হিপনোটিক সাজেশন কে দিচ্ছেন?'

'চাইম হেরযোগ। ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হাসপাতালের সাইকিয়াট্রির প্রফেসর। এক সেমিনারে যোগ দিতে দিন দশেকের জন্যে লাইপজিগে এসেছেন তিনি। এ ধরনের কাজে আগেও তাঁর সাহায্য নিয়েছি আমরা। দুই "ম", মস্কো এবং মুসলিম, দুটোই ভদ্রলোকের চোখের বিষ।'

'প্রফেসর লাইপজিগে?' ভুরু কোঁচকালেন বেগিন। 'কিন্তু, ওখানে ...মানে, ভিকটিম মস্কোয়, আর ইনি...।' থেমে গেলেন তিনি।

দান শমরন বললেন, 'আপনার অনুমোদন পেলে কাজে নামব আমি। মস্কো নিয়ে যাওয়া হবে প্রফেসরকে।'

আরও কিছুক্ষণ চলল বৈঠক। তারপর সন্তুষ্ট মনে প্রধানমন্ত্রীর দফতর ত্যাগ করলেন শমরন এবং আমিতাই।

তিন

বিশতম বাঁক নিতে নিতে ঘুরে বাঁয়ে তাকাল মাসুদ রানা। ফ্যাকাসে লাল সূর্যটা সবে বঙ্গোপসাগর ফুঁড়ে মুখ জাগিয়েছে। একটার পর একটা ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তীরে, তাদের মাথায় চড়ে আসা সাদা ফেনা মসৃণ তট মাড়িয়ে ছুটে

যাচ্ছে অনেকদূর পর্যন্ত।

বাঁক নেয়া পুরো হতেই তট পিছনে চলে গেল রানার। ওর ডানে, দূরে দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার শহর। পরিকল্পনাহীন, এলোমেলো। এত উঁচু থেকেও অপ্রশস্ত রাস্তাগুলোর খানাখন্দ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। এই সাত সকালেই কাজে বেরিয়ে পড়েছে অনেকে। প্রচুর রিকশা স্কুটার এবং বাইসাইকেল চোখে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল ও। হাইওয়ে ধরে চট্টগ্রামের দিকে ছুটছে একটা প্যাসেঞ্জার কোচ। ওটার জানালায় থেকে থেকে ঝিলিক মারছে কচি রোদ।

এবার নিচের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। পর্যটন সংস্থার বিশাল অবকাশ যাপন কেন্দ্র 'সৈকতে'র ওপর দিয়ে কাত হয়ে উড়ে গেল দৈত্যাকার এক বাদুড়ের মত। কানের পিছনে, গালে নরম পালকের মত পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস। রাইডারস গগলস্ ইচ্ছে করেই পরেনি ও আজ। ফলে চোখের বাইরের দিকের দুই কোণে বাতাসের ঝাপটায় পানি জমছে, একটু পরই আবার শুকিয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে গালে গিয়ে।

কন্ট্রোল বার ধরে গ্লাইডারটা আবার সাগরের দিকে ঘোরাল রানা। এর মধ্যে সৈকতে দর্শকের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে গেছে। হাঁ করে দেখছে সবাই ওকে। কক্সবাজারে গ্লাইডার নিশ্চয়ই অবাক করেছে তাদের। এটাই বোধহয় দেশের প্রথম গ্লাইডার, ভাবল মাসুদ রানা। অবাক হওয়াটা স্বাভাবিক।

আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের দৌড় বড় জোর রোলার স্কেট্ পর্যন্ত। ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউসহ বড় বড় কয়েকটি রাস্তায় অনেককেই দেখেছে রানা স্কেট্ করতে। চট্টগ্রামেও দেখেছে। কিন্তু এই জিনিস···অবশ্য, গ্লাইডার নিয়ে ওড়ার জন্যে যে হাইল্যান্ড দরকার, চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও সে সুযোগও নেই। তবে···ইচ্ছে প্রবল হলে বিকল্প ব্যবস্থা করেও নেয়া যায়।

এরা পাশ্চাত্যের 'আধুনিক' চাল-চলন, হেয়ার স্টাইল, ড্রেসিং স্টাইল মায় আমেরিকানদের নাকি উচ্চারণে ইংরেজি বলা রপ্ত করার ব্যাপারে যতটা আগ্রহী, তার শতকরা একভাগও যদি···। হেসে ফেলল রানা। থাম্, বাপ্! না হয় তুই-ই ফার্স্ট। এবার ক্ষ্যান্ত দে, ক্ষমা করে দে ওদের। যা করছিস, তাই কর।

ঘাস, ঝোপ-ঝাড়ের ওপর দিয়ে দ্রুত অপসৃয়মাণ নিজের বিশাল ছায়ার দিকে একভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়ল রানা। লক্ষ করল, ওর ডান পাশের সেই ছায়া দুটো আছে এখনও-এক জোড়া সী-গাল। অনেকক্ষণ থেকেই সঙ্গ নিয়েছে। বাতাসে দেহ ভাসিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওকে। এ কোন্ জাতের পাখি জানার চেষ্টা করছে হয়ত।

গত বছর গ্লাইডারটা হংকং থেকে কিনে এনেছে মাসুদ রানা। কিন্তু সুযোগের অভাবে চড়া হয়নি। হঠাৎ করে পরশু প্রায় জোর করেই ওকে সাত দিনের ছুটি দিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার।

এই ছুটিটা চেয়েছিল রানা আরও চার মাস আগে। সেবার স্রেফ হাঁকিয়ে

দিয়েছিল বুড়ো। কী দেমাগ! বলে, না, ছুটি-ফুটি হবে না আগামী এক বছরের মধ্যে। অনেক কাজ জমে আছে। আবার সেই মানুষটি-ই নিজে থেকে ছুটি দিলেন সেদিন। পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল, সুযোগ পাওয়ামাত্র গ্লাইডার বগলদাবা করে ছুটে এসেছে রানা এখানে।

সাগরের ভেতর শখানেক গজ এগোল মাসুদ রানা, তারপর বাতাসের বিপরীত দিকের উইঙ নিচের দিকে নামিয়ে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিল অনেকটা জায়গাজুড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলপাই রঙের জীপটা চোখে পড়ল ওর। টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার। আর্মির জীপ। চট্টগ্রামের দিক থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ওটা। এখনও অনেক দূরে আছে।

কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকল রানা, তারপর ঘড়ি দেখল। ছটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এবার নামা উচিত। আরেক চক্কর শেষ করে নেমে পড়বে ও। বাঁক নেয়া শেষ করে তীরের দিকে ফিরতেই আবার জীপটা দেখতে পেল রানা। এসে পড়েছে। কোন কারণ নেই, তবু ওটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না ও। এরমধ্যে উচ্চতা অনেক কমিয়ে এনেছে।

ভুরু কোঁচকাল রানা। শফিক না? ড্রাইভারের পাশের সীটের জানালা দিয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত বের করে দিয়ে হাত নাড়ছে শফিকুর রহমান—চিনতে মোটেই অসুবিধে হল না ওর। বিসিআই-এর চট্টগ্রাম এজেন্ট ছেলেটা।

মোটেল 'সৈকতের' একটু দূরে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ল্যান্ড ক্রুজার। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল শফিক, আবার হাত নাড়তে শুরু করল। নেমে পড়তে বলছে ওকে। ছেলেটির ভাব-ভঙ্গিতে ব্যস্ততার ছাপ। প্রশান্ত মনটা খিঁচড়ে গেল মাসুদ রানার। বুঝে ফেলেছে চট্টগ্রাম থেকে শফিকুর রহমানের ছুটে আসার মানে হচ্ছে ওর ছুটির বারোটা বেজে গেছে।

গ্লাইডারের নাক মাটির দিকে তাক করে দ্রুত নেমে এল ও। বাতাসের আক্রমণে দুপাশের চুল খুলির সঙ্গে লেপটে গেছে, সরু হতে হতে প্রায় বুজে এসেছে চোখ। রাস্তার ওপরই অবতরণ করল মাসুদ রানা। বাঁ পা সামনে বাড়িয়ে হালকাভাবে মাটি স্পর্শ করল, তারপর দ্রুত কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে থেমে দাঁড়াল জীপটার বিশ গজ তফাতে। ছুটে এল শফিক। রানা ততক্ষণে নিজেকে গ্লাইডারের স্ট্র্যাপমুক্ত করে নিয়েছে।

'স্লামালেকুম, মাসুদ ভাই।' দাঁত বের করে হাসছে শফিক। পাঁচ ফুট সাত হবে ছেলেটা খুব বেশি হলে। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। হাবাগোবা গোছের চেহারা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা, দেখলে মায়া হয়। চাকরিতে ঢোকার পর মাত্র একবার কয়েক ঘণ্টার জন্যে মাসুদ রানার সঙ্গে ছোট্ট একটা কাজ করার সুযোগ হয়েছিল তার। সেই থেকে ছোকরা মাসুদ ভাই বলতে পাগল। মাসুদ রানা তার আদর্শ পুরুষ। 'আপনি আমার এত কাছে ছিলেন? জানতাম না তো!'

'জানা গেল কিভাবে?' গম্ভীর মুখে গ্লাইডার ফোল্ড করছে রানা।

'সোহেল ভাই যোগাযোগ করেছিলেন। উনি...'

'কখন?'

'জ্বি?'

'কখন যোগাযোগ করেছিল সোহেল?'

'ভোর চারটের দিকে। এখনই আপনাকে ঢাকা যেতে হবে, মাসুদ ভাই। সোহেল ভাই বললেন খুব নাকি জরুরী।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'সে তোমাকে দেখেই বুঝেছি।'

'আপনার জন্যে চট্টগ্রাম থেকে এয়ার ফোর্সের বেল কপ্টার নিয়ে এসেছি আমি,' বলে খানিকটা বুক উঁচিয়ে দাঁড়াল শফিক। যেন এ কৃতিত্ব তার-ই। 'এখান থেকে সোজা ঢাকা নিয়ে যাবে ওটা আপনাকে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে রানাকে নিয়ে উড়াল দিল কপ্টার।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। মাত্র পনেরো মিনিট আগে ঢাকা পৌঁছেছে ও। গাড়ি পথের দূরত্ব কমানোর জন্যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন কুর্মিটোলা এয়ার ফোর্স বেসের বদলে তেজগাঁও পুরানো বিমান বন্দরে অবতরণ করেছে ওর কপ্টার। ওখান থেকে সরাসরি বিসিআই।

অন্য সময়ে স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটে থাকে দুই বন্ধু মিলিত হলে; গালাগাল থেকে শুরু করে মায় মারামারি পর্যন্ত, সে সবের কোন লক্ষণ নেই, দুজনেই চুপচাপ। সোহেলকে একটা প্রশ্ন করেছে মাসুদ রানা, উত্তর পায়নি। সোহেল অন্যমনস্ক, চিন্তিত। বোধহয় শুনতে পায়নি ওর প্রশ্ন।

'কি রে! বললিনে কি হয়েছে জামানের? নিরুদ্দেশ বলতে আসলে কি বোঝাতে চাইছিস?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'অ্যাঁ?' চমক ভাঙল সোহেলের। 'কফি খাবি?'

অধৈর্যের মত হাত নাড়ল রানা। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দে। জামান বেঁচে আছে, না...'

'কি?'

'বলছি, জামান বেঁচে আছে, না মারা গেছে?'

মাথা দোলাল সোহেল। 'আমরা নিশ্চিত নই।'

'ঠিক আছে,' ঝুঁকে বসল রানা। 'যতটুকু জানতে পেরেছিস, খুলে বল।'

'মস্কোর ব্রিটিশ এমব্যাসির টিলসনকে তো চিনিস, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের...'

'বলে যা।'

'এক সপ্তা আগে, গত বুধবার, কী এক জরুরী কাজে জামানের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল টিলসন। পায়নি ওকে। এরপর গত ছদিন অন্তত পনেরো-বিশবার জামানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে সে। কয়েকবার ওর ফ্ল্যাটে গেছে, টেলিফোনে মেসেজ দিয়ে রেখেছে যেন ফিরলেই রিঙ ব্যাক করে। কিন্তু যোগাযোগ করেনি জামান।'

জামান শেখ বিসিআই-এর মস্কো এআইপি। গত চার বছর আছে সে ওই পদে। জামান শেখ রানার নিজ হাতে গড়া। এমন চৌকষ আর সবকিছুতে ওস্তাদ ছেলে খুব কমই নজরে পড়েছে রানার। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং

বিশ্বস্ত। ওর হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যে কি রহস্য থাকতে পারে মাথায় খেলছে না।

'জামানের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছে টিলসন গোপনে। জানা গেছে, সে যেদিন প্রথম জামানকে খুঁজতে গিয়েছিল, তার আগের দিন ভোরের দিকে চার-পাঁচজন লোক এসে ধরে নিয়ে গেছে জামানকে ওর ফ্ল্যাট থেকে। অস্বাভাবিক কিছু করেনি তারা। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সিকিউরিটি-ইন-চার্জকে নিজেদের কেজিবি-র লোক বলে পরিচয় দিয়েছে তারা, পরিচয় পত্রও দেখিয়েছে। বলেছে জামানের বিরুদ্ধে গুরুতর কি সব অভিযোগ আছে। অথচ...'

'অথচ?'

'ওরা কেজিবি-র লোক ছিল না।'

চাউনি সরু হয়ে এল রানার। 'তাহলে?'

'জানা যায়নি। তবে সেই রাতে জামান যেখানে থাকে, গরস্কি স্ট্রীটে কেজিবি কোন অপারেশনে যায়নি এটা নিশ্চিত। খোঁজ নিয়েছে টিলসন।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। হ্যারল্ড টিলসন মস্কোর ব্রিটিশ দূতাবাসের প্রেস ইনফর্মেশন অফিসার, ওপরে ওপরে। আসলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হোমরা-চোমরা সে। জামানের ব্যাপারে এত খোঁজ-খবর নেয়ার কথা নয় তার। তবু নিয়েছে, কারণ মাসুদ রানা বিএসএস-এর অন্যতম উপদেষ্টা।

রানা পদটি গ্রহণ করার কিছুদিন পর থেকে, ওর-ই পরামর্শে, বিসিআই ও বিএসএস একটি যৌথ নেট ওঅর্কের অধীনে কাজ করতে আরম্ভ করে কোন কোন দেশে। যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নও আছে। এই কারণেই জামানের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে বিসিআই। নইলে কোন্ দেশের কোন্ এজেন্টের কি হল না হল, তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। বরং কোনরকম ঝামেলার আভাস পাওয়া গেলে সবাই নিজের নিজের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কারা করল এ কাজ? গভীর চিন্তায় ডুবে আছে রানা। কেন? কি উদ্দেশ্যে? বেঁচে আছে তো জামান শেখ? ভাবতে ভাবতেই ডাক পড়ল ওর মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের রুমে।

'বোসো,' চিরাচরিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ।

বসল ও। রাহাত খানের চোখের নিচে কালির আবছা একটা প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। তার মানে গতরাতে টিলসন যোগাযোগ করার পর আর ঘুমাননি বৃদ্ধ। কপালের পাশের রগটা লাফাচ্ছে তেমনি। গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর।

এসব দেখে রানা অভ্যস্ত। এই রুমে যতবার মানুষটির মুখোমুখি হয়েছে ও, তার প্রায় প্রতিবারই এ দৃশ্য দেখতে হয়েছে ওকে। দেখতে হয়। মানুষের পক্ষে একটানা কতক্ষণ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটানো সম্ভব? ভাবল রানা আনমনে, বিশেষ করে একজন বৃদ্ধের পক্ষে?

'জামানের ব্যাপারটা শুনেছ নিশ্চই?' রানার চুলের ডগা ছুঁয়ে আরও পিছনে, দেয়ালের ওপর দৃষ্টি আটকে আছে রাহাত খানের। টিউব লাইট ঘিরে কয়েকটা

পোকা নাচানাচি করছে। কাছেই ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে একটা টিকটিকি। স্থির, নিষ্কম্প। শিকার ধরতে বদ্ধ পরিকর।

'শুনেছি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'নিশ্চই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।'

দৃষ্টিটা স্থান বদল করল বৃদ্ধের। সেই সঙ্গে কুঁচকে উঠল কাঁচাপাকা ভুরু। প্রায় ধমকের সুরে বললেন, 'অবশ্যই রহস্য আছে!'

ট্যাপ খেয়ে গেল রানা। মন্তব্যটা বোকার মত হয়ে গেছে। আমতা আমতা করতে লাগল ও, 'না, মানে, আমি বলতে চাচ্ছিলাম···'

হাত তুললেন রাহাত খান। বুঝতে পেরেছেন, অহেতুক মেজাজ দেখানো হয়ে গেছে। খানিকটা লজ্জাও পেলেন তিনি। 'বুঝেছি। সে যাক, শোনো। আজই মস্কো রওনা হচ্ছো তুমি। রহস্যটা কি জানতে হবে। প্রথমে বার্লিন। ওখানে আমাদের হামিদুল্লাহ থাকবে এয়ারপোর্টে। কি ভাবে কোন্ পথে মস্কো ঢুকবে ওর কাছেই জানতে পাবে। সব আয়োজন করে রাখবে হামিদুল্লাহ। তোমার সুবিধে হবে এতে, কাজ এগিয়ে থাকবে অনেকটা। আর টিলসন তোমার অপেক্ষায় আছে। মস্কো পৌঁছুলে তোমাকে ব্রিফ করবে ও।'

'জ্বি।'

চোখ-মুখ কুঁচকে কি যেন ভাবলেন খানিক রাহাত খান। 'ব্যাপারটা আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না, রানা। তুমি জানো, আগামী সাত তারিখে চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কো যাচ্ছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট?'

'জানি, স্যার,' বলেই থমকে গেল মাসুদ রানা। চমকে গেছে ভেতরে ভেতরে অজান্তেই বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ। 'আপনি···স্যার, বলতে চাইছেন, তাঁর সফরের সাথে জামানের নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে?'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রাহাত খান। 'আমি কিছুই বলতে চাই না, রানা।' ক্লান্ত শোনাল কণ্ঠটা। 'এমনকি ভাবতে পর্যন্ত চাই না। কিন্তু দুর্ভাবনাটা আমাকে মুক্তি দিচ্ছে না। ভেবে দেখো, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সফরে ও দেশে যাচ্ছেন, ঠিক তার আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল আমাদেরই মস্কো এআইপি। না, ভুল হল, ভুয়া পরিচয়ধারী একদল লোক তুলে নিয়ে গেল তাকে, গায়েব করে ফেলল। কেন? কি উদ্দেশ্যে? জামানকে হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য হতেই পারে না। সেরকম ইচ্ছে থাকলে জামানকে ওরা ওখানেই একটা বুলেট খরচ করে মেরে রেখে যেতে পারত অনায়াসে। তা না করে কেন তুলে নিয়ে গেল? কি আশা করছে তারা জামান শেখের কাছে?'

বরফের মত জমে বসে আছে মাসুদ রানা। ঘামছে। তাই তো! এ দুয়ের মাঝে কোন অদৃশ্য যোগসূত্র নেই তো?

'আমার ধারণাটা বলছি, শোনো। আমাদের প্রেসিডেন্টের মস্কো উপস্থিত থাকার সময় খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, খুব সম্ভব। অন্য সময় হলে হয়ত অন্য লাইনে চিন্তা করতাম আমি। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল এমন সময় যে আর কোন সম্ভাবনা মাথাতেই আসছে না আমার। খোদা না করুন···আমার আশঙ্কাটা যেন সত্যি না হয়। যে ভাবে হোক, জামানকে খুঁজে বের করতে হবে

তোমাকে, রানা। আমি চাই আমাদের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কে যেন একচুল পরিমাণ চিড়ও না ধরে। যেন কোন দুর্নাম না হয় বাংলাদেশের।'

'জ্বি।'

'অবস্থা বুঝে যে-কোন পদক্ষেপ নেয়ার পুরো ক্ষমতা দেয়া হল তোমাকে।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। আবার বললেন, 'যে-কোন পদক্ষেপ নিতে পারো তুমি।' টেবিলে বাঁ কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসলেন রাহাত খান। একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলেন। এটাও পরিচিত ইঙ্গিত। অর্থাৎ, এবার কেটে পড়ো।

আসন ছাড়ল রানা। পা বাড়াল দরজার দিকে। পিছন থেকে বলে উঠলেন বৃদ্ধ, 'তোমার ছুটিটা বাতিল করতে হল বলে দুঃখিত, রানা। ভালয় ভালয় ফিরে এসো, পুষিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' হাসি ফুটল রানার মুখে। 'মস্কো মিশন সফল হলে এমনিতেই পুষিয়ে যাবে।'

বেরিয়ে এসে দরজাটা টেনে দিতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এমন সময় বৃদ্ধের চাপা কণ্ঠ কানে এল। 'হারামজাদা!'

থতমত খেয়ে গেল ও। বেকুবের মত চেয়ে থাকল তাঁর দিকে। 'জ্বি, স্যার?'

'তোমাকে নয়।' হাত তুলে রানার মাথার ওপরের দেয়াল ইঙ্গিত করলেন রাহাত খান। 'টিকটিকি।'

মুখ তুলল রানা। বড়সড় একটা পতঙ্গ চোয়ালে চেপে ধরে আছে একটা টিকটিকি, গিলে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হেসে ফেলল রানা মুখ টিপে। টেনে দিল দরজাটা।

শেষ মুহূর্তে যদি আরেকবার ফিরে তাকাত, দেখতে পেত ফাইলটা চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বৃদ্ধ চেহারা আড়াল করার জন্যে। লজ্জা পেয়ে গেছেন।

চার

প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে টেম্পলহপের আকাশে পৌঁছুল রানার বিমান। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বৃহদাকার এয়ারবাস। ধোঁয়াটে পর্দাটার ওপাশে মূল টার্মিন্যালসহ বিমান বন্দরের অন্যান্য ভবনের কাঠামো কোনরকমে চোখে পড়ছে। রানওয়ের ল্যান্ডিং লাইটের অবস্থাও তেমনি। দুই সারি সবুজ আভার মধ্যে চওড়া বিস্তৃতি-ব্যাস।

প্রথম টাচ্ ডাউনের ঝাঁকিটা হল বেশ জোরাল, বাম্প করে অনেকটা লাফিয়ে উঠল বিমান। আবার বাম্প করল কয়েক মুহূর্ত পর। তবে এবার স্বাভাবিকভাবে। সামলে নিয়েছে পাইলট। চেপে রাখা দম ছাড়ল যাত্রীদের

অনেকেই। জার্মান, স্প্যানিশ, ইংরেজিসহ বেশ কয়েকটি ভাষার মৃদু স্বস্তিসূচক ধ্বনি কানে এল রানার।

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল ও। সাদাটে পুরু একটা পর্দা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে যথাসম্ভব টার্মিন্যাল ভবন ঘেঁষে দাঁড়াল এয়ারবাস। মাঝখানের দূরত্বটুকু পেরোতে ছাতার আশ্রয় নিয়েও লাভ হল না, অর্ধেক পথ যেতেই ভিজে একাকার হয়ে গেল যাত্রীরা। বিশাল টার্মিন্যাল গিজ গিজ করছে মানুষে। বেশিরভাগই বিভিন্ন গন্তব্যের অপেক্ষমাণ যাত্রী। বৃষ্টির বেগ না কমা পর্যন্ত তাদের ফ্লাইট স্থগিত রাখা হয়েছে। অন্যদের কেউ রানার মত কেউ বা আত্মীয়-বন্ধু রিসিভ করতে এসে ফেঁসে গেছে।

হাতের ব্রীফকেসটা ছাড়া আর কোন লাগেজ নেই মাসুদ রানার। ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে ভবনের মাঝ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হল ও। দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল হামিদুল্লাহর দেখা পাওয়ার আশায়। কিন্তু ওর চাইতেও দুচার ইঞ্চি উঁচু অজস্র মাথা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। দেখতে পাচ্ছে না রানা। চিৎকার, হাঁক-ডাক আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ক্যাঁও-ম্যাঁও মিলে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ভেজা কাপড় চুঁইয়ে পড়া পানিতে টার্মিন্যালের মেঝে থৈ-থৈ করছে।

বিরক্ত মুখে আবার পা বাড়াল রানা। কিন্তু ওর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে অল্পবয়সী এক সুন্দরী। 'মাফ করবেন, ইনফর্মেশন ডেস্কটা কোনদিকে, বলতে পারেন?' বলার মধ্যে পরিষ্কার আইরিশ টান।

হাত তুলে ভবনের পুব-দক্ষিণ কোণ নির্দেশ করল মাসুদ রানা। 'ওখানে।'

'ধন্যবাদ।' হাতে একটা স্ট্র্যাপ ছেঁড়া ফ্লাইট ব্যাগ। ওটা বগলদাবা করে পা বাড়াল মেয়েটি দ্রুত।

পাঁজরে জোরালো এক গুঁতো খেয়ে সচকিত হল রানা। তিন আমেরিকান কালা আদমী, একজনের বগলে একজোড়া স্কি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সামাল দিতে না পেরে গুঁতো লাগিয়ে দিয়েছে ছুঁচোল ডগা দিয়ে। রানাকে কটমট করে তাকাতে দেখে একটু হাসির ভঙ্গি করল কালুয়া। 'সরি, বাডি।'

'শালা, জানোয়ার!' বিড়বিড় করে বলল মাসুদ রানা। ততক্ষণে আরও কয়েক জনকে স্কি-র ঘা গুঁতো মেরে চোখের আড়ালে চলে গেছে দলটা।

মেইন এন্ট্রান্সের দিকে চলল এবার রানা। আরেক সুন্দরী পথরোধ করল। 'পার্ডন, মশিয়ে। ভউস ইটেস ডি প্যারিস?'

'নন, মাদামোয়াজেল। লণ্ডন থেকে আসছি আমি।'

'সরি।' একদল চীনার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি। অনুসন্ধান ডেস্কের দিকে যাচ্ছে।

'আপনার আশায় সারারাত বসে থাকতে হবে ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিলাম আমি।'

পিছন থেকে পরিষ্কার বাংলা শুনে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। দাঁত বের করে হাসছে হামিদুল্লাহ, বিসিআইয়ের বার্লিন অপারেটর। মানুষটি ছোটখাট। ফর্সা। বড় বড় চোখ। দাঁত কদুর বিচির মত। 'কেমন ভ্রমণ হল?'

'মোটামুটি। কেমন আছেন আপনি?'

সাধারণ কুশল বিনিময়ের পর এদিক ওদিক তাকাল হামিদুল্লাহ। 'এখানেই কোথাও কাজের কথা সেরে নিতে হবে। শিডিউল মতে আপনার হ্যানোভার ফ্লাইটের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। চলুন দেখি, দাঁড়াবার মত জায়গা দরকার।'

হলরুম ছেড়ে টার্মিন্যালের বিশাল পোর্টিকোয় চলে এল ওরা। এখানে ভিড় অনেক কম। ফাঁকামত একটা জায়গায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। বৃষ্টির বেগ কমে গেছে এর মধ্যে। মুখ খোলার আগে ডানে বাঁয়ে দেখে নিল হামিদুল্লাহ।

'মস্কোর পানি আরও ঘোলা হয়ে গেছে, রানা ভাই,' চাপা গলায় বলল লোকটা।

'কিরকম?'

'ঢাকা থেকে বসের বার্তা এসেছে আমি এয়ারপোর্টে আসার একটু আগে। টিলসন আবার যোগাযোগ করেছে তাঁর সাথে।' কোটের পকেট হাতড়ে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করল সে। রানাকে অফার করল, নিজেও ধরাল একটা। বুক দুরু দুরু করছে রানার। এখনই হয়তো কোন খারাপ খবর শুনতে হবে। চুপ করে ধোঁয়া গিলতে লাগল। হামিদুল্লাহ্ই আগে মুখ খুলুক।

'কাল সকালে কিছুক্ষণের জন্যে মস্কোয় দেখা গিয়েছিল জামান শেখকে। রেড স্কয়ারে স্পাসকি গেটের কাছে কয়েকজন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলছিল।'

'দেখা গিয়েছিল?' কপাল কুঁচকে গেল রানার।

'জ্বি।'

'তারপর?'

'আবার উধাও হয়ে গেছে।' সিগারেটে লম্বা টান দিল হামিদুল্লাহ।

'কে দেখেছে ওকে? ঠিক দেখেছে কি না···'

'টিলসন নিজে দেখেছে।'

সন্দেহের অবকাশ নেই তাহলে, ভাবল রানা। 'তারপর?'

'কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা দিয়েই আবার গায়েব হয়ে গেছে। কাল আর আজ গরুখোঁজা করেছে তাকে টিলসন। পায়নি। এরপর ঢাকার সাথে যোগাযোগ করেছে।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মস্কো পৌঁছার তাগিদ অনুভব করল মাসুদ রানা। কে জানে কি বিপদ ঘোঁট পাকাচ্ছে ওখানে। সিগারেট হঠাৎ করেই বিস্বাদ লেগে উঠল, টোকা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল ওটা রানা। পানিতে পড়তে 'ফাঁৎ' করে নিভে গেল আগুন। 'আমার মস্কো পৌঁছার কি ব্যবস্থা?'

'হ্যানোভারে বিএসএস অপারেটর অ্যাডাম হারপার রিসিভ করবে আপনাকে। আয়োজন সব পাকা। হারয মাউন্টেনের জেলার-ফেল্ড বর্ডার দিয়ে পুব জার্মানি ঢুকবেন আপনি।' পকেট থেকে একটা পেটমোটা খাম বের করল হামিদুল্লাহ। 'এর ভেতরে আপনার ওদেশী নাগরিকত্বের কাগজপত্র সব আছে। কাল দুপুরের ফ্লাইটে মস্কো যাচ্ছেন আপনি লাইপজিগ থেকে। ইন্টারফ্লুগে।

টিকেটের ব্যবস্থা করে রাখবে হারপার। রাশান কাগজপত্র পাবেন টিলসনের কাছে।'

রাত এগারোটা পঞ্চাশ। তুষার পড়ে সাদা হয়ে আছে পুরো হ্যানো-ভার। আকাশে গোল চাঁদ, ঝলমল করছে প্রকৃতি আলোয় আলোয়। ভীষণ শীত। ভারী ওভারকোট উলেন স্কার্ফ আর দস্তানা পরে নিয়েছে রানা প্লেন থেকে নামার আগে। তারপরও একটু একটু কাঁপছে।

কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সেরে বাইরে পা রাখতেই অ্যাডাম হার-পারের ওপর চোখ পড়ল ওর। বছর দুয়েক আগে হেলসিঙ্কিতে দেখা হয়েছে ওদের শেষবার। ওখানকার ব্রিটিশ দূতাবাসের সাধারণ এক কেরানির ছদ্ম পরিচয়ে ছিল সে। রানার কান সমান লম্বা হারপার। হরিণের চামড়ার পুরু কোট পরে আছে। গলায় পেঁচিয়েছে হাত পাঁচেক লম্বা সবুজ উলের স্কার্ফ। মুখটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে স্কার্ফ দিয়ে।

খোশ গল্পের সময় নয় এটা, জানা আছে হারপারের। তাই ওসবের ধার দিয়েও গেল না। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'আর কোন লাগেজ?'

'না।'

পাশাপাশি এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। কাছেই পার্কিং লটে অপেক্ষমাণ একটা সাদা মার্সিডিজ দেখাল হারপার রানাকে। 'ওটা।' বিনা বাক্যব্যয়ে সামনের সীটে উঠে বসল ও। ব্রীফকেসটা দুজনের মাঝখানে কাত করে রেখে বাঁ হাতের ভর চাপাল তার ওপর।

মৃদু গুঞ্জন তুলে রওনা হল মার্সিডিজ। হ্যানোভার-হেরেনহসেন অটোবাহান ধরে দশ কিলোমিটার এগোল অ্যাডাম হারপার, তারপর দক্ষিণমুখো রুট নম্বর সিক্স-এ উঠে এল। নদীর কিনারা ঘেঁষে চলতে চলতে গতি বাড়াতে লাগল সে একটু একটু করে।

'কোন ঝামেলার আশঙ্কা আছে?' মিনিট পনেরো পেরিয়ে যেতে মুখ খুলল মাসুদ রানা।

'কি? না না,' বলল হারপার। 'এ প্রশ্ন কেন?'

'ঘন ঘন মিরর দেখছ।'

হাসল লোকটা। 'অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

ফাঁকা রাস্তায় তীরবেগে ছুটছে মার্সিডিজ। মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে চলেছে। চারদিকে বরফ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রানার দুচোখ। একভাবে বসে থাকতে বিরক্তি লাগছে। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে দেড়টা বাজতে দেখে নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসল ও। 'আর কতদূর?'

'এসে গেছি প্রায়।' দ্রুত বাঁক নিয়ে গাড়ি ডানে ঘোরাল হারপার। এই সময় দূরে কয়েকটা টিমটিমে বাতি দেখা গেল। সেদিকে থুতনি তাক করে বলল সে, 'পশ্চিম জার্মান বর্ডার পোস্ট।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। পাঁচ মিনিট পর পোস্ট অতিক্রম করল ওরা। এবার পুব জার্মান বর্ডার পোস্টের দিকে ছুটল।

'বর্ডার পার হচ্ছি কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'ট্রাকে। আপনার প্লেনের টিকেট ড্যাশবোর্ডের ভেতরে আছে।'

টিকেটটা পকেটে পুরল মাসুদ রানা। হামিদুল্লাহ্‌র দেয়া কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছে ও আগেই। রানার পুব জার্মান ট্রানজিট ডকুমেন্টে নাম-পরিচয় লেখা আছে এভাবে: নাম: হ্যানস জে. গুন্থার। পুব জার্মান প্লাস্টিক উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি 'প্লাস্টিসেন ফারবেন'-এর প্রতিনিধি। সঙ্গে আছে ভিসা, শুধুমাত্র মস্কো ভ্রমণের জন্যে। সোভিয়েত প্লাস্টিক উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির তরফ থেকে গুন্থারকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখা একটি চিঠি। সবশেষে আছে একটি তথ্যসূত্র; এর আগে কতবার মস্কো সফরে গিয়েছে গুন্থার, সেই বিষয়ে।

এছাড়া অগ্রিম হোটেল বুকিং, কারেন্সি ভাউচারসহ আরও অনেক হাবিজাবি আছে ওর মধ্যে। প্লেনের বাথরুমের কমোডে বসে এতসব খুঁটিয়ে দেখতে বিরক্তি লাগলেও মনে মনে হামিদুল্লাহকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানিয়েছে মাসুদ রানা। অত্যন্ত সীমিত সময়ের মধ্যেও লোকটা ওর বেআইনী মস্কো প্রবেশকে নিখুঁত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

যদিও নিরাপদে চেরেমেতেভো এয়ারপোর্টের বাইরে একবার পা রাখতে পারলে এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, ওখানে নতুন আরেক সেট রাশান পরিচয়পত্র সরবরাহ করবে ওকে টিলসন। তবুও, একটা টীম ওয়র্কের অংশ হিসেবে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব খুবই দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছে লোকটা।

'আপনার ওই ওভারকোটে কাজ হবে না মস্কোয়। ওখানকার তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, তবে এখনও খুব শীত। আপনার জন্যে ভারী অস্ত্রাখান গ্রেট কোট, হ্যাট, ফারমোড়া জুতো, গ্লাভস নিয়ে এসেছি। পিছনের বুটে আছে।'

'ধন্যবাদ।' এ সম্ভবত মস্কোর ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানে না, শুধু নির্দেশ পালন করে চলেছে। জানলে নিশ্চয়ই প্রসঙ্গ তুলত। 'ট্রাকে চড়ে বর্ডার ক্রস করতে হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ।' ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল হারপার। 'আর পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওটা।'

'কিসের ট্রাক? কি বয়ে নিয়ে যাবে?'

'আপনাকে,' হাসল হারপার। 'এবং আপনার মত আরও কিছু নিষিদ্ধ পণ্য।'

'যেমন?'

'জার্মান স্কচ, ফরাসী পারফিউম, আমেরিকান জ্যায রেকর্ড, ক্যাসেট এইসব।'

'লাইপজিগ ব্ল্যাক মার্কেটের জন্যে?'

'উঁহুঁ, জার্মান আর রুশ কমিউনিস্ট নেতা আর তাদের আয়েশী স্ত্রীদের জন্যে। লাইপজিগে আনলোড হয় মাল। ওদেশের "কোটা" রেখে পরে

বাকিগুলো মস্কো পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতিমাসে দুবার করে হয় এই ট্রাক ট্রিপ।'

'একই ট্রাকে?' একটা সিগারেট ধরাল রানা। হারপারকেও দিল একটা।

'ড্রাইভারও একজনই।'

'গাড়ি চেক হবে না বর্ডারে?'

'পাগল?' শব্দ করে হেসে উঠল হারপার। 'কার ঘাড়ে কটা মাথা যে ওই গাড়ি চেক করবে? তবে...'

'তবে?'

'একবার সামান্য গণ্ডগোল হয়েছিল শুনেছি। বর্ডার পোস্টের দায়িত্বে ছিল নতুন এক কমান্ডার। তার জয়েন করার দুদিন পরের ঘটনা। ভেতরের খবর বেচারার জানা ছিল না। আটকে দিয়েছিল গাড়ি। অবশ্য পরদিনই তাকে সাইজ করা হয়।'

কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে বসে থাকল মাসুদ রানা সিগারেট টানা ভুলে। তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে পুড়ছে ওটা। ক্লান্তি লাগছে। জামানের নিখোঁজ সংবাদ শোনার পর প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সেই থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা রেহাই দেয়নি ওকে। সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে জামানকে আবার কিছুক্ষণের জন্যে মস্কোয় দেখা গেছে শুনে। এর মানে কি? রেড স্কোয়ারে কেন গিয়েছিল ও? কাদের সঙ্গে আলাপ করছিল? কি আলাপ? ওই অপরিচিত লোকগুলোই বা কারা?

সচকিত হল মাসুদ রানা। দাঁড়িয়ে পড়েছে মার্সিডিজ পথের পাশে। 'এখানেই,' বলল অ্যাডাম হারপার। 'তাড়াতাড়ি কোট জুতো পাল্টে ফেলুন। পিছনের সীটে আছে সব। যে-কোন সময় এসে পড়বে ট্রাক।'

সাত মিনিট অপেক্ষা করার পর আওয়াজটা শুনতে পেল রানা—ভারী ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, ওদের ফেলে আসা পথ ধরে আসছে। এক সময় ওটার আকাশমুখী জোরাল সার্চলাইটের আলো চোখে পড়ল। আরও পাঁচ মিনিট পর পৌঁছুল ওটা। দশ টনি বিশাল এক ক্যারিয়ার। মার্সিডিজের সামনে পথের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল ট্রাকটা।

দরজা খুলে নেমে এল ড্রাইভার। লোকটা বেঁটে, ভীষণ মোটা। চৌকো চেহারা। জিনস্, রীফার জ্যাকেট আর উলের স্কার্ফ পরে আছে। কাছে এসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে রানা আর হারপারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লোকটা।

'একটা ফার কোট বিক্রি করব, দুহাজার ডলার দাম। কিনবেন?' প্রশ্ন করল ট্রাক ড্রাইভার।

'এক হাজার ডলারে হলে কিনতে পারি,' বলল হারপার।

হাসি ফুটল ড্রাইভারের মুখে। ডান হাত বাড়াল সে হারপারের দিকে। 'আমি ম্যাটোফার।'

'আমি অ্যাডাম হারপার।'

'দুঃখিত, হের হারপার। দেরি হয়ে গেল খানিকটা।'

'ও কিছু নয়। ভালয় ভালয় যদি আসল কাজ সারা যায়, তাহলেই হবে।'

এবার রানার সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিল হারপার।

ওদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে সগর্জনে উড়ে গেল একটা জেট, চাঁদের আলোয় চক চক করে উঠল রূপালী মাছের মত দেহটা। ওরই মাঝে অনেক দূর থেকে কুকুরের হাঁক শুনতে পেল সবাই।

'ভয় নেই,' রানাকে হাঁকের উৎসের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে বলল হারপার। 'পুব জার্মান গার্ড পোস্টের কুকুর। অনেক দূরে আছে।'

'তাড়াতাড়ি রওনা করা উচিত,' তাড়া লাগাল ম্যাটোফার। 'বেশি দেরি হলে সন্দেহ করে বসতে পারে গ্রুপেনফুয়েরার।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

ট্রাকের পিছনের দুই পাল্লার ভারী স্টীলের গেটটা মেলে ধরল ম্যাটোফার। ভেতরে ছাতের সঙ্গে ফিট করা একটা ঘোলাটে বাল্‌ব্ জ্বলছে। রানা আর হারপার উঠে পড়ল ভেতরে। ফ্লোরের প্রায় পুরোটা জুড়ে কাঠের তৈরি চার সারি ছোট ছোট বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটার ওপর আরেকটা। ওর প্রতিটি বাক্সে আছে এক ডজন করে স্কচ, লেবেল পড়ে বুঝল রানা। ওদিকে ক্যাবের সঙ্গের দেয়ালঘেঁষে রয়েছে ছোট-বড় নানান আকারের কার্টন। কোন লেবেল নেই ওগুলোর। পারফিউম বা রেকর্ড-ক্যাসেটের প্যাকেট বোধহয় ওগুলো, ভাবল রানা।

ফ্লোরের মাঝামাঝি জায়গার গোটা কয়েক বাক্স সরিয়ে ফেলল ড্রাইভার। কয়েক ভাঁজ করা একটা ত্রিপল ছিল ওখানে, ওটা সরাতেই সাত বাই তিন সূক্ষ্ম, চৌকো একটা দাগ দেখা গেল ফ্লোরের গায়ে।ট্র্যাপডোর।

ট্র্যাপডোরের ঢাকনা তুলে ধরল ম্যাটোফার। ঢাকনার ভেতরদিক-সহ পুরোটা ফোকর ভেড়ার লোম দিয়ে মোড়া। আরোহীকে যথাসম্ভব আরাম দেয়া এবং শীত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এ আয়োজন। অস্বস্তি লেগে উঠল রানার। মনে হল নিজের কফিনের দিকে চেয়ে আছে।

ওকে ইতস্তত করতে দেখে বলল ম্যাটোফার, 'কোন চিন্তা নেই, হের গুস্থার। ঢুকে পড়ুন। অনেক লোক পার করেছি আমি এতে করে। অবশ্য সবসময় নিয়েই এসেছি, কেবল এবারই নিয়ে চলেছি। তবে অসুবিধে হবে না, আমার গাড়ি চেক করা হয় না কখনও।'

রানা ভাবছে অন্য কথা। 'একেকটা ক্রেটের ওজন কত?'

'সতেরো কেজি।'

'আমি ভেতরে ঢুকলে ঢাকনার ওপর কয়েকটা বাক্স সাজিয়ে রাখবেন আবার।'

'ঠিক আছে।'

'বেশি নয়, চার-পাঁচটা।' ওজন বেশি হয়ে গেলে তাড়াতাড়িতে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে, ভাবছে রানা, অবশ্য যদি তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়। হারপারের দিকে ফিরল এবার ও। 'হামিদুল্লাহকে জানিয়ে দাও খবরটা।'

'ভাববেন না,' ডান হাত বাড়াল সে। 'উইশ ইউ লাক, হের গুস্থার।'

'উইশ মি বেস্ট অভ লাক,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। হ্যান্ডশেক সেরে

বসল ফোকরের কিনারায়, তারপর আস্তে করে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। এর গভীরতা সন্তোষজনক মনে হল না ওর। লম্বা হয়ে শুতে অসুবিধে হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু পাশ ফেরা বা দিক বদল করা বেশ কষ্টসাধ্য হবে।

ধীরে ধীরে স্ব-স্থানে ফিরে এল ট্র্যাপডোর। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল মাসুদ রানা। বাঁ হাতটা চোখের সামনে নিয়ে এল ও। জ্বল জ্বল করছে লিউমিনাস ডায়াল-তিনটে সাঁইত্রিশ। ধুপ ধাপ আওয়াজ উঠল ওপরে। বাক্সগুলো আগের মত সাজিয়ে রাখছে ম্যাটোফার। একটু পর পিছনের পাল্লা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। দুলে উঠে রওনা হয়ে গেল দৈত্যাকার ট্রাক।

ভেতরটা বেশ গরম এবং আরামদায়ক। ডিজেল এঞ্জিনের একঘেয়ে সম্মোহনী আওয়াজে দুচোখ জড়িয়ে এল রানার, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

প্রথমে একটা, মুহূর্ত পর আরও একটা কণ্ঠস্বর কানে এল রানার। ঘুম ভেঙে গেছে ট্রাক থেমে দাঁড়ানো মাত্র। নিশ্চয়ই পুব জার্মান গার্ড পোস্ট এটা—জেলারফেল্ড। পরিপূর্ণ সজাগ রানা এখন। সন্দেহ হচ্ছে আসলেই ঘুমিয়েছিল কি না। হঠাৎ চমকে উঠল ও, কানের কাছে পিলে চমকানো হুঙ্কার ছাড়ল একটা কুকুর।

'পিছনের দরজা খোলো!' ধমকের সুরে বলল দ্বিতীয় কণ্ঠ। 'ভেতরে কি আছে দেখব।'

জমে গেল রানা। সর্বনাশ! বলে কি? তবে যে ম্যাটোফার বলল ওর গাড়ি চেক করা হয় না! হঠাৎ করেই গরম লেগে উঠল রানার, একটু একটু ঘামতে শুরু করল। অক্সিজেনে টান পড়েছে যেন ভেতরের বাতাসে, শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। নিচু গলায় কিছু একটা বলতে শোনা গেল ম্যাটোফারকে। পরক্ষণেই আবার ধমক, 'খোলো দরজা!'

ওদিকে ম্যাটোফারও ঘামছে। যে দুই গার্ড গাড়ি থামিয়েছে তাদের একজনকেও সে চেনে না। গত সাত বছর থেকে এই বর্ডার দিয়ে মালামাল পারাপার করে আসছে সে, এখানকার প্রতিটি গার্ড তার পরিচিত। অথচ এরা···কি ব্যাপার? আগের সবাই বদলি হয়ে গেছে নাকি? এক আধটা পরিচিত মুখের খোঁজে নিজের চারপাশে তাকাতে লাগল ম্যাটোফার। আরও কয়েকজন গার্ড এসে দাঁড়িয়েছে এরমধ্যে। সবাই অচেনা। জীবনে এই প্রথম দেখছে ম্যাটোফার।

ভেতরে হের গুন্থার না থাকলে এতটা ভয় পেত না সে। তাঁর অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাঁধ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা নামাল প্রথম গার্ড, ওটার নল দিয়ে জোরে একটা গুঁতো মারল ম্যাটোফারের ভুঁড়িতে। 'খোলো দরজা।'

চারদিক থেকে ঘেরাও অবস্থায় পিছনের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ড্রাইভার। দুপা কাঁপছে, ইচ্ছে করছে বসে পড়ে পথের ওপর। কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিল সে। একটু পরই মাথার ওপর কয়েক জোড়া ভারী বুটের

আওয়াজ পেল মাসুদ রানা।

'কিসের বাক্স এগুলো?'

'হুইস্কি।'

'আর ওতে কি?'

'পারফিউম, ক্যাসেট,' লম্বা করে দম নিয়ে বলল ম্যাটোফার। 'আপনাদের গ্রুপেনফুয়েরার জানেন এই চালানের ব্যাপারে।'

'কি বললে? গার্ড কমান্ডার জানেন?'

'জানেন,' মাথা দোলাল ড্রাইভার। 'সাত বছর ধরে এসব আনা-নেয়া করছি আমি। লাইপজিগ আর মস্কো যাবে এই ক্রেট। পার্টি লীডারদের মাল। মাল পৌঁছাতে দেরি হলে আমি তো বিপদে পড়বই, আপনারাও পড়বেন।'

'তুমি ঠিক জানো গ্রুপেনফুয়েরার জানেন?' একটু দ্বিধান্বিত মনে হল এবার প্রশ্নকারীকে।

'নিশ্চই জানেন।'

'কবে জানানো হয়েছে তাঁকে এই চালানের কথা?'

অতীত স্মরণ করার ভান করল ম্যাটোফার। 'উঁম···সাত-আটদিন হবে।'

হো হো করে হেসে উঠল উপস্থিত সবাই। হাসি থামতে নতুন একটা গলা শোনা গেল। 'তুমি জানো জেলারফেল্ডের আগের গার্ড কমান্ডারসহ প্রত্যেকে বদলি হয়ে গেছে? তিনদিনও পুরো হয়নি আমরা এই পোস্টের দায়িত্বে যোগ দিয়েছি?'

কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না ম্যাটোফারের। কিন্তু এতটা আশঙ্কা করেনি। পাল্টা প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেল সে। একটা ঢোক গিলল, আহাম্মকের মত চেয়ে থাকল লোকটার দিকে।

'জানো না, কেমন? ঠিক আছে, গাড়ি ঘোরাও। গার্ডরুমের সামনে নিয়ে এসো।' ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। দলবলসহ নেমে গেল ক্যারিয়ার থেকে।

পিছন থেকে শেষ চেষ্টা করল ম্যাটোফার। 'দেখুন, শুধু শুধু গ্রুপেনফুয়েরারের ঘুম ভাঙাবেন···'

'চোপ! কথা কম, যা বলছি তাই করো। ঘোরাও গাড়ি।'

হাল ছেড়ে দিল ড্রাইভার। ধীর পায়ে নেমে এল ক্যারিয়ার থেকে। সশব্দে বন্ধ করল ভারী স্টীলের পাল্লা দুটো। ওদিকে গার্ডরা সবাই হাঁটা ধরেছে একটু দূরের গার্ড হাউসের দিকে। মনে মনে দৃঢ় একটা সংকল্প নিল ম্যাটোফার। ঘুরে ক্যাবের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আরেকবার দেখে নিল চারদিক। ট্রাকের গজ দশেক তফাতে একজন মাত্র গার্ড দাঁড়িয়ে আছে এদিকে ফিরে। বাকি সবাই গার্ড হাউসে গিয়ে ঢুকেছে।

ক্যাবে উঠে পড়ল সে। কয়েক মুহূর্ত পর গুম গুম করে উঠল এঞ্জিন, ধীর গতিতে গড়াতে শুরু করল ট্রাক। ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা। কিছু একটা করতে হবে, ভাবছে ও, নইলে ধরা পড়ে যাবে এখনই। কিন্তু কি যে ছাই করার আছে ভেবে পাচ্ছে না।

দু হাঁটু উঁচু করে ওপরের ঢাকনার সঙ্গে ঠেকাল রানা, চাপ দিয়ে তুলে

ফেলতে হবে ওটা। বেরিয়ে পড়তে হবে আগে। তারপর প্রথম সুযোগেই…নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল রানার আপনাআপনি, সড় সড় করে দেহটা পিছনদিকে পিছলে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে লাফ দিয়েছে ট্রাক, ছুটতে শুরু করেছে তুমুল গতিতে। এঞ্জিনের ক্রুদ্ধ গর্জনে চাপা পড়ে গেল আর সব। সামনের দিকে 'মড়াৎ' করে আওয়াজ উঠল। কাঠের ব্যারিয়ার চুরমার করে দিয়েছে ম্যাটোফার। গতি আরও বেড়ে গেছে ট্রাকের. এরই মধ্যে গাড়ি থার্ড গিয়ারে তুলে এনেছে।

সামলে নিয়ে নিজেকে সিধে করল মাসুদ রানা। প্রথমে মনটা খুশিতে নেচে উঠলেও পরক্ষণেই বুঝল, বিপদ আসলে বেড়ে গেল এর ফলে। এত ভারী ট্রাক নিয়ে কিছুতেই পালাতে পারবে না লোকটা। এখনই ধাওয়া করবে ওরা। ভাবতে ভাবতেই গুলির আওয়াজ কানে এল রানার। সিঙ্গল শট। তার পরই চাপা একটা 'ঠক্'। ট্রাকের পিছনে কোথাও বিদ্ধ হয়েছে নিশ্চয়ই।

নাহ্, এখানে শুয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়, ভাবল রানা। ফলস্ কেবিনেটের বহিরাবরণ কতটা পুরু জানা নেই ওর, তবে নিঃসন্দেহে বুলেট ঠেকানর মত পুরু হবে না। সে ক্ষেত্রে গুলি খেয়ে মরতে হবে ওকে নির্ঘাত। চার হাত পায়ের শক্তি এক করে ঢাকনাটা ঠেলা দিল রানা। যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক অল্প শ্রম ব্যয় হল কাজটা সারতে।

লাফিয়ে ওপরে উঠে পড়ল। পরমুহূর্তে একসঙ্গে অনেকগুলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র গর্জে উঠল–শুরু হয়ে গেছে পাইকারি গুলিবর্ষণ। হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাবের দিকে এগোল ও, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কয়েক সার বাক্সের আড়ালে। ওদিকে ট্রাকের পিছনে মাথা খুঁড়ছে বুলেট। মন্দ হয়নি আশ্রয়টা, ভাবল রানা, অন্তত রাইফেলের গুলির হাত থেকে নিরাপদ হওয়া গেছে।

আবার এক পশলা গুলি হল। পিছনের দরজার কাছাকাছি একটা স্কচের ক্রেট বিস্ফোরিত হল। লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল কাঁচের গুঁড়ো, বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল চারদিকে। এই সময় আচমকা বাঁক নিল ট্রাক, একই সঙ্গে যেন পা গজালো ক্রেটগুলোর। একদিক থেকে ছুটে এসে আছড়ে পড়ল ওগুলো উল্টোদিকের ক্রেটের সারির ওপর। প্রচণ্ড চাপে চুরমার হয়ে গেল অসংখ্য পাতলা কাঠের বাক্স।

ফ্লোরে গড়াগড়ি খেতে লাগল দামী স্কচের বোতল, ঠোকাঠুকি লেগে বেশিরভাগই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। উগ্র গন্ধে ভরে উঠল ভেতরটা। ক্যাব থেকে চেঁচিয়ে কিছু বলছে মনে হল ম্যাটোফার, কিন্তু এঞ্জিন আর রাইফেলের বিরতিহীন মিলিত গর্জনে একটা অক্ষরও বুঝল না রানা।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল ও, পিছনদিকে তাকাল। বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দরজা। সরু সরু অসংখ্য ফুটো দিয়ে সার্চলাইটের মত চাঁদের আলো আসছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে ভেতরটা।

সামান্য একটু বিরতি দিয়ে আবার গুলি শুরু করল গার্ড বাহিনী। এবার নিচু অ্যাঙ্গেলে ছুঁড়ছে টায়ার লক্ষ্য করে। ফলটা হল প্রায় তাৎক্ষণিক, আচমকা বিকট আওয়াজ করে উঠল এঞ্জিন, ফুটো হয়ে গেছে সাইলেন্সার পাইপ। একই

সঙ্গে বাঁ দিকের একটা টায়ারও বিস্ফোরিত হল। একটা ঝাঁকি খেল ট্রাক, কিন্তু দৌড়ের গতি ব্যাহত হল না বিন্দুমাত্র। জোড়া হুইলের অন্যটা তার কাজ বজায় রেখেছে। ফুটো সাইলেন্সারের বিদঘুটে ভট ভট আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

ব্যাটারা এখনও ধাওয়া করতে শুরু করেনি কেন ভেবে পাচ্ছে না মাসুদ রানা। গাড়ি নেই নাকি পোস্টে? কিন্তু তা কি করে হয়! ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই পিছনে টানা হর্নের আওয়াজ উঠল, যদিও সাইলেন্সারের আর্তনাদ ছাপিয়ে তার সামান্যই কানে এল ওর। ছিদ্রগুলো থেকে চাঁদের আলো হটিয়ে জোরালো হেডলাইটের আলো ঢুকে পড়ল ভেতরে সরাসরি।

আবার গুলি হল। এবং ঠাস্ ঠাস্ শব্দে পর পর আরও দুটো টায়ার বিস্ফোরিত হল ট্রাকের। ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল ট্রাক, মুহূর্তে গতি পড়ে গেল। রাস্তার সঙ্গে হুইল রিমের ঘর্ষণের বিচ্ছিরি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 'পুরোপুরি বসে গেছে একদিক। মাতালের মত টলতে টলতে এগোচ্ছে ক্যারিয়ার, ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে, উল্টে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। এই সময় আবারও ম্যাটোফারের ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেল রানা। কিন্তু একটি অক্ষরও বুঝল না। সভয়ে বাক্সগুলোর দিকে চেয়ে আছে ও। দু চ্যরটে গায়ের ওপর আছড়ে পড়লেই হয়েছে।

আবার ডানে বাঁক নিতে শুরু করল ট্রাক। ম্যাটোফারের সাহসের প্রশংসা না করে পারল না রানা। লোকটা এখনও আশা ছাড়েনি। কিন্তু ওসব নিয়ে এখন চিন্তা করার সময় নেই। নিজেকে উদ্ধার করার এই-ই সুযোগ। বাঁক নেয়া পুরো হওয়ার আগেই দুই লাফে পিছনের দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা। দিক বদল করতে শুরু করেছে তখন বাক্সগুলো, কিন্তু সেদিকে তাকাল না।

পিছনের ছিদ্রগুলো এ মুহূর্তে প্রায় অন্ধকার। পিছনের গাড়িটা বাঁক নিলেই আবার ভরে উঠবে আলোয়। হাতড়ে হাতড়ে দুই পাল্লা যুক্ত করে ধরে রাখা হুড়কোর মত লিভারটা খুঁজে বের করল মাসুদ রানা, ঝট্‌কা মেরে তুলে দিল ওপরদিকে। এবার ট্রাকের ঝাঁকিতে পাল্লা দুটো আপনিই খুলে গেল।

সামনে তাকিয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার। বাঁক নেয়া শুরু করেনি পিছনেরটা। বাঁক থেকে গজ ত্রিশেক পিছনে রয়েছে এখনও। ট্রাকটা তখন বাঁক পুরো করার শেষ পর্যায়ে। ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা, ক্যাবের দিকে মুখ করে টেইলবোর্ড ধরে ঝুলে পড়ল। মনে মনে প্রার্থনা করছে, হে খোদা, এখনি যেন ঘুরতে আরম্ভ না করে শালারা। ট্রাকের গতি এমনিতেই অনেক পড়ে এসেছিল, বাঁক নেয়ার সময় আরও কমাতে বাধ্য হল ড্রাইভার।

রাস্তার ওপর সতর্ক চোখ রেখে টেইলবোর্ড ছেড়ে দিল রানা। ডান পা মাটিতে আলতো করে ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না, লাফিয়ে উঠে বিদ্যুৎ গতিতে বাঁ পা বাড়াল সামনে যতদূর যায়। পরমুহূর্তেই কোমরের ওপরের অংশ ধনুকের মত বাঁকা করে মাথা নিয়ে এল পেটের কাছে। দেহের সম্মুখগতি রোধ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে নিজেকে সামনের দিকে গড়িয়ে দিল।

শূন্যে দ্রুত একটা পাক খেয়ে পিঠের ওপরের অংশ দিয়ে প্রথমে রাস্তা

স্পর্শ করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে দু'হাঁটু ভাঁজ করে তুলে আনল বুকের কাছে। দু'হাতে পা দুটো পেঁচিয়ে ধরে নিজেকে পুরোপুরি গোল বানিয়ে ফেলল। তারপর দ্রুত একটার পর একটা ডিগবাজি খেতে খেতে চোখের পলকে নেমে গেল রাস্তা ছেড়ে, রাস্তার পাশের স্তূপ হয়ে থাকা গুঁড়ো বরফের মধ্যে পড়তেই থেমে গেল দেহটা আপনাআপনি। এই সময় বাঁক নিল পিছনের গাড়ি–একটা হুড খোলা মিনিট্রাক।

দমকা বাতাসের মত রানার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওটা। হেডলাইটের আলোয় ট্রাকটা চোখে পড়তেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা কণ্ঠ, ওটার পিছনের খোলা দরজা আর বেহাল অবস্থা দেখে বেজায় খুশি। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল মাসুদ রানা।

আবার গুলি শুরু হল পিছন থেকে। হেড লাইটের আলোয় পলকের জন্যে ট্রাকের তলা দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখল রানা এবার। নিশ্চয়ই ফুয়েল ট্যাঙ্কে আঘাত করেছে বুলেট। পরক্ষণে আরেকটা বুলেট গিয়ে ঢুকল সামনের একটা টায়ারে। উন্মত্তের মত লাফ দিল দৈত্যাকার ট্রাক। এর পরেরটুকু ঘটল অত্যন্ত দ্রুত। ট্রাকের ডানদিকটা উঠে গেল শূন্যে, বাঁ দিকের চাকার ওপর ভর দিয়ে এঁকেবেঁকে আরও কয়েক গজ এগোল ওটা, তারপর আছড়ে পড়ল সশব্দে।

বিকট শব্দে বার্স্ট করল ফুটো হয়ে যাওয়া ফুয়েল ট্যাঙ্ক। মুহূর্তে সাদাটে কমলা রঙের আগুন পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল ট্রাক। অবস্থা দেখে ব্রেক কষল পিছনের ট্রাক, দাঁড়িয়ে পড়ল নিরাপদ দূরত্বে। সম্মোহিতের মত ট্রাকটার দিকে চেয়ে থাকল রানা। পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে আশা ছিল এই বুঝি বেরিয়ে এল ম্যাটোফার। এই বুঝি বেরিয়ে এল! কিন্তু এল না মানুষটা।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। মরে গিয়ে মাসুদ রানাকে গভীর কৃতজ্ঞতার জালে জড়িয়ে রেখে গেল অজানা অচেনা ম্যাটোফার। ওর জন্যেই এতবড় ঝুঁকিটা নিতে হল ওকে। রানা না থাকলে একাজ করতে হত না।

পাঁচ

মূর্তির মত বসে আছে মাসুদ রানা। রাত দশটা।

বাতাসের তেমন তেজ নেই। মেঘও নেই। নীল আকাশে ঘোলাটে সাদা বিশাল চাঁদ। আলো ঝলমলে মস্কো নগরী আজ পরীর সাজে সেজেছে যেন। কঠিন বরফের আবরণ গলে গেছে সপ্তাহখানেক আগেই। তবে তুষার আছে-নরম পেঁজা তুলোর মত। মুড়ে রেখেছে ঘর-বাড়ির ছাত, পুষ্প-পত্রহীন ন্যাড়া গাছের ডালপালা। পথ-ঘাট মোটামুটি শুকনো।

চমৎকার মায়াবী পরিবেশ। শুধু ঠাণ্ডাটা আরেকটু কম হলে ওর বড্ড সুবিধে হত, ভাবল মাসুদ রানা। গ্রেট কোটের চওড়া কলার টেনেটুনে আরও

একটু ওপরে তুলল ও, নাকের অর্ধেকটা পর্যন্ত ঢেকে ফেলল। এঞ্জিনের আওয়াজ কানে যেতে ঝাপসা কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল মাসুদ রানা। আরেকটা দশ নম্বর ট্রলি বাস-চকালোভা উলিসাগামী।

ধীরগতিতে এগোচ্ছে বাসটা এ পথের শেষ প্রান্তের দিকে। সামনের মোড়ে পৌঁছে ঘুরে গেল বাঁয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনের লাল আলোজোড়া। গত এক ঘণ্টায় এ-নিয়ে সাতটা দশ নম্বর বাস পাশ কাটাল ওদের। কিছু কিছু যানবাহন এখনও আছে রাস্তায়, তবে তুলনামূলকভাবে নিতান্তই কম। পৃথিবীতে সম্ভবত মস্কোই একমাত্র শহর যেখানে রাত দশটা বাজতেই ফাঁকা হতে শুরু করে রাস্তা।

এরপর যেগুলো থাকে সেগুলো পুলিস আর মিলিশিয়া বাহিনীর টহলযান। কালো রঙের ছোট ছোট নিচু ছাতওয়ালা ভলগা-বোঁচামুখো। আরও আগেই পথে নেমে পড়েছে ওগুলো। যে জন্যে রানা শঙ্কিত। এভাবে এক জায়গায় বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

'আসছে না কেন এখনও?' বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টা করল না ও।

'এসে পড়বে যে-কোন সময়,' বলল ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটা, গডফ্রে। আর্থার গডফ্রে। মস্কোর ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির শোফারের পরিচয়ে আছে গডফ্রে-বিএসএস ইনফর্মার। এয়ারপোর্টে মাসুদ রানাকে রিসিভ করতে যাওয়ার কথা ছিল হ্যারল্ড টিলসনের, কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যায়নি সে।

ওলেগ পেঙ্কোভস্কির বিচারের রায় ঘোষণার পর থেকেই মস্কোর রাজনৈতিক হাওয়া উত্তপ্ত। পুলিস এবং মিলিশিয়া বাহিনীকে পর পর কয়েকদিন ইহুদীদের অনেকগুলো বিক্ষোভ সমাবেশ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে হয়েছে। রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস এবং গরম পানির সাহায্যে তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ধরপাকড়ও হয়েছে প্রচুর।

এদিকে এই উত্তাপের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আসা পশ্চিমা সংবাদিকে ভরে গেছে মস্কো। বিশেষ করে এদের ওপর নজরদারিতে মস্কো কর্তৃপক্ষ সদা সতর্ক। প্রতিটি বিদেশী নাগরিকের ওপর শ্যেন দৃষ্টি তাদের। তার ওপর সে যদি কোন দূতাবাস কর্মচারী হয়, তাহলে তো কথাই নেই। এই কারণেই এয়ারপোর্ট যাওয়ার ঝুঁকি নেয়নি টিলসন।

কোত্থেকে ঝক্কর মার্কা একখানা পবেদা ওয়ান থাউজেন্ড জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে গডফ্রেকে। তার নির্দেশেই রানাকে এখানে নিয়ে এসেছে লোকটা। এখানেই রানার সঙ্গে মিলিত হবে হ্যারল্ড টিলসন। জায়গাটির নাম ক্রাসনোকলমস্কায়া উলিসা। ওদের বাঁয়ে, কয়েকশো গজ দূরে রেড স্কয়ার ইন্টারসেকশন।

নদীর বাঁধানো তীরঘেঁষা একটি শূন্য-প্রায় ক্যাব র‍্যাঙ্কে দাঁড়িয়ে আছে পবেদা। তেল আর সিগারেটের ধোঁয়ার মিলিত গন্ধ জঘন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ভেতরে। থেকে থেকে বমি করে দিতে ইচ্ছে করছে রানার। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। চোখে দেখা যায় না এমন অসংখ্য ফাঁক ফোকর

দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে গাড়ির ভেতরে। হি হি করে কাঁপছে রানা আর গডফ্রে।

কিন্তু এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আপাতত কোন উপায় নেই। গরম হতে চাইলে গাড়ির হিটার অন করতে হবে। এবং এজন্যে সবার আগে গাড়ি স্টার্ট দিতে হবে। কিন্তু ওটি করা চলবে না। স্টার্ট দিলেই আশেপাশে যারা আছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। তার ওপর যদি ওই অবস্থায় এরকম নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে অনেকেরই। কাজেই ঝুঁকি নেয়া চলবে না।

দশ মিনিট সময়ের মধ্যে পবেদার কয়েক গজ দূর দিয়ে পর পর চারটে ভলগা গেল ইন্টারসেকশনের দিকে। শেষেরটা পাশ কাটাবার সময় গতি সামান্য কমাল। সামনের আসনে বসা এক পুলিস অফিসার ঘাড় ঘুরিয়ে আবছা অন্ধকারে দাঁড়ানো পবেদার কাঠামোটার দিকে তাকাল এক পলক। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাব দেখে মনে হল ঠাহর করতে পারেনি ওখানে ওটা কি।

গাড়িটার বিলীয়মান ব্যাক লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ল। হতভাগ্য ম্যাটোফারের চেহারা, করুণ পরিণতি ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

ক্যারিয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ার পর পাক্কা দুটো ঘণ্টা রাস্তার পাশের একটা গাছে উঠে কাটিয়েছে রানা। ওর গজ ত্রিশেক সামনে পথের ওপর কাত হয়ে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলেছে দশ টনি বিশাল ক্যারিয়ার। কমলা-সাদা রঙের অসংখ্য আগুনের শিখা উদ্দাম নৃত্য করেছে আকাশে ঝুঁটি তুলে। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি রানা।

পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত ওটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল পুব জার্মান গার্ড বাহিনীও। সারাক্ষণ মেতে ছিল তারা উচ্চকণ্ঠের হাসি-তামাশায়। ভোরের দিকে আগুন নিভে যেতে ঘাঁটিতে ফিরে যায় দলটা। তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে। যানবাহনের কোন উপায় করতে না পেরে বাধ্য হয়ে কিছুদূর হেঁটেই এগোতে হয়েছে রানাকে লাইপজিগের দিকে। তিন মাইল পেরিয়ে ছোট একটি গ্রাম, আশারস্লেবেন পৌঁছায় ও। পরে ওখানকার এক খামার মালিকের সবজিবাহী ফোক্সওয়াগেনে চড়ে লাইপজিগ।

আরও খানিকটা জড়সড় হয়ে বসল মাসুদ রানা। মুখ ফিরিয়ে ইন্টারসেকশন পর্যবেক্ষণে মন দিল। খাড়া করে রাখা ম্যাচ বাক্সের মত অজস্র চ্যাপ্টা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। পঁচিশ-ত্রিশ তলার নিচে হবে না কোনটি। ওগুলোর ফাঁক দিয়ে দূরে গম্ভীর চেহারার বিশাল এক সোনালী গম্বুজ দেখা যাচ্ছে, নিচে থেকে ছুঁড়ে দেয়া ফ্লাড লাইটের বন্যায় ঝকমক করছে। ক্রেমলিনের অসংখ্য চুড়োর একটা ওটা।

গডফ্রের উত্তেজিত কণ্ঠে সচকিত হল রানা। 'ওই যে,' হাত তুলে সামনে দেখাল সে। 'টিলসন।'

ঝট করে ঘাড় ঘোরাল রানা। চকালোভা উলিসার দিক থেকে এসে ঘুরে ক্রাসনোকলমস্কায়া উলিসায় পড়ল কুচকুচে কালো একটা হামবার। এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। চেয়ে আছে রানা, নিমেষে ঠাণ্ডার কথা ভুলে গেছে। গাড়িটা দশ গজের মধ্যে পৌঁছুতে ওটার নম্বর প্লেটটা দেখা গেল পরিষ্কার। ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট-ব্রিটিশ দূতাবাসের গাড়ি।

হামবারের পিছন দিকে নজর দিল এবার মাসুদ রানা। না, কোন ভলগা পিছু লেগে নেই। কোন গাড়িই নেই পিছনে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে অনুসরণ করা হচ্ছে না টিলসনকে। হয়ত হচ্ছে, মাঝখানে লম্বা ব্যবধান রেখে এগোচ্ছে পুলিস অথবা মিলিশিয়া। সতর্ক থাকতে হবে।

'আমি নেমে গেলে আপনি চালাবেন এটা,' চাপা স্বরে বলল গডফ্রে। বকের মত গলা লম্বা করে পলকহীন চেয়ে আছে সে হামবারের দিকে। গতি কমতে কমতে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ার মত অবস্থা ওটার, পৌঁছে গেছে পবেদার বিশ গজের মধ্যে। এমন সময় ওটার চালকের দিকের দরজাটা খুলে গেল আস্তে করে। এই সঙ্কেতটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল গডফ্রে। সে-ও ঝট করে নিজের দিককার দরজাটা খুলে ফেলল।

'ঠিকই আছে,' এক পা রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে সে। 'টিলসনই। গুড লাক, মিস্টার রানা।' বেরিয়ে গেল গডফ্রে।

এই সময় হ্যারল্ড টিলসনকে দেখতে পেল রানা, একই সঙ্গে সে-ও নেমে পড়েছে হামবার থেকে। কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই হামবারের, একই গতিতে এগিয়ে চলেছে। এতই ধীরগতিতে যে যে কেউ জোর পায়ে হেঁটেই হারিয়ে দিতে পারবে। পাঁচ-ছয় হাত দূর দিয়ে পবেদাকে পাশ কাটাতে আরম্ভ করল হামবার। রাস্তার আলোয় ওর ভেতরটা দেখা গেল পরিষ্কার, কেউ নেই ড্রাইভিং সীটে। ফার্স্ট গিয়ারে রেখে স্টিয়ারিং হুইল লক্ করে দিয়ে নেমে পড়েছে টিলসন, স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করছে হামবারের গতি।

টিলসনকে ঝড়ের বেগে এগোতে দেখে নিজের দিকের দরজা খুলে দিল মাসুদ রানা, তাড়াতাড়ি ড্রাইভারের আসনে এসে বসল। আলতো করে টেনে বন্ধ করে দিল গডফ্রের খুলে রেখে যাওয়া দরজাটা। নজর সেঁটে আছে ওর হামবারের ফেলে আসা পথের ওপর। কিন্তু কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ল না।

দৌড়ে গিয়ে চলন্ত হামবারে উঠে পড়েছে গডফ্রে। এদিকে টিলসনও নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়েছে খুদে পবেদার পেটের ভেতর। দুটো গাড়ির দুটো দরজা বন্ধ হল একই সঙ্গে। পুরো দশ সেকেন্ডও লাগেনি বিনিময় কর্মটি সারা হতে।

স্টার্ট দিল রানা। হিটার অন করে 'গরম বাতাস' লেখা নবটা ঘোরাল। ড্যাশ বোর্ড প্যানেলের নিচের দিকের বড় দুটো ঝাঁঝরি গলে হু হু করে উত্তপ্ত বাতাস ঢুকতে শুরু করল ভেতরে।

'জলদি! জলদি চালাও!' রুদ্ধশ্বাসে বলল টিলসন। 'দক্ষিণে চল, রিঙ রোড, কুইক!'

গিয়ার স্টিকটা নিজের দিকে টানল রানা, বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল গিয়ার বক্সে। দুটো গাড়ি ছুটল দুদিকে। নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর পর দুবার ডানে বাঁক নিল ও, বড় রাস্তায় উঠে মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলল রিঙ রোডের দিকে।

প্রায় রানার সমান লম্বা হ্যারল্ড টিলসন। রানার মত তার মাথাও ছুঁই ছুঁই করছে পবেদার ছাত। মাথা ভর্তি লাল চুল। চোখের মণি হালকা নীল। বাঁ গালে একটা কাটা দাগ আছে টিলসনের, থুতনিতে গভীর খাঁজ। অল্প কথার মানুষ। দু-চার বাক্যে প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে। দুজনের মাঝখানে সীটের ওপর খামটা রাখল। 'এর মধ্যে তোমার নতুন কাগজপত্র আছে। রুশ ট্রানজিট ডকুমেন্টস্।'

সামনে লাল ট্রাফিক সিগন্যাল জ্বলছে দেখে গতি কমাল মাসুদ রানা। খামটার দিকে তাকাল একবার, কিছু বলল না। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল। কোন গাড়ি নেই পিছনে–রাস্তা একদম ফাঁকা। পুরোপুরি থেমে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হল না, তার আগেই লাল পাল্টে সবুজ হয়ে গেল সঙ্কেত। গাড়ি গিয়ারে তুলে পিক আপ দিল মাসুদ রানা।

আবার মুখ খুলল টিলসন। টানা দশ মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে গেল। সে থামতে বিভিন্ন বিষয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল রানা, উত্তর জেনে নিল। মস্কো অবস্থানকালে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে কোন্ সঙ্কেতের কি অর্থ ধরতে হবে জেনে নিয়ে আসল প্রসঙ্গ নিয়ে মত বিনিময় করল ওরা। সবশেষে প্রশ্ন করল রানা, 'কাল সত্যিই জামানকে দেখেছিলে তুমি?'

'দেখেছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল টিলসন। 'স্পাসকি গেটের কাছে অপরিচিত কয়েকজনের সাথে আলাপ করছিল ও। তাদের একজনের মুখ চিনি। জামানের সাথে আগেও কয়েকবার দেখেছি লোকটাকে। মুখে চাপদাড়ি আছে লোকটার, বাদামী রঙের। তবে পরিচয় জানি না।'

'তারপর?'

'কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভিড়ের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল সবাই। জানোই তো, সারাদিন লেনিনের সমাধি দর্শনার্থীদের কী প্রচণ্ড ভিড় লেগে থাকে ওখানে।' একটু বিরতি দিয়ে চিন্তিত গলায় বলল সে, 'বড্ড টেনশনে আছি, দোস্ত। এখন ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে কোন ফাঁদে পড়েছে জামান শেখ। কেন এমন মনে হচ্ছে নিজেও জানি না, তবে হচ্ছে। রীতিমত আতঙ্কিত বোধ করছি আমি। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, গেছে তাহলে আমাদের যৌথ নেটওয়র্ক। তোমরা তো গেছই, সঙ্গে আমরাও...'

টিলসনের কথা এখন আর কানে ঢুকছে না। বিসিআইয়ের অন্য এআইপি-দের কথা ভাবছে মাসুদ রানা। সবাই তারা ডীপ কভার এজেন্ট, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদেশের প্রায় সবখানে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়। টিলসনের আশঙ্কা সত্যি হলে চরম সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না। তাদের কভার ফাঁস হয়ে গেলে সব শেষ। সে-ক্ষেত্রে এ বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার

একটিই পথ আছে, এখনই সবাইকে গা ঢাকা দিতে বলা।

এ ধরনের সতর্ক সঙ্কেতের একমাত্র অর্থ—যে যেখানে যেভাবে আছ, এই মুহূর্তে কেটে পড়ো। গা ঢাকা দাও। নিজের পৈতৃক প্রাণ এবং দেশের মান বাঁচাও। এই মুহূর্তে বলতে এই মুহূর্ত-ই। এক আধ ঘণ্টা দূরে থাক, দুচার মিনিট দেরিতেও নয়। সে ক্ষেত্রে আচমকা গায়েব হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে অন্যদের মনে, সন্দেহ দেখা দেবে। এবং হয়ত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

টিলসনের আশঙ্কা সত্যি হলে অবশ্য ওটা কোন সমস্যা হবে না, কিন্তু সত্যি না হলেই সমস্যা। বিপদের আশঙ্কায় ঘাঁটি ছেড়ে একবার বেরিয়ে পড়লে স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাওয়ার আর কোন পথই থাকবে না তাদের। সেক্ষেত্রে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে, নতুন লোক বাছাই করতে হবে এবং বছরের পর বছর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদের আগের জায়গায় ইনফিলট্রেট করতে।

কাজেই এখনই কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে যাওয়া ঠিক হবে না। উপায় নেই। আশঙ্কাটা সত্যি না-ও তো হতে পারে। অতএব? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। হয়ত দু'চারজনকে…। ভিউ মিররে এক জোড়া আলো দেখা গেল, পবেদার এইমাত্র ফেলে আসা একটা বাঁক ঘুরে এমুখো হয়েছে একটা গাড়ি। দুই হেডলাইটের মধ্যবর্তী ব্যবধানটুকু লক্ষ করে সতর্ক হয়ে উঠল ও। কোন সন্দেহ নেই—ওটা ভলগা।

হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা। 'এই গাড়ির কাগজপত্র?'

'এর মধ্যেই সব আছে,' খামটার গায়ে দুটো টোকা দিল টিলসন। 'কেন?'

'জলদি বের করো!' বলতে বলতে নিজের ওভারকোটের পকেট থেকে আরেকটা প্রায় একই রকম খাম বের করল রানা। ওটার মধ্যে আছে ওর পুব-জার্মান ডকুমেন্টস। খামটা নিজেই গুঁজে দিল ও টিলসনের সাইড পকেটে।

'ব্যাপার কি?' বিস্মিত হল লোকটা।

'জোরে জোরে পড়ে শোনাও আমার নাম-ঠিকানা।' মিররে সেঁটে আছে রানার চোখ। ভলগার সঙ্গে পবেদার ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। এখনও পর্যন্ত গতি বাড়ায়নি রানা, অর্থাৎ ভলগা বাড়িয়েছে। টিলসনও লক্ষ করল এবার ব্যাপারটা।

'পিছু লেগেছে নাকি?' খামের ভেতরের কাগজগুলোর একটা বের করল টিলসন।

'সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'নাম, মিখাইল জিভরস্কি,' কাগজটা উঁচু করে ভলগার হেডলাইটের আলোয় দেখে দেখে পড়তে আরম্ভ করল টিলসন। 'বয়স আটাশ। জন্ম, অক্টোবর ২৯, ১৯—। জন্মস্থান, মস্কো, কুনচেভো ডিস্ট্রিক্ট। এছাড়া উচ্চতা, ওজনসহ অন্যান্য বর্ণনা সবই তোর সাথে…'

'পড়া শেষ করো!' ধমক মারল রানা।

'পিতা, মৃত ভ্যালেরি জিভরস্কি। ট্রোইস লিকোভো ডিস্ট্রিক্টের এক মোটর

গাড়ি নির্মাণ কারখানার শ্রমিক ছিল সে। সেখানে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তার ১৯-সালে। মিখাইল জিভরস্কির, মানে, তোর মা…'

আচমকা এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল রানা ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে। দেখতে যতই ঝক্কর মার্কা হোক, পবেদার এঞ্জিনটা দারুণ। হুঙ্কার ছেড়ে সামনে ঝাঁপ দিল গাড়ি, উড়ে চলল বাতাসের আগে। অনেক কাছে এসে পড়েছিল ভলগা, এইবার দ্রুত পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

সামনেই 'এল' প্যাটার্নের একটা বাঁক। কিন্তু রানার মধ্যে গতি কমানোর কোন লক্ষণ নেই দেখে প্রমাদ গুণল হ্যারল্ড টিলসন। দুহাতে সামনের ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকল চোখ বুজে। গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়েই বাঁক নিল পবেদা। তীক্ষ্ণ আওয়াজে পুরো এলাকা কাঁপিয়ে দিয়ে আবার ছুটল তাড়া খাওয়া শিয়ালের মত।

পর পর দুটো লাল ট্রাফিক সঙ্কেত অগ্রাহ্য করল মাসুদ রানা। দেখেও না দেখার ভান করল। সড়ক প্রায় যানবাহন শূন্য, ওর এই আইনভঙ্গের ব্যাপারটি চোখে পড়েনি কারও। আবার বাঁক নিল রানা একটা চার মাথায় পৌঁছে, ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করে রাখা তিনটে বিশাল ট্রাকের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

আগেই লক্ষ করেছে রানা পিছনের আলোজোড়া নেই, প্রথমবার বাঁক নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত দেখা নেই ভলগার। পূর্ণ গতিতে পর পর দুটো বাঁক নেয়ার ফলে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল টিলসন। এবার সিধে হয়ে বসল। 'দারুণ চলে তো চলে গাড়িটা, কি বলো?' বাঁ হাতে নরম সীটে দুটো চাপড় মারল সে।

উত্তর দিল না রানা। সামনে আরেকটা বাঁক চোখে পড়েছে। একটা ইন্টারসেকশন। চট করে গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিল ও, সংযোগ-স্থলে পৌঁছে দ্রুত বাঁক নিল ডানে। পঞ্চাশ গজ এগোতে আরেকটা সরু রাস্তা পড়ল বাঁয়ে। পার্ক করে রাখা লম্বা এক সারি ট্রাক দেখা যাচ্ছে সে রাস্তায়, অন্ধকারে ডুবে আছে সব কটা।

নিজেকে ভাবনা-চিন্তার বেশি সময় দিল না মাসুদ রানা। ঢুকে পড়ল ওই রাস্তায়। ট্রাক বহরের পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই দুটো ট্রাকের মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল—খুদে পবেদার জন্যে যথেষ্ট। ব্যাক করে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল রানা ওখানটায়, কড়া ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল জায়গায়। এবার দ্রুত খানিকটা পিছিয়ে এসে পিছনের ট্রাকটার বাম্পারে পবেদার বুট ঠেকিয়ে অবস্থান নিল।

সামনের জায়গাটুকু ফাঁকা রেখেছে আবার দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতে হলে প্রয়োজন পড়বে বলে। স্টার্ট বন্ধ করে দিল রানা, সবশেষে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সামনের চাকাজোড়া যথাসম্ভব খোলা রাস্তামুখো করে রাখল। আশেপাশে মানুষজনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ির পাহারায় কেউ নেই সম্ভবত। না থাকাটাই স্বাভাবিক, এ দেশে ওসবের প্রয়োজন পড়ে না।

রানার ডান দিকে অনেকগুলো আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। জানালার

কাঁচ ইঞ্চি দুয়েক নামিয়ে সেদিকে কান পেতে বসে থাকল ও। পিছনের গাড়িটা যদি এদিকে আসে ওগুলোর গায়ে তার আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলবে।

'সবটা পড়া হল না,' বলল টিলসন।

'দরকার নেই। জেনে এ মুহূর্তে কোন লাভও নেই। আমি জার্মান রুশ যে-ই হই, একজন দূতাবাস অফিসারের সাথে এক গাড়িতে কেন ধরা পড়লে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারব না ব্যাটাদের। কাজেই ধরা যাতে না পড়তে হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।' থেমে কান পাতল মাসুদ রানা। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। বিল্ডিঙে ধাক্কা খেয়ে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসছে দ্রুত ধাবমান একটি এঞ্জিনের আওয়াজ–এদিকেই আসছে। 'গাড়ি নিয়ে যদি না-ই পারি,' বলল ও, 'ফেলেই পালাতে হবে।'

'ঠিক আছে।' কাগজগুলো ভেতরে রেখে খামটা রানার পকেটে ভরে দিল টিলসন। 'কাগজপত্র জাল নয় কিন্তু, আসল, বুঝলি? কেবল নাম-ঠিকানা ভুয়া।'

আওয়াজটা অনেক বেড়ে গেছে। তুমুল গতিতে ছুটে আসছে ইন্টারসেকশনের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর বাঁক নিল, বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলল এঞ্জিন গিয়ার বদলের সময়। বিল্ডিংগুলোর এমাথা ওমাথা পরশ বুলিয়ে গেল ওটার হেডলাইট পলকের জন্যে। পরক্ষণেই জমে গেল মাসুদ রানা। মনে হল একটা নয়, দুটো গাড়ি আসছে। প্রমাদ গুণল ও। একাধিক গাড়ি হলে আশা নেই।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল টিলসন। 'দুটো?'

'কি?'

'দুটো গাড়ি মনে হচ্ছে না?'

'হুম!'

প্রথমটা প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। বেগতিক দেখে ইগনিশন কী চেপে ধরল রানা দুআঙুলে, ওটার হেডলাইট এমুখো হলেই স্টার্ট দেবে। অন্য হাতে গিয়ার স্টিক মুঠো করে ধরে ক্লাচের ওপর আলতো করে এক পা রাখল। 'খামের ভেতর জামান সম্পর্কে কোন তথ্য আছে? স্থানীয় বন্ধু-বান্ধব, মুভমেন্টস···?'

'সব আছে। তোর বস্ তথ্যগুলো তৈরি করে রাখতে বলেছিলেন।'

মনে মনে বুড়োকে ধন্যবাদ জানাল রানা। অস্ফুটে বলল, 'ভেরি গুড।'

দিশেহারার মত গলিমুখ পেরিয়ে গেল প্রথমটা বিদ্যুৎবেগে। ওরা দুজনেই দেখতে পেল গাড়িটা পলকের জন্যে–বোঁচামুখো ভলগা। ত্রিশ সেকেন্ড পর এল দ্বিতীয়টা। আগেরটার দেখাদেখি সে-ও ছুটল সোজা নাক বরাবর। কমতে কমতে এক সময় মিলিয়ে গেল জোড়া এঞ্জিনের আওয়াজ।

ধৈর্য ধরে আরও দশ মিনিট বসে থাকল মাসুদ রানা। তারপর আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ি ঘুরিয়ে যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে চলল আবার স্বাভাবিক গতিতে।

ছয়

'সুপ্রভাত, বুড়ি মা।'

ঝট করে মুখ তুলল বৃদ্ধা। উঁচু ছাতওয়ালা বিশাল হলরুমের সিঁড়িগোড়ায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সে আধশোয়া ভঙ্গিতে। জুতোসহ দুই পা তুলে রেখেছে একটা কেরোসিন স্টোভের চওড়া কিনারায়। চামড়ার ওপরের দিকে সুতোর মত অসংখ্য আঁকাবাঁকা চিড় ধরা দাদার আমলের জুতোজোড়া গরম করে নিচ্ছে আগুনের আঁচে।

এতবড় হলরুমে একটাই মাত্র আলো। ঠিক বুড়ির মাথার ওপর ঝুলছে একটা নগ্ন বাল্‌ব্। অন্ধকার তাড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে ওটা। সে আলোয় বুড়ির পাকা চুলগুলো চিকচিক করছে। মুখের চামড়া তার জ্বরাগ্রস্তের মত কোঁচকানো। দাঁত নেই একটিও। তবে চেহারা দেখে বোঝা যায় যৌবনে অনেক পুরুষের রাতের ঘুম হারাম হয়েছে এর জন্যে।

'কি চান আপনি, কমরেড?' সন্দেহের দৃষ্টিতে মাসুদ রানার আপাদমস্তক চোখ বোলাল বৃদ্ধা কয়েকবার। 'কি নাম আপনার?'

'মিখাইল জিভরস্কি। ইউরি ঝুকভের সাথে দেখা করতে চাই। আছে না সে?'

'বলতে পারি না,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বুড়ি। 'দেখতে হবে।' ছোট ছোট পায়ে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, 'এখানেই থাকুন আপনি।' একটা একটা করে দীর্ঘ ধাপগুলো টপকাতে পুরো এক যুগ লাগিয়ে দিল বৃদ্ধা। দোতলার প্ল্যাটফর্মে উঠে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

দরজা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যায় এমন একটা জায়গায় দাঁড়াল রানা পিছিয়ে এসে। এটি দক্ষিণ মস্কোর ঘিঞ্জি এলাকা কসমোলস্কায়ার মান্ধাতা আমলের একটি তিনতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। ইউরি ঝুকভ ভবনটির আপ্রাভডম বা কেয়ারটেকার। হ্যারল্ড টিলসনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে ঝুকভের। জামান শেখের সঙ্গেও এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

এ বিল্ডিঙের অধিবাসীদের বেশিরভাগই ব্যাচেলর। ছোট ছোট কক্ষে দু-তিনজন করে থাকে। এবারকার মস্কোবাসের দিন কটা এখানেই কাটাবে মাসুদ রানা। কোন হোটেলের থেকে অনেক নিরাপদ এ জায়গা। ঘড়ি দেখল রানা, রাত সাড়ে বারোটা। এবার একটু বিশ্রাম নেয়া গেলে ভাল হত। দেহের ওপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে গত দুদিন।

ট্রাক স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে নিরাপদেই রিঙ রোডে এসে পৌঁছায় রানা আর টিলসন। নারোদনায়া উলিসায় একটা ট্যাক্সি র‍্যাঙ্কে মিনিট দশেক আগে তাকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে ও।

'এমব্যাসিতেই থাকব আমি,' যাওয়ার সময় রানাকে বলে গেছে টিলসন।

'প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করিস। আর তোর পৌঁছানোর খবর গিয়েই পৌঁছে দেব আমি ঢাকায়, চিন্তা নেই।'

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ উঠতে মুখ তুলে তাকাল রানা। ছয় ফুটের দুই-এক ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে মানুষটি। চওড়ায় ওর দ্বিগুণ। ক্রু-কাট দেয়া চুল খাড়া খাড়া। চকচকে খুলি দেখা যায় পরিষ্কার। গায়ের পুরানো গ্রেট কোট থেকে সস্তা কালো তামাকের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুর ভুর করে। চওড়া হাড়ের লোমশ হাত দিয়ে রানার ডান হাত ঝাঁকাল লোকটা। 'আমি ইউরি ঝুকভ।'

'মিখাইল জিভরস্কি।'

পিছন পিছন নেমে আসা বুড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল ঝুকভ, 'আরও আগেই আশা করেছিলাম আপনাকে। চলুন, ওপরে যাই।'

পথ দেখিয়ে রানাকে তিনতলায় নিয়ে এল লোকটা। ডানদিকের একটা চওড়া প্যাসেজ পেরিয়ে বিল্ডিঙের এক প্রান্তের ছোট একটা রুমে এসে ঢুকল। 'এটাই আপনার রুম। আহামরি কিছু নয়, তবে এই দালানের অন্যান্য রুম থেকে অনেক উন্নত।'

ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মাসুদ রানা। ফার্নিচার বলতে আছে কেবল একটা সিঙ্গেল খাট। দরজা একটা, জানালাও একটা। ভেতরটা গরম রেখেছে কাঠ কয়লার ছোট একটা ফায়ারপ্লেস। দরজার ঠিক ওপরে দেয়ালের গায়ে বসানো ঘরের একমাত্র আলোর উৎস—সম্ভবত একশো ওয়াটের একটি বাল্‌ব্। জানালার পাশে চিড় ধরা একটা হ্যান্ড বেসিন। ট্যাপের চেহারা দেখে সন্দেহ হল পানি পড়ে না ও দিয়ে।

বেসিনের ওপর একটা আয়নাও আছে। তবে ওটা দিয়ে আর যা-ই হোক, চেহারা দেখা যায় না। নোংরা দাগ পড়ে যাচ্ছেতাই হয়েছে কাঁচের চেহারা। এক কোণে মেঝের ওপর স্তূপ হয়ে আছে কিছু ম্যাগাজিন। নিশ্চয়ই বলশেভিক আন্দোলনের আগেকার হবে ওগুলো, ভাবল রানা। বেশিরভাগেরই কভার নেই। ছেঁড়াফাটা কাগজগুলো লাল হয়ে গেছে।

'এটাই টপ ফ্লোর?' ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।' চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল ঝুকভ, রানার মনের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে হয়ত। জানালার দিকে পা বাড়াল সে কি ভেবে। 'আসুন।' জানালার নিচের পাল্লা ধরে আস্তে করে ওপর দিকে টান দিল। 'দেখুন।'

পাল্লাটা এত সহজে নিঃশব্দে উঠে গেল, রানার মনে হল সাবান বা পিচ্ছিল আর কিছু লাগানো আছে ফ্রেমে। কাছে গিয়ে উঁকি দিল ও,। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগল নাকে মুখে। জানালার সামান্য পাশ দিয়ে ফায়ার এস্কেপের প্যাঁচানো সরু লোহার সিঁড়িটা নেমে গেছে নিচে। ঠিক ওটার গোড়াতেই একটা লাইট পোস্ট দেখা যাচ্ছে। চমৎকার, ভাবল রানা। প্রয়োজন পড়লে শুধু দেহটা জানালা দিয়ে গলিয়ে দিলেই চলবে।

পাল্লাটা নামিয়ে দিয়ে ওভারকোটের দুপকেটে হাত ভরে দাঁড়াল ঝুকভ। 'এটাই আপনার জন্যে সবচে' বেশি নিরাপদ। কি বলেন?'

'হলরুমের ওই বৃদ্ধা কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'ওহ্! ও একটা আধা-পাগল। আপনজন বলতে কেউ নেই। এক নাতি অবশ্য ছিল, তবে সে এখন লেবার ক্যাম্পে, উরালে। এখানেই থাকে বুড়ি, কারও সাতে-পাঁচে নেই।'

'কদ্দিন থেকে আছে?'

'তা বছর সাতেক হবে। বুড়ি জামানকে খুব পছন্দ করত।' একটা কালো ও হলুদ রঙের সিগারেট প্যাকেট বের করল ঝুকভ। রানার উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল প্যাকেটটা।

'ধন্যবাদ,' মাথা নাড়ল ও। 'টেলিফোন নেই আপনার এখানে?'

'আছে একটা। কিন্তু ওটা ব্যবহার করা ঠিক হবে না আপনার।' সিগারেট ধরাল লোকটা। 'সামনের মোড়ে ফোন বক্স আছে, ওখান থেকে করতে পারবেন। ভেতরের আলো জ্বলে না ওটার। তবে প্রয়োজন হলে বাল্বের প্যাঁচটা ঘুরিয়ে কষে দিলেই জ্বলে উঠবে।'

'আয়োজনটা আপনিই করেছেন নিশ্চই?' একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠছে মাসুদ রানা। পছন্দ হয়েছে ওর লোকটিকে।

'ঠিক ধরেছেন। প্রায়ই আপনার মত অতিথিদের সেবা করতে হয় বলে ব্যবস্থাটা স্থায়ী করে ফেলেছি।' এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল ঝুকভ। 'কোন ভিজিটর আসবে না তো আপনার?'

'না।'

'গুড। বিশ্রাম করুন তাহলে। আমি অবশ্য সবসময় থাকি না। কোন কিছু প্রয়োজন হলে বুড়িকে বলবেন, আমি খবর পেয়ে যাব।'

ঝুকভ বিদেয় নিতে দরজাটা বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। যথাসম্ভব কম শব্দ তুলে খাটটা টেনে নিয়ে এল দরজার কাছে, ওটার এক মাথা ঠেকিয়ে দিল দরজার সঙ্গে। এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত। পকেট থেকে টিলসনের দেয়া খামটা বের করল রানা। জামান শেখের সাম্প্রতিক মুভমেন্টস সম্পর্কে কি কি তথ্য আছে জানা দরকার।

স্টার কাফে। ইহুদী মালিকানাধীন। নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রচুর মানুষ ভেতরে। বেশিরভাগই অল্প বয়সী। সিগারেটের ধোঁয়ার একটা স্তর বাতাসে ভর দিয়ে ভাসছে। প্রায় প্রতিটি টেবিলেই খবরের কাগজ আছে, সুপ পান করার ফাঁকে ফাঁকে তাতে নজর বোলাচ্ছে খদ্দেররা। এরা সবাই ইহুদী। এবং নিয়মিত। কয়েকটি টেবিল থেকে উচ্চ কণ্ঠের কথাবার্তা ভেসে আসছে। আলাপের বিষয় একটিই—ওলেগ পেঙ্কোভস্কি। লোকটিকে যে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কারও।

'উই যে, কোণের টেবিলে বসা লাল দাড়িওয়ালার মুখোমুখি,' রানার প্রশ্নের উত্তরে হাত তুলে সুন্দরী যুবতীটিকে দেখিয়ে দিল কাউন্টারে বসা লোকটি।

ভিড় ঠেলে সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। বক বক থামিয়ে চোখ তুলে

তাকাল কেউ কেউ কঠোর চোখে। কিন্তু আগন্তুকের নজর ওদের দিকে নেই দেখে আবার নিজের নিজের কাজে মন দিল। ব্যাটারা ওকে টিকটিকি মনে করেছে হয়ত, ভাবল রানা। অবশ্য দোষ দেয়া যায় না এদের। ভেতরে ঢুকেই টের পেয়ে গেছে ও, মূল প্রবেশপথের দুদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই স্থির চাউনির লোক আর যা-ই হোক, সাধারণ কেউ নয়। রানাকেও ওই দলের ভেবেছে এরা।

নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ও। এক চামচ সোলিয়াঙ্কা বা সুপ মুখের সামনে তুলেছিল মেয়েটি, থেমে গেল চওড়া গোঁফওয়ালা অপরিচিত লোকটিকে দেখে। ঠিক পান পাতার মত গড়ন এলিনার মুখের। মসৃণ, সামান্য তেলতেলে ত্বক। দীর্ঘ হরিণ চোখ, কুচকুচে কালো লম্বা পাপড়ি। মাঝ পিঠ পর্যন্ত লম্বা চুলের রঙ কটা। রানাকে একভাবে চেয়ে থাকতে দেখে তার সুন্দর ভুরুজোড়া অনেকটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের রূপ নিল।

'এলিনা?' প্রশ্ন করল রানা।

'কোন এলিনা?' পাল্টা প্রশ্ন করল দাড়িওয়ালা। মেয়েটির মুখোমুখি বসে আছে লোকটা। বিশালদেহী লোমশ গরিলার এক খুদে সংস্করণ। কুঁতকুঁতে চোখে রানাকে মাপছে। দাড়ির রঙ দেখেই বুঝে নিয়েছে রানা, এ লোক স্পাসকি গেটের কাছে জামানের সঙ্গে টিলসনের দেখা সে লোক নয়। যে কারণে তেমন আগ্রহ দেখাল না তার ব্যাপারে।

'এলিনা ইয়াকোভলেভনা?' আবার বলল রানা। গরিলার দিকে তাকাবার গরজ দেখা গেল না ওর মধ্যে।

মেয়েটি কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই আবার খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'কে আপনি? কি দরকার এলিনার কাছে?'

দুহাত টেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল রানা। এবারও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল লোকটাকে, যেন তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয় ও। মেয়েটির চোখে চোখ রেখে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'জামান শেখের বন্ধু আমি।'

পলকে মুখের ভাব পাল্টে গেল মেয়েটির। হঠাৎ করেই যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। জামানের প্রেমিকা এলিনা, টিলসনের দেয়া তার সাম্প্রতিক মুভমেন্টস-সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রেকর্ডে এ তথ্য পেয়েছে মাসুদ রানা। তাছাড়া ঝুকভের মুখেও শুনেছে এর কথা।

'আপনি কালা নাকি, সাহেব?' বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে গরিলা। 'বললেন না কি দরকার আপনার এলিনার কাছে? ও আপনার সাথে আলাপে আগ্রহী নয়। যান, নিজের কাজে যান!'

এবার মুখ খুলল সুন্দরী! দৃষ্টি পাল্টে গেছে, অনুসন্ধানীর চাউনি এখন দুচোখে। 'আপনি কে?' মোলায়েম গলায় জানতে চাইল সে।

'মিখাইল জিভরস্কি। জামানের বন্ধু। ওর ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।'

কাফের কলগুঞ্জন আচমকা থেমে গেল। কি কারণে যেন চুপ হয়ে গেছে সবাই। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাতে গিয়েও সামলে নিল মাসুদ রানা।

এলিনার চেয়ারের পিছনের দেয়ালে কাঁচ বাঁধানো প্রকাণ্ড এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ওর ভেতর দিয়ে তাকাল ও। আরও দুই কঠোর চেহারার আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে ভেতরে। দরজার দুপাশে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়াল তারা। নিচু গলায় আলাপ করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। কিন্তু নজর নেচে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

বুকটা ধড়াশ্ করে উঠেছিল রানার প্রথমে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পরও লোকগুলোর মধ্যে কোন অ্যাকশনের আভাস না পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। মিনিটখানেক পর আবার কথাবার্তা শুরু করল খদ্দেররা। তবে আগের মত মুক্ত কণ্ঠে নয়।

'কার বন্ধু বললেন?' জিজ্ঞেস করল দাড়িওয়ালা। সামনের সুপের বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিল, খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।

হঠাৎ পাশের টেবিল থেকে চেঁচিয়ে উঠল এক ইহুদী যুবক। 'আরে রাখো! ওসব বিচার-টিচার সব সাজানো নাটক। উঁচু পদে কোন ইহুদী চাকরি করবে সহ্য হয়নি শালাদের। যে জন্যে···

'শ্‌শ্‌শ্!' পাশে বসা এক তরুণী তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিল তার। 'আস্তে বলো, শুনে ফেলবে তো!'

'জাহান্নামে যাক!' খেঁকিয়ে উঠল যুবক।

মনে মনে দোয়া দরুদ পড়তে শুরু করে দিয়েছে রানা। ভয় পাচ্ছে, এখনই হয়ত পাইকারী গ্রেফতার আরম্ভ হয়ে যাবে। কাঁচের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছে ও পলকহীন। কিন্তু নড়াচড়ার লক্ষণ নেই লোকগুলোর মধ্যে। যতক্ষণ সম্ভব ঝামেলা এড়িয়ে চলার হুকুম আছে তাদের ওপর।

আস্তেধীরে আসন ছাড়ল এবার এলিনা ইয়াকোভলেভনা। টেবিল থেকে সীলের চামড়ার তৈরি নিজের হ্যাটটা তুলে নিল। 'আমি একটু আসছি,' গরিলার উদ্দেশে বলল সে। এক হাতে চুল ঠিক করে মাথায় চাপাল ফার হ্যাট। 'তুমি বোসো।'

'আমিও না হয় আসি!' ওঠার ভঙ্গি করল লোকটা।

'না। তুমি থাকো। আমার জন্যে আরেক বাউল গরম সোলিয়াঙ্কার অর্ডার দাও, কেমন?'

মেয়েটিকে পাশে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। বেরোবার সময় হঠাৎ করেই কাশতে শুরু করল ও। দস্তানা পরা দুহাতে মুখ ঢেকে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এল রাস্তায়। এই ফাঁকে নকল গোঁফজোড়া খুলে নিয়েছে। ভেতরে যারা ওকে দেখেছে, এখন আর তাদের কেউ চিনতে পারবে না। ব্যাপারটা লক্ষ করে বেশ অবাক হল এলিনা, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

কাফের গজ বিশেক দূরে দাঁড়ানো সেই দুই মিলিশিয়া এখনও আছে। ভেতরে ঢোকার সময় ওখানেই দেখেছিল রানা তাদের। শীত তাড়াবার জন্যে ঘোড়ার মত পা ঠুকছে থেকে থেকে। সাদা মেঘের মত নিঃশ্বাস ছাড়ছে মোটা ধারায়। রানা-এলিনার দিকে ঘুরে তাকাল লোক দুটো। তাদের সামান্য তফাতে একটা কালো ভলগা পার্ক করা। আগে ছিল না ওটা ওখানে।

'আপনার নাম কি বললেন যেন?' প্রশ্ন করল মেয়েটি।

'শুনে লাভ নেই।'

দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল এলিনা, কিন্তু দিল না রানা। কনুই ধরে টেনে নিয়ে চলল। চাপা গলায় বলল, 'থামবেন না। ওরা লক্ষ করছে আমাদের।'

দ্রুত মেইন রোডের দিকে হাঁটতে লাগল ওরা। রানার পবেদা আছে ওখানে। পঞ্চাশ গজ এগোতে আরও দুই জোড়া মিলিশিয়ার পাশ কাটাল দুজনে।

'আমার খোঁজ পেলেন কি করে?' ঘন ঘন রানার মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি। নির্জন রাস্তায় অচেনা মানুষটির সঙ্গ হয়ত অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে। ওদিকে রানা ভাবছে মিলিশিয়া ওয়াচারদের কথা। জনশূন্য রাস্তায় শীতের মধ্যে বিনা কাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই ত্যক্ত হয়ে উঠেছে ব্যাটারা। বলা যায় না হয়ত কাজ একটা পাওয়া গেছে ভেবে ডেকে দাঁড় করিয়ে দেবে ওদের যে-কোন মুহূর্তে। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলবে, হয়ত কাগজপত্রও দেখতে চাইবে।

'আপনার পরিচিত একজনের কাছে।'

'কে সে?'

'ইউরি ঝুকভ।'

'ও নামে কাউকে চিনি না আমি।' বিরক্ত মনে হল এলিনাকে।

'জামানের খোঁজ জানতে চান না আপনি?' চকিতে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল মাসুদ রানা।

'নিশ্চই!' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল এলিনা, 'কিন্তু ওরা…'

'তাহলে আমার ওপর আস্থা রাখুন। আমার কথামত চলুন। ঝুকভকে চেনেন আপনি। জামানের সাথে তার ওখানে অনেকবার গিয়েছেন। ও নিখোঁজ হওয়ার পরও বেশ কয়েকবার গিয়েছেন ঝুকভ তার কোন খোঁজ জানে কিনা জানতে। ঠিক না?'

'হ্যাঁ।' এবার যেন কিছুটা সহজ হল এলিনা ইয়াকোভলেভনা।

'এরা সব সময়ই নজর রাখে নাকি ওই কাফের ওপর?'

'পেস্কোভস্কির বিচারের রায় বেরোবার পর থেকে ইহুদী অধ্যুষিত সবখানেই আছে ওরা, সব সময়। কাফেটা ইহুদীর, ওখানে এখন যারা আছে সবাই ইহুদী। নতুন করে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা করছে।'

'আপনি কেন এর মধ্যে?'

'এমনিই আসি আমি মাঝে মাঝে। খুব ভাল সোলিয়াঙ্কা তৈরি করে এরা। তাছাড়া…বাসার কাছেই…তাই আর কি!'

'আপনার সঙ্গের লোকটি কে ছিল?' ও জানে, ভয়টোভিসা উলিসায় থাকে মেয়েটি।

'ওহ্, ও আমার কোলিগ। আমি খুব্ দুঃখিত, লোকটা খারাপ ব্যবহার করেছে আপনার সাথে।'

'ও কিছু না।' অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে এখন মাসুদ রানা। দৃষ্টিসীমার

মধ্যে আর কোন ওয়াচার নেই এ মুহূর্তে। কাফের দেড়শো গজ মত দূরে সরে এসেছে ওরা। 'লোকটা চেনে জামানকে?'

'নাহ্! বললেন ওর খোঁজ জানাবেন। কিন্তু ও যে কেজিবি-র হাতে ধরা পড়েছে জানেন না আপনি?'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'জামানের আরেক বন্ধু, কিরভ।'

'কবে বলেছে?'

'গতকাল।'

হঠাৎ করেই সামনের মোড় ঘুরে উদয় হল আরও একজোড়া মিলিশিয়া। নীরবতার মাঝে তাদের স্টীলের পাত বসানো ভারী বুটজুতোর জোরাল আওয়াজ উঠছে। এদিকেই আসছে। দ্রুত হিসেব কষতে শুরু করল রানা। পবেদাটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ওরা আর ওয়াচাররা প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছুবে গাড়ির কাছে।

ও ব্যাটাদের আগে পৌঁছুতে হলে জোরে পা চালাতে হবে। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না, চোখে পড়ে যাবে ওদের ব্যাপারটা। রানার ধারণা আগের ওয়াচাররা ওদের অতটা গুরুত্ব না দিলেও এরা ঠিক দাঁড় করিয়ে দেবে। এরা অল্পবয়সী, নিজেদের ইউনিফর্ম এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বেশি-বেশি সচেতন। আর কিছু না হোক, নির্জন রাতে পথের মাঝে সুন্দরী এক নারীর সঙ্গে দু-একটা বাক্য বিনিময় তো হবে। একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে তা-ই বা কম কিসে!

ওদের এড়াবার কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে হতাশ হল মাসুদ রানা। কিন্তু ভাবটা সযত্নে চেপে রাখল। এলিনা টের পেলে ঘাবড়ে যাবে, বিপদে পড়তে হবে দুজনকেই।

'কিরভ কে? কি করে সে?'

'চাকরি-ই করে খুব সম্ভব, ঠিক জানি না। তবে পার্টি যে করে তা জানি। পার্টির প্রাথমিক সদস্য।'

'মস্কোয় জামান শেখের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি ওর···

'আমি ভালবাসি জামানকে। ওর খোঁজে···' হঠাৎ করে থেমে গেল এলিনা। গলা বুজে গেছে আবেগে। তার বাহুতে মৃদু চাপ দিল রানা সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে।

'নিরাশ হবেন না। ওকে খুঁজে বের করব আমি।'

'কি ভাবে! আপনি কি পার্টির লোক? কারাগার থেকে কি করে বের করবেন আপনি ওকে? তাছাড়া কোন কারাগারে রাখা হয়েছে, তাই বা···'

'সে জানা যাবে। আর ওকে বের করাটাও খুব একটা সমস্যা হবে না।'

কিরভ কোত্থেকে জামানের গ্রেফতার হওয়ার খবর পেল? ভাবছে রানা, কে তাকে এ খবর সরবরাহ করল। একে খুঁজে পেতে হবে ওর, সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'কিরভের পুরো নাম বলুন।'

'কাপিস্তা কিরভ। ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভ।'

বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে দুই মিলিশিয়া। হাঁটার মধ্যে ভারিক্কি একটা ঢঙ রয়েছে। দ্রুত প্রশ্ন করল রানা, 'এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল জামানের?'

'মোটামুটি।'

'আর দু'একজন বন্ধুর নাম বলুন ওর। জলদি!'

'মনে পড়ছে না তেমন কারও কথা। ওর আসলে বেশি বন্ধু ছিল না যতদূর জানি।'

'বেশ। এলিনা, আপনার পরিচয়পত্র ভ্যালিড আছে তো?'

'নিশ্চই!' বিস্মিত হল মেয়েটি। 'কেন?'

'ওই দুজন,' চোখ ইশারায় লোক দুটোকে দেখাল রানা, 'হয়ত দাঁড় করাবে আমাদের। যদি কিছু প্রশ্ন করে, দু-এক কথায় উত্তর দেবেন। ভুলেও জামান কিরভ বা ঝুকভ-কারও নাম মুখে আনবেন না, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল মেয়েটি।

'আমি মিখাইল জিভরস্কি। এছাড়া আমার ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি। ঘণ্টাখানেক আগে স্টার কাফেতে পরিচয় হয়েছে আমাদের। আমরা দুজনেই ক্লাসিক মিউজিকের ভক্ত। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

আর দশ গজ!

'গুড।' ডান হাত তুলে এলিনার কাঁধ বেড় দিয়ে ধরল রানা। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে উঠল মেয়েটি। চাপা গলায় বলল ও, 'ঘাবড়াবেন না। কোন খারাপ মতলব নেই আমার।'

পাঁচ গজ!

'আসলে তচাইকোভস্কির সমস্যা হল,' গলা চড়িয়ে গল্প আরম্ভ করল মাসুদ রানা, 'আমার মনে হয়, বেশি ওস্তাদী দেখাতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেলে লোকটা। তাল ঠিক থাকে তো লয় ঠিক থাকে না, লয় ঠিক থাকে তো আর কোথাও একটা না একটা গোলমাল সে ঘটাবেই। অবশ্য সবাই ধরতে পারে না ব্যাপারটা। আনাতোলি বলে...'

পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মিলিশিয়ার ওপর যেন হঠাৎ করেই চোখ পড়ল রানার, থেমে গেল ও। বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে লোক দুটো। মাথায় পাহাড়চূড়োর মত সামনের দিক উঁচু হ্যাট। অস্ত্রাখান গ্রেট কোট কোমরের কাছে পালিশ করা চকচকে চওড়া বেল্ট দিয়ে কষে বাঁধা। বেল্টের বাঁ দিকে মোটা ব্যাটন, ডানদিকে হোলস্টারে পোরা রিভলভার ঝুলছে। দুজনের হাতেই রয়েছে ওয়াকি-টকি।

বাঁ-দিকেরজন একটা হাত পাতল রানার সামনে। 'প্রপুস্ক' (পেপার্স)।

নিঃশব্দে নিজের আইডেন্টিটি কার্ড বের করে সে হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। কার্ডটা রাস্তার আলোর দিকে ঘুরিয়ে মেলে ধরল লোকটা, চোখ কুঁচকে পরীক্ষা করতে লাগল। হন্যে হয়ে খুঁজছে কোথাও তিল পরিমাণ গণ্ডগোল পাওয়া যায় কি না। সেখানে ব্যর্থ হয়ে ছবির সঙ্গে ওর চেহারা মেলাতে ব্যস্ত

হয়ে উঠল। 'ওই কাফেতে ছিলেন আপনারা নিশ্চই?' প্রশ্ন করে বসল লোকটা আচমকা।

মেয়েটির কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে তাকে কথা বলতে বারণ করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তার আগেই মুখ ফসকে গেছে তার। 'হ্যাঁ,' বলে বসল এলিনা। 'ছিলাম।'

'এবং পেঙ্কোভস্কির বিচারের রায় সম্পর্কে গরম গরম ভাষণ ছাড়ছিলেন?'

'না।' দ্রুত মাথা দোলাল রানা। 'তচাইকোভস্কির মিউজিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা।'

'আসলেই তচাইকোভস্কি?' হাসি হাসি মুখ করল লোকটা। 'না বিশ্বাসঘাতক পেঙ্কোভস্কি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তার ব্যাপারেও আলোচনা করেছি। তবে কাফেতে নয়, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। ও বলে, আমাদের উচিত ছিল বিচার চলার সময় সুপ্রীম কোর্টে হামলা চালিয়ে পেঙ্কোভস্কিকে ছিনিয়ে আনা।'

'আচ্ছা!' কঠোর হয়ে উঠল লোকটার চেহারা। থমথমে গলায় বলল, 'তারপর?'

হেসে উঠল রানা শব্দ করে। 'তারপর কাছের ল্যাম্প পোস্টের সাথে ব্যাটাকে ফাঁসিতে লটকে দেয়া। ওর মত বিশ্বাসঘাতককে ধরামাত্র ফাঁসীতে ঝোলান উচিত ছিল। তার ধারণা সুপ্রীম কোর্ট লোকটার প্রতি বেশি দয়া দেখিয়েছে।'

'অ!' আশ্বস্ত হল লোকটা। অন্যজন রাস্তায় পা ঠুকল, শীত তাড়াবার চেষ্টা করছে। 'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?' কঠোর চেহারা মোলায়েম হয়ে গেছে তার এরই মধ্যে।

'বাসায়,' বলল রানা।

'কিন্তু আপনি তো এদিকে থাকেন না, থাকেন উল্টোদিকে।'

'মানে, আগে আমার বান্ধবীকে তার বাসায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছি আর কি।'

রানার পরিচয়পত্রের ভাঁজ বন্ধ করল লোকটা। কার্ডটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কেন? আপনি বলতে চাইছেন শহরের রাস্তাঘাট আপনার সুন্দরী বান্ধবীর জন্যে নিরাপদ নয়?'

'মোটেই না। মোটেই না। আসলে আমি এঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করছি বলতে পারেন।' কার্ডটা পকেটে পুরল রানা। মনে মনে লম্বা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

ক্ষীণ হাসি ফুটল মিলিশিয়ার মুখে। 'আশা করি তিনিও আপনার সঙ্গসুখ উপভোগ করছেন। কিন্তু রাত অনেক হয়েছে, কমরেড। এ সময় রাস্তায় থাকা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি যার যার বাসায় চলে যান।'

সুখারেভস্কায়া রিঙ রোডের একটা পাবলিক ফোন বুদের সামনে পবেদা দাঁড় করাল মাসুদ রানা। এলিনা ইয়াকোভলেভনাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে। দুই কোপেকের একটি ধাতব মুদ্রা স্লটে ফেলতেই নীরব ফোন সরব

হল। কাঙ্ক্ষিত নম্বর ঘোরাল রানা।

'গুন্থার আছে?' প্রশ্ন করল ও।

'কি বললেন?'

'গুন্থারকে চাইছিলাম।'

'দুঃখিত। এ নামে কেউ নেই এখানে। এটা ব্রিটিশ এমব্যাসি।'

'ও। মাফ করবেন। ভুল হয়ে গেছে আমার।'

'না, ঠিক আছে, স্যার।'

একজন মেসেঞ্জার দরকার মাসুদ রানার, তাই এই রঙ নম্বরের প্রহসন। এমব্যাসির প্রতিটি ফোন কল ট্যাপ করে কেজিবি। রেডিওর সাহায্যে কথা বলার প্রশ্নই আসে না। বাকি থাকল সাঙ্কেতিক ভাষায় ফোনে কথা বলা। ওটা অনেকটা স্লো বার্নিং ফিউজের মত। বার্তা সাঙ্কেতিকই হোক আর হায়রোগ্লিফিক-ই হোক, প্রতিটি শব্দ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যাবে। ওখানেও কেজিবি। যে জন্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী 'গুন্থারের' খোঁজ।

গুন্থার বলতে তাগানস্কায়া মেট্রো স্টেশন। ফোন রেখেই রওনা হয়ে পড়ল রানা। প্রায় নির্জন সড়ক ধরে তীর বেগে ছুটল ওর খুদে পবেদা। গাড়িঘোড়া বলতে গেলে নেই-ই। কেমন গা ছমছমে ভাব। চোদ্দ মিনিটের মাথায় নিরাপদেই তাগানস্কায়া পৌঁছুল রানা।

গাড়ি পার্ক করে ভেতরে অপেক্ষমাণ ট্রেন যাত্রীদের ভিড়ের নিরাপত্তায় গা ভাসিয়ে দিল। এত বিশাল আর ঝকঝকে তকতকে রেল স্টেশন আর কোন ইউরোপিয়ান শহরে দেখেনি মাসুদ রানা। টাইল বসানো ফ্লোর এতই পরিষ্কার যে ওতে আয়নার মত নিজের চেহারা দেখতে পেল। সিগারেটের গোড়া দূরের কথা, এক টুকরো কাগজও পড়ে থাকতে দেখল না ও কোথাও।

প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ট্রেন আসছে-যাচ্ছে। একেক সময় যাত্রী উপচে পড়ছে, অথচ তেমন কোলাহল নেই। ডিপারচার লাউঞ্জে একদল বৃদ্ধ যাত্রীর মাঝে গিয়ে বসে পড়ল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। নজর কাঁচের দেয়ালের ওপাশে।

পনেরো মিনিট পর তার দেখা পেল রানা। ধীর গতি এসকেলেটর ওপর থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিয়ে আসছে তাকে লোকটির পোশাক-আশাক আর দশজনের মতই, কেবল মাফলারের রঙ গাঢ় সবুজ। ঠোঁটে ঝুলছে চিকন একটা সিগারের শেষাংশ। সিঁড়ি শেষ প্রান্তে পৌঁছুতে পা লম্বা করে দিয়ে ফ্লোরে এসে দাঁড়াল লোকটা।

সামনের একটা স্যান্ডবিনে সিগারটা ঠেসে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দুহাতের আট আঙুল ওভারকোটের দুই সাইড পকেটে ঢুকিয়ে দিল। বুড়ো আঙুল দুটো বেরিয়ে আছে। বেরিয়ে এল রানা লাউঞ্জ থেকে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, যেন খুঁজছে কাউকে। লোকটা ওকে পাশ কাটিয়ে এন্ট্রান্সের দিকে এগোচ্ছে, এই সময় ও নিজেও ঘুরে দাঁড়াল, পা বাড়াল একই দিকে। প্রায় পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে।

আশেপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কেউ ওদের লক্ষ করছে বলে

মনে হল না। অন্যদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় লোকটিকে উদ্দেশ করে পাসওয়ার্ড আওড়াল রানা, 'বুড়ো আঙুলের নোখ কাটা হয় না কত দিন?'

'অনেক দিন,' একই রকম চাপা কণ্ঠে বলল লোকটি। 'বছর দুয়েক হবে ও দুটোয় কাটার ছুঁইয়ে দেখিনি।'

নিজের গাড়িটা কোথায় রেখে এসেছে, নিচু গলায় লোকটাকে তা জানিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'আপনি বসুন গিয়ে। আমি আসছি।' হঠাৎ ঘুরে আরেকদিকে পা চালাল ও।

মিনিট দশেক উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি করল রানা এদিক-ওদিক। বের হওয়ার আগে ল্যাভেটরিতে ঢুকল। যখন বের হল তখন ও অন্য মানুষ। নাকের নিচে চওড়া গোঁফ জুড়ে পাল্টে ফেলেছে চেহারা। গাড়িতে এসে উঠল এবার রানা। চুপচাপ বসে আছে লোকটি। বিনা বাক্যব্যয়ে স্টার্ট দিল ও, দক্ষিণমুখো গাড়ি ছোটাল প্রলেতারস্কায়া মেট্রো স্টেশনের দিকে। মাইলখানেক এগোতে মেইন রোডের সঙ্গেই আলোকিত একটা কন্সট্রাকশন সাইট দেখতে পেয়ে থেমে পড়ল।

রাতের পালা চলছে। ফ্লাড লাইটের বন্যায় কঙ্কালের হাতের মত আকাশের দিকে তাক করা ক্রেনের দীর্ঘ একটা বাহু দেখা গেল। ওপরের পুলির ভেতর দিয়ে নেমে আসা মোটা তারের দড়ি টান টান হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা দশ চাকার লম্বা একটা ফ্ল্যাট ক্যারিয়ার থেকে বেশ ভারী কিছু একটা তুলছে। ওপাশে বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। আট-দশ তলা উঠেছে ভবনটি। তার শীর্ষে এখানে ওখানে নীলচে আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে থেকে থেকে। ওয়েল্ডিং টর্চের স্ফুলিঙ্গ-ঝালাই চলছে।

একটু পরই বিশাল একটা কাঠামো শূন্যে ভেসে উঠতে দেখা গেল। চারটে জানালা ও দুটি দরজা নিয়ে গঠিত সম্পূর্ণ প্রস্তুত আস্ত একটি দেয়াল ওপরে তুলছে ক্রেন। ডিজেল এঞ্জিনের ভারী গুম্ গুম্ আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে উঠল।

পকেট থেকে একটা মিনিয়েচার টেপ রেকর্ডার বের করে রানাকে দিল লোকটা। গলা চড়িয়ে রসিকতা করে বলল, 'যা বলার একে বলুন, আমাকে বলে লাভ হবে না। ফিরে গিয়েই জায়গামত পৌঁছে দেব আমি এটা।'

ক্রেনের গর্জন খানিকটা কমতে রেকর্ডারটা মুখের সামনে নিয়ে এল মাসুদ রানা। চাপা কণ্ঠে শুরু করল, 'এলিনা ইয়াকোভলেভনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাই। এলিনা চাকরিজীবী, ক্রেমলিনের সিনিয়র ক্লার্ক। ভিকটিমের প্রেমিকা সে। এই সাথে ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভ সম্পর্কেও জানতে চাই। ভিকটিমের বন্ধু লোকটি, পার্টির সদস্য। এর ব্যাপারে আর কিছু জানা যায়নি।' সেই সঙ্গে এলিনার মুখে শোনা লোকটির চেহারার বর্ণনা দিল ও।

একটু থেমে চিন্তা করতে লাগল মাসুদ রানা। এলিনার কাছে পরে জানতে পেরেছে ও, কাল সকাল দশটায় ইযমায়লোভো চ্যাপ্টারে পার্টির মীটিং আছে, তাতে উপস্থিত থাকার কথা কাপিস্তা কিরভের। রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ওখানে যাবে। সম্ভব হলে আলাপ করার চেষ্টা করবে তার সঙ্গে।

'আমার সাথে যোগাযোগ করার ঝুঁকি নেয়া চলবে না,' ভাসমান রেডিমেড দেয়ালটার ওপর চোখ রেখে বলে চলল রানা, 'যেখানেই থাকি, প্রতি ঘন্টা যোগ পনেরো মিনিট পর পর রঙ নম্বরে কল করব। এলিনা এবং কিরভ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাই।'

'স্টপ' বাটনটা টিপে দিল মাসুদ রানা।

সাত

ভোর থেকে নতুন করে তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। আচমকা কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে তাপমাত্রা। তামাটে-ধূসর মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে সূর্য। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে তুষারঝড়। লাল চোখে সামনের গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। একটা সিরেনা ওটা, মেটে রঙের। ট্যাগ নম্বর ডি-টুয়েলভ-ওয়ান ফর্টি ফাইভ।

শেষ রাতের দিকে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুমাতে পেরেছে মাসুদ রানা। তার আগে বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করেছে, আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে পার করে দিয়েছে দীর্ঘ সময়। অসংখ্য প্রশ্ন চোখের সামনে নাচানাচি করেছে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত, একটিরও উত্তর বের করতে পারেনি ও। ভেবে ভেবে মাথা গরম করাই সার হয়েছে। বাঁ হাতে চোখ কচলাল রানা, জ্বালা করছে। সামনে সিরেনার ডান ইন্ডিকেটর সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে। বাঁক নিতে যাচ্ছে।

এলিনা ইয়াকোভলেভনার দেয়া ঠিকানায় ছিল ও এতক্ষণ। ইযমায়লোভো প্রসপেক্টের ইযমায়লোভো চ্যাপ্টারের জাউযা-এ। একটু আগে ওখানে শেষ হয়েছে ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভের পার্টি মীটিঙ। তাকে চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি। এবং সেই সঙ্গে এ-ও বুঝে গেছে রানা যে এই লোকের কথাই টিলসন বলেছিল। একেই জামানের সঙ্গে রেড স্কোয়ারে দেখেছে সে। বাদামী চাপদাড়ি।

কিন্তু লোকটির আচরণ প্রথম থেকেই সুবিধের মনে হয়নি। যে ভবনে মীটিং, তার দুই ব্লক দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এসেছে সে বাকি পথ। অথচ ওই ভবনের সামনেই গাড়ি পার্ক করার প্রচুর জায়গা ছিল। আবার ডানে মোড় নিল সিরেনা। পশ্চিম দিকে। মনে হচ্ছে বাউমানস্কায়া ডিস্ট্রিক্টে চলেছে ব্যাটা। ধৈর্যের সঙ্গে অনুসরণ করে চলল মাসুদ রানা। নিরিবিলিতে একা পেতে চায় তাকে। তারও আগে, লোকটার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা দরকার সতর্কতার সঙ্গে। কোথায় যায়, কি করে জানতে হবে।

সামান্য কাত হয়ে তুষার ঝরছে। মেঘ একটু আগে পর্যন্ত স্থির ছিল, এখন নড়ছে ধীরগতিতে। মৃদু উত্তুরে বাতাস ঠেলে নিয়ে চলেছে দক্ষিণে। মোটামুটি শুকনো আছে এখনও রাস্তা, তবে তুষারপাতের বর্তমান হার বজায় থাকলে

পরিস্থিতি বদলে যাবে। রানার ধারণাই ঠিক হল। ব্রিজ পেরিয়ে বাউমানস্কায়ায় গিয়ে পড়ল সিরেনা।

পাঁচ মিনিট চলার পর প্রথম ইন্টারসেকশন অতিক্রম করল কাপিস্তা কিরভ। তারপর মাইলখানেক সোজা গিয়ে ডানের একটা গলিতে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রানা থামল না, এগিয়ে চলল সোজা। গলিমুখটা পেরোবার সময় চট্ করে নজর বুলিয়ে নিল সিরেনার ওপর। বাঁকের মুখেই একটা লাল ইঁটের চারতলা টুইন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙ।

ওটার ওপাশের সরু একটা রাস্তা ধরে ঢুকে পড়ল সিরেনা সাঁৎ করে। শেষ মুহূর্তে ওটার পিছনের খানিকটা অংশ এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল রানা। রাস্তা নির্জন। অতএব আইন ভাঙতে একটুও দ্বিধা করল না রানা। দ্রুত ঘুরিয়ে ফেলল পবেদা। ঢুকে পড়ল গলিতে।

ধীরগতিতে অতিক্রম করে গেল সরু রাস্তাটা। সঙ্গে সঙ্গেই সিরেনার দেখা পেল ও আবার। একটা কার পার্কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা আরও আট-দশটা গাড়ির সঙ্গে। কিরভ নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে, দরজা বন্ধ করছে ওর দিকে পিছন ফিরে। ঝট্ করে ঘাড় সিধে করল রানা। গজ পঞ্চাশেক এগিয়ে আবার গাড়ি ঘোরাল ও। ফিরে চলল বড় রাস্তার দিকে।

মোড়ে পৌঁছে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে চলল মন্থরগতিতে। খানিকটা সোজা গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লন্ড্রি ভ্যানের আড়ালে গাড়ি রাখল রানা। এমনভাবে, যেন ভিউ মিররে বিল্ডিংটা এবং তার কারপার্কে প্রবেশপথ, দুটোর ওপরই নজর রাখা যায়। ভবনটির দিকে তাকাল রানা।

পোর্চের কার্নিসে করোডেড অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের ওপর বড় করে লেখা 'প্যাভিলন'। প্রতি ফ্ল্যাটের সামনের দিকে দুটো করে মোট ষোলোটি জানালা রয়েছে। সবগুলো বন্ধ। ভেতরে ঝুলছে ভারী পর্দা। কোন ফ্লোরে গেছে কিরভ? ভাবল ও, কোন ফ্ল্যাটে? কার কাছে? চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল, বিরক্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ভীষণ শীত করছে। তাপমাত্রা সম্ভবত আরও দুচার ডিগ্রি পড়ে গেছে।

ঝাড়া একটি ঘন্টা পর উদয় হল কাপিস্তা কিরভ, বেরিয়ে আসছে। নড়ে চড়ে বসল রানা। ঘড়ি দেখল-এগারোটা উনচল্লিশ। বড় রাস্তায় উঠে এল সিরেনা, ঘুরে এমুখো হল। কয়েক সেকেন্ড পর মাঝারি গতিতে পবেদার পাশ কাটিয়ে আবার পশ্চিমদিকে রওনা হল।

মুখের সামনে একটা ম্যাগাজিন ধরে ছিল রানা গাড়িটা ওকে অতিক্রম করার সময়। সময়মত ওটা ফেলে পবেদা স্টার্ট দিল। হিটারের সাহায্যে প্রথমে ভেতরটা গরম করে নিল রানা, তারপর এগোল। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে কার্ল মার্কস উলিসায় গিয়ে পড়ল সিরেনা। গাড়ির চাপ বেশ কম এ রাস্তায়। তাই বেশি কাছে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না রানা। সামনে একটা ট্রাক এবং একটা ফোক্সওয়াগেন পিকআপ রেখে লেগে রইল ওটার পিছনে।

ঠিক এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে প্লেভনা মেট্রোর সামনে থামল কিরভ। গাড়ি রেখে উল্টোদিকের একটা সিগার স্টোরের দিকে চলল রাস্তা পেরিয়ে। না,

তার লক্ষ্য দোকানটির পাশের টেলিফোন বক্স। বক্সে ঢোকার আগে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল কাপিস্তা কিরভ। নেই কাজ তো খই ভাজ। তার ঘড়ি দেখার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিল মাসুদ রানা।

মস্কোর মানুষ অন্যান্য ইওরোপিয়ান শহরবাসীর মত সময় সচেতন নয়। নিশ্চয়ই কিরভ কাউকে ফোন করে জানাতে যাচ্ছে না যে কোন কারণবশত দেরি হয়ে গেছে তার পৌঁছতে। কারণ নির্দিষ্ট কোন সময়ে কোথাও যেতে হবে এমন কোন লক্ষণ প্রথম থেকেই ছিল না তার মধ্যে। তাহলে? কোথায় ফোন করার প্রয়োজন পড়ল তার? কোন কারণ নেই, তবুও খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল রানা।

পেভমেন্ট ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল ও। কিরভ ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে ফোন বক্সের কাঁচের দরজা। চারদিকে নজর বোলাতে লাগল এবার রানা। ওর সামনে সার বেঁধে আট দশটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে। আরেকটু সামনে প্লেভনা মেট্রো ইন্টারসেকশন। ওখানে একটি ভ্যান থেকে কার্ডবোর্ডের তৈরি বড় বড় বাক্স নামাচ্ছে কয়েকজন শ্রমিক। একটা একচল্লিশ নম্বর ট্রলিবাস এসে দাঁড়াল সিগার স্টোরের কাছে। চারজন যাত্রী নামল, উঠল সাতজন। আবার রওনা হয়ে গেল বাস।

নজর ঘোরাল মাসুদ রানা। দোকানের কিছুটা ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে এক মিলিশিয়া, ট্রলিবাসটিকে অনুসরণ করছে তার দৃষ্টি। দুহাত পিছনে বাঁধা। কিছুক্ষণ এ পা কিছুক্ষণ ও পা ঠুকছে সে রাস্তায়। নাক মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছে লোকটা ধোঁয়ার মত। দুপাশের ফুটপাথেই পথচারী রয়েছে, তবে কম। ব্যস্ত পায়ে গন্তব্যের দিকে চলেছে। কারণ সত্যি সত্যিই শীত আরও খানিকটা বেড়েছে এরই মধ্যে। বেড়ে গেছে তুষারপাতের পরিমাণ।

শান্ত, নিরুপদ্রব পরিবেশ। নিতান্তই স্বাভাবিক সবকিছু। কিন্তু তারপরও রানার মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। কিন্তু ধরতে পারছে না ও। একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হল রানা, ওর দুহাতের উল্টোপিঠের ঘন কালো রোমগুলো এখন আর শুয়ে নেই, দাঁড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে নিঃশ্বাসের বেগও বেড়ে গেছে।

আবার ফোন বক্সের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। এখনও ভেতরেই আছে কাপিস্তা কিরভ। তিন মিনিট পেরিয়ে গেল, এখনও বেরোবার নাম নেই। কাঁচের ওপাশে লোকটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কার সঙ্গে এত কথা বলছে ব্যাটা? বক্সের বাইরে একটা নড়াচড়া চোখের কোণে ধরা পড়তে সেদিকে চাইল রানা।

উঁচু কলারের মাস্করাট কোট পরা এক সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছে বক্সের বাইরে। চার-পাঁচ বছরের একটি নাদুস-নুদুস শিশুর হাত ধরে রেখেছে মেয়েটি, তাকিয়ে আছে বক্সের দিকে। ফোন করবে নিশ্চয়ই। ওটার বাইরে দরজার ওপর লাল আলোয় লেখা রয়েছে, 'অপেক্ষা করুন'। দুজনের হাতেই একটা করে স্টিক আইসক্রীম।

এরা বারোমাসই আইসক্রীম খায়, জানা আছে রানার। যত শীত-ই

পড়ুক। নিজের দিকে খেয়াল দিল ও। একটা বরফের বাক্সে পরিণত হয়েছে যেন পবেদা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাঁটুর নিচের অংশ জমে গেছে। ফারমোড়া জুতোর ভেতরে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করল রানা কয়েকবার। নড়ছে কি না ঠিক বোঝা গেল না।

কিন্তু করার নেই কিছু। এঞ্জিন চালু করলেই আওয়াজ শুনতে পাবে মিলিশিয়া গার্ড, এদিকে তাকাবে সে অবশ্যই। ওর প্রায় একশ গজ সামনে আরেকটি বড় ইন্টারসেকশন। ওখানকার ট্রাফিক পুলিসটিকে হঠাৎ করেই তটস্থ হয়ে উঠতে দেখল রানা। একই সঙ্গে চকচকে কালো বিশাল একটা যিল লিমুজিনের ওপর চোখ পড়ল। নাকের সঙ্গে সেন্ট্রাল কমিটির এমওসি নম্বর প্লেট ঝুলছে ওটার।

যিলের জন্যে আলাদা চইকা লেন ধরে পুবদিক থেকে ইন্টারসেকশনের দিকে আসছে ওটা। হাওয়ায় উড়ে আসছে যেন অতবড় বাহনটা, মাটির সঙ্গে ঘূর্ণায়মান চারটে চাকার যেন কোন যোগাযোগ-ই নেই, সামান্যতম দুলুনিও নেই। চোখের পলকে হাতের ইলিউমিনেটেড ব্যাটনটা মাথার ওপর তুলে ধরে অন্য তিনদিকের চলমান সমস্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল ট্রাফিক পুলিসটি। তার বাঁশীর তীক্ষ্ণ আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল পুরো এলাকা।

বিদ্যুৎবেগে ইন্টারসেকশন অতিক্রম করে পশ্চিমে ছুটে চলল যিল লিমুজিন, ক্রেমলিনের দিকে। ট্রাফিক সিগন্যাল পয়েন্টে তার আগে থেকেই লাল সঙ্কেত জ্বলে আছে। কিন্তু তাতে যিলের কিছু আসে-যায় না। এদেশে অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির সঙ্গে চইকা ও যিল লিমুজিনেরও লাল আলো অগ্রাহ্য করার আইনগত অধিকার আছে।

অপেক্ষা করতে করতে অর্ধেক আইসক্রীম শেষ করে ফেলেছে ওদিকে সুন্দরী। শিশুটি খাচ্ছে না। আইসক্রীম তুলে ধরে লাফ-ঝাঁপ করছে, ওটার ডগায় বাতাসে ভেসে বেড়ানো তুষার কণা আটকাবার চেষ্টা করছে। মুখ নামিয়ে শিশুটিকে পর্যবেক্ষণ করল মেয়েটি কিছুক্ষণ, তারপর তার হুডে ঢাকা মাথা নেড়ে দিল হাসিমুখে।

পাক্কা পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, এখনও বেরোবার নামটি নেই কিরভের। অনিশ্চিত প্রতীক্ষার পাঁচ মিনিট পাঁচ যুগের মত। পেভমেন্ট বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা। সামনের প্রাইভেট কারগুলোর মধ্যে তিনটে আছে মাত্র, বাকিগুলো চলে গেছে। বাক্স আনলোড শেষ করে ভ্যানটিও রওনা হয়ে গেল।

যতদূর দেখা যায় একভাবে ওটার দিকে চেয়ে থাকল মিলিশিয়া গার্ডটি। তারপর ঘুরে এদিকে তাকাল। শিশুটির ওপর চোখ পড়ল তার। হাসিমুখে তার নর্তন-কুর্দন দেখতে লাগল। স্টিকের ডগায় শেষ পর্যন্ত এক কণা তুষার আটকাতে সক্ষম হয়েছে শিশুটি। তাই দেখে হাসিটা আরও বিস্তৃত হল তার।

বেরিয়ে এল কাপিস্তা কিরভ। ভেতরে হিটারের উত্তাপ থাকায় গ্রেটকোটের ওপরদিকের দুতিনটে বোতাম খুলে ফেলেছিল, আগে সেগুলো লাগাল তাড়াতাড়ি। স্কার্ফটাও কষে পেঁচিয়ে নিল গলায়। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে পায়ে পায়ে গার্ডটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে রানা।

শিশুটির ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টি ঘুরে গেল গার্ডের, প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল দাড়িওয়ালার দিকে। অস্বস্তি বোধ করল রানা। ওর কাছে কি দরকার পড়ল ব্যাটার?

পকেট থেকে কিছু একটা বের করে লোকটিকে দেখাল কিরভ। সঙ্গে সঙ্গে বিনীত ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল গার্ডের চোখেমুখে। এবার জিনিসটা পকেটে রেখে কথা বলতে আরম্ভ করল কিরভ। মন দিয়ে শুনছে গার্ড, থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। লোকটির কথা শেষ হতে কোমরের চওড়া বেল্টে ঝোলানো ওয়াকি-টকি হাতে নিল গার্ড, মুখের সামনে এনে কথা বলতে শুরু করল।

সিধে হয়ে বসল মাসুদ রানা। অস্বস্তিবোধটা বেড়ে গেছে। কি করা উচিত ভাবছে। এমন সময় হাঁটতে আরম্ভ করল গার্ড। টেলিফোন বক্স ছাড়িয়ে রানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল। নজর রানার পিছনের রাস্তায়। আস্তে ধীরে অন্যহাতে ধরা ব্যাটনটা তুলল সে এবার। রানার পাশ দিয়ে সামনের ইন্টারসেকশনের দিকে এগোতে থাকা ট্রাফিক থামিয়ে দিল।

ভিউ মিরর দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। চোখ কুঁচকে উঠেছে, অনিশ্চিত চাউনি। অল্প দুচারটে গাড়ি যা ছিল, সামনের সঙ্কেত দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। শুধু একটি থামছে না, এগিয়ে আসছে ওটা অন্যগুলোর পাশ কাটিয়ে। নিচু ছাতওয়ালা কালো গাড়িটার মাথায় একটা লাল আলো নিঃশব্দে ফ্ল্যাশ করছে। বোঁচামুখো ভলগা। রানার মাত্র কয়েক গজ পিছনে রয়েছে।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হল মাসুদ রানা। ঘুরে গার্ডটির দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ছাঁৎ করে উঠল কলজে। তার ব্যাটন এ মুহূর্তে সরাসরি ওর পবেদার দিকে তাক করে ধরা। পরবর্তী দু সেকেন্ডের মধ্যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা দুঃসাধ্য, এমন অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল পর পর।

পিছনের গাড়িগুলোকে অতিক্রম করে সামনে এসে আড়াআড়িভাবে পবেদার দিকে বাঁক নেয়ার ইচ্ছে ছিল ভলগার, ওটার পথরোধ করবে। কিন্তু সে সুযোগ হল না। সময় থাকতে বিদ্যুৎগতিতে বাঁ হাত চালাল মাসুদ রানা, থাবা দিয়ে ইগনিশন কী ঘোরাল, একই সঙ্গে এক্সিলারেটর এবং ক্লাচ চেপে ধরে গিয়ার দিল। পবেদা হুঙ্কার ছাড়তেই ক্লাচ ছেড়ে দিল ও, বন্ বন্ করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাবার ফাঁকে দাবিয়ে ধরল এক্সিলারেটর।

আচমকা প্রায় কোনাকুনিভাবে লাফ দিল পবেদা, তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ছুট লাগাল ইন্টারসেকশনের দিকে। কিন্তু কয়েক ফুট এগোতে না এগোতেই বাধা পড়ল। ও এভাবে শেষ মুহূর্তে ফাঁকি দেবে মেনে নিতে রাজি নয় ভলগার চালক। রানাকে হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠতে দেখে সে-ও শেষ মুহূর্তে পুরো দাবিয়ে ধরেছিল এক্সিলারেটর। পবেদা তাকে ফাঁকি দেয়ার আগমুহূর্তে বোঁচা নাক দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে গুঁতো মারল সে ওটার পিছনের দরজার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হয়ে গেল পবেদার সম্মুখগতি। ছোট্ট গাড়িটা ভীষণভাবে দুলে উঠল বেমক্কা গুঁতোটা খেয়ে।

প্রায় উল্টেই যাচ্ছিল, বেঁচে গেল ওপাশের উঁচু পেভমেন্টের জন্যে।

ধাক্কার চোটে পবেদার পিছনদিক পিছলে গেল, চাকা এবং বডি দড়াম করে আছড়ে পড়ল গিয়ে পেভমেন্টে। বিচ্ছিরিভাবে তুবড়ে গেল পবেদার নরম বডি। এই বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে মাসুদ রানা। চোখে না দেখলেও বুঝতে পারছে, ওকে গেঁথে ফেলেছে ভলগা। হয় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এ গেরো থেকে বেরোতে হবে, নইলে কখনই নয়।

এক্সিলারেটর ছেড়ে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঠেসে ধরল ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে। বিকট শব্দে গর্জন করে উঠল পবেদা, ইস্পাতে ইস্পাতে টানাহ্যাঁচড়ার শব্দে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত আগুপিছু করল খুদে কার। যেন স্থির করতে পারছে না দাঁড়িয়েই থাকবে, নাকি এগোবে। তারপর আচমকা লাফ দিল পিছনের চাপটা সামান্য শিথিল হওয়ামাত্র, নিক্ষিপ্ত মিসাইলের মত ছুটল প্রাণ হাতে করে।

পিছনে ইস্পাত ছোঁড়ার আওয়াজ উঠতে চকিতে ঘুরে তাকাল রানা স্টিয়ারিঙ সামলে নিয়ে। ভলগার নাকে পবেদার একটা দরজা লটকে রেখে এসেছে ও। এরই মাঝে চোখে পড়ল মাঝখানের বাধাটা হঠাৎ করে স্থানচ্যুত হতে সম্মুখগতির তোড়ে গোঁয়ারের মত পেভমেন্টের দিকে ছুটে গেল ভলগা, দড়াম করে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল শক্ত পাথরের ওপর।

ঝট্ করে সামনে তাকাল রানা। পলকে সামনে দাঁড়ানো মিলিশিয়া গার্ডটিকে ষষ্ঠাঙ্গে রাস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে লোকটা। ভাবছে রানা হয়ত ওর ওপর-ই তুলে দেবে গাড়ি। চোখ কপালে তুলে হামাগুড়ি দিয়ে আরও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে সে। পাশ কাটাবার সময় কাপিস্তা কিরভের মুখটা ও দেখতে পেল ও সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে। সে-মুখে ফুটে আছে রাজ্যের হতবিহ্বলতা।

তুমুল গতিতে ছুটছে মাসুদ রানা। ইন্টারসেকশনের সিগন্যাল পয়েন্টে লাল আলো দেখেও গতি কমাচ্ছে না, কারণ পিছনে তখন সামলে নিয়েছে ভলগা। নাকের সঙ্গে ঝুলে থাকা পবেদার দরজাটিকে পতাকার মত নাড়তে নাড়তে তেড়ে আসতে শুরু করেছে। দূর থেকে সংঘর্ষের আওয়াজ কানে গেছে ইন্টারসেকশনের ট্রাফিক পুলিসটির, পরবর্তী দৃশ্যগুলোও দেখেছে। অতএব বাধা দেয়ার জন্যে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে।

দুহাত দুদিকে মেলে দিয়ে উঁচু কণ্ঠে ধমকের সুরে গাড়ি থামানর নির্দেশ দিতে লাগল রানাকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝে তাকেও লাফ দিতে হল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে লাগল না ধাক্কাটা। বাতাসে ঝড় তুলে লোকটির গ্রেটকোটের প্রান্ত উড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল পবেদা।

ভিউ মিররে তাকাল মাসুদ রানা। থর থর করে কাঁপছে আয়নাটা। ওর মধ্যে দিয়েই আরও একবার জীবনপণ লাফ দিতে দেখল ও পুলিসটিকে। পবেদার সামনে থেকে সরে যেতে সক্ষম হলেও শেষ মুহূর্তে ধাবমান ভলগার সামনে পড়ে গিয়েছিল বেচারা ঠিকমত নিজেকে সামলে নিতে পারার আগেই। লোকটির দুর্দশা দেখে এরমধ্যেও হেসে উঠল রানা। ঠিক বাঁদরের মত লাফিয়ে সরে গেল সে নাকবোঁচা যমদূতের সামনে থেকে।

গতি সামান্য কমিয়ে ডানে বাঁক নিয়ে কুইবিসেভা উলিসায় এসে পড়ল ও। পিছনের চাকা বেশ খানিকটা পিছলে গেল ভেজা রাস্তায়। কিন্তু গাড়ি বাগে আনার জন্যে কোন উল্টো ব্যবস্থা নিল না রানা, বরং পিছলে যেদিকে যেতে চাইছে সেদিকেই আরও খানিকটা ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং। এতে ফল হল আশাতীত রকম দ্রুত, সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণে চলে এল পবেদা। বার দুয়েক এদিক-ওদিক করে সিধে হয়ে গেল, তারপর আবার দৌড়।

এটি প্লেভনা উলিসার চাইতে অনেক প্রশস্ত, এবং ট্রাফিকও তুলনামূলক বেশি। ক্রেমলিন থেকে মাকড়সার জালের মত যে সড়কগুলো বেরিয়েছে, কুইবিসেভা উলিসা তার অন্যতম। ব্যস্ত হয়ে সরু রাস্তা খুঁজতে লাগল মাসুদ রানা। দিনের আলোয় এরকম ব্যস্ত রাজপথে দৌড় প্রতিযোগিতায় পুলিসকে পরাজিত করা কোনমতেই সম্ভব নয়। মিররে চোখ ছিল ওর, স্কোয়াড কারটিকে বাঁক নিতে দেখল। দ্রুত ধেয়ে আসছে চড়া সুরে টানা সাইরেন বাজাতে বাজাতে।

হঠাৎ করেই সাইরেনের কান ফাটানো আওয়াজ থেমে গেল। পরিবর্তে একটি বুলহর্ন ধমকে উঠল রানার উদ্দেশে: গাড়ি থামাও! এই মুহূর্তে গাড়ি থামাও! নইলে গুলি চালাব আমরা!

পাত্তা দিল না রানা। যতই ভয় দেখাক, গুলি ওরা ছুঁড়বে না। অন্তত এখনই নয়, ভাবল ও। এ রাস্তায় ট্রাফিক যেমন বেশি, তেমনি পেভমেন্টেও প্রচুর পথচারী। গুলি ছুঁড়লে সাধারণ মানুষ হতাহত হতে পারে, তা ওরাও ভাল জানে। কাজেই গুলি করার প্রশ্নই আসে না। তবু শাসাচ্ছে হুমকিতে কাজ হলেও হতে পারে ভেবে।

কিন্তু অন্য একটি সম্ভাবনার কথা মনে পড়তে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ এলাকার আরও দুচারটে স্কোয়াড কারের সঙ্গে কথা বলেছে পিছনেরটা, বেয়াড়া পবেদাটিকে থামানর ব্যাপারে তাদের সাহায্য চেয়েছে। কে জানে, হয়ত এরই মধ্যে রানার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে সামনের কোন রাস্তায়, ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

ওর ভাবনা শেষ হতে না হতেই সামনের দিকে কোথাও আরেকটি সাইরেন বেজে উঠল। পরমুহূর্তে আরও একটা! কোনদিক থেকে আসছে বুঝতে পারছে না রানা। তবুও মিরর এবং সামনে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ নজর রেখে ছুটছে।

'গাড়ি থামাও! থামাও গাড়ি!' আবার ধমকে উঠল বুলহর্ন। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা সাইরেন যোগ হল আগেরগুলোর সঙ্গে। এটি আসছে সামনের বাঁ দিকের রাস্তা থেকে, রানা নিশ্চিত। ওই রাস্তার মুখেই আছে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জিইউএম। দেখতে পাচ্ছে গজ পঞ্চাশেক দূরে কুইবিসেভা উলিসার সঙ্গে এসে মিশেছে ওটা। আগের দুটো সাইরেনের আওয়াজও আর বেশি দূরে নেই।

এক্সিলারেটর ছেড়ে ব্রেকে পা রাখল মাসুদ রানা। সামনে থেকে আসছে তিনটে বা তারও বেশি স্কোয়াড কার, আর পিছনে মাত্র একটা। ঝুঁকি নিতে

হলে এখনই উপযুক্ত সময়, পরে দেরি হয়ে যাবে। চট্ করে মিররে নজর বুলিয়ে নিল ও শেষ বারের মত। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ পিছনে সেঁটে আছে ভলগা, পতাকাটা খসে গেছে কখন যেন।

ব্রেকে মাঝারি একটা চাপ দিয়েই ছেড়ে দিল মাসুদ রানা, সেই সঙ্গে দ্রুত স্টিয়ারিং ঘোরাতে আরম্ভ করল ডানদিকে। কানে তালা লাগানো আওয়াজ উঠল ভেজা রাস্তায় টায়ারের অস্বাভাবিক ঘর্ষণে, একদিকের দু চাকা শূন্যে উঠে গেল পবেদার, চোখের পলকে ঘুরে গেল উল্টোদিকে। রানার চোখের সামনে কাৎ হয়ে চরকির মত একটা পাক খেল সামনের এবং বাঁদিকের রাস্তার পাশের দালান কোঠা, পথচারী।

সামনেই কালো, নাকবোঁচা ভলগা-কাৎ হয়ে তেড়ে আসছে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সিধে হয়ে গেল ওটা পবেদার ভাসমান চাকা দুটো সজোরে রাস্তায় আছড়ে পড়তে। এবং আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ল রানার আশা-ভরসার মাথায়, বিকট আওয়াজের সঙ্গে ফেটে গেল সামনের বাঁ চাকাটা। মুহূর্তে দ্রুতগতি পবেদার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ও।

রাস্তা ছেড়ে কোনাকুনিভাবে পেভমেন্টের দিকে ছুটে চলল ওটা তীরবেগে। প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক চেপে ধরেও কাজ হল না কিছু, চোখের পলকে ছিটকে গিয়ে দড়াম করে পেভমেন্টে গুঁতো খেল পবেদা। ইস্পাত ছেঁড়া আর কাঁচ ভাঙার শব্দে এমনকি কানের কাছের সাইরেনের আওয়াজটাও পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে না এখন রানা। চোখের সামনে চুলের মত আঁকাবাঁকা সহস্র চিড় ধরা উইন্ডশীল্ডের ওপাশের দৃশ্যটা আবার কাৎ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই উল্টে গেল।

একটা ডিগবাজি খেয়ে পেভমেন্টে উঠে পড়েছে পবেদা। চার হাত-পা আকাশে তুলে দিয়ে পড়ে আছে চিত হয়ে, চাকা ঘুরছে বন বন করে। ওদিকে মুহূর্তে প্রচণ্ড হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল পথচারীদের মধ্যে। চিৎকার-চেঁচামেচি আর কে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

আট

গাড়ি উল্টে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শূন্যে আবিষ্কার করল মাসুদ রানা। কামানের গোলার মত ছিটকে বেরিয়ে এসেছে দেহটা দরজা গলে। দলা পাকানো একটা বলের মত দড়াম করে পেভমেন্টে আছড়ে পড়ল ও পিঠ দিয়ে। দুই গড়ান দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল উপুড় হয়ে। মনে পড়ছে, টায়ার ফাটার আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র এক হাতে কেবল দরজাটা খোলার সময় পেয়েছিল ও। পরেরটুকু ঘটল অবিশ্বাস্য-রকম দ্রুতগতিতে।

বেমক্কা আঘাতটা সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মস্তিষ্ক। তারপর তড়াক করে ভূমিশয্যা ত্যাগ করল। দুহাত সামনে বাড়ান, দ্রুত নিজের

চারদিকটা দেখে নিল একপলক। ভাবখানা, কেউ বাহাদুরী দেখাতে এলে দেখে নেবে একহাত।

কিন্তু সে ব্যাপারে তেমন আগ্রহী মনে হল না কাউকে, ধারে কাছে কেউ নেই-ই। সবাই তীরবেগে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে। এতক্ষণ ভয় ছিল পবেদা নিয়ে, এখন ভয় ওটার পেট্রল ট্যাঙ্ক। কখন বার্স্ট করে কে বলতে পারে। ওদিকে এসে পড়েছে ভলগা, গতি কমিয়ে থেমে দাঁড়াবার আয়োজন করছে। প্রশস্ত রাস্তার ওপারে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে, বিনে পয়সার সিনেমা দেখছে পথচারীরা। এত কিছু এক লহমায় দেখা হয়ে গেল রানার।

লাফিয়ে রাস্তায় নামল ও, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওপারের ভিড় লক্ষ্য করে ছুটল। ওটার গজ বিশেক পেছনে রয়েছে গলিটা। যার মুখে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু খিলানওয়ালা জিইউএম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।-পিছনে একটা চিৎকার শোনা গেল, এর পরপরই কয়েকজোড়া বুট জুতোর আওয়াজ।

ভিড়ের মধ্যে থেকে এক যুবক এগিয়ে এল রানার দিকে। দুহাতে কয়েকটা কাগজের প্যাকেট ধরা আছে তার। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেও দিক বদল করল না মাসুদ রানা, এখন এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক করা মানে পিছনের ওদের এক ইঞ্চি ব্যবধান কমিয়ে আনতে সাহায্য করা।

যুবকের চার-পাঁচ গজের মধ্যে এসে পড়েছে রানা, এই সময় বোঝাসমেত দুহাত দুদিকে প্রসারিত ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'কমরেড, আ···' ওই পর্যন্তই। আর একটি শব্দও উচ্চারণ করার সুযোগ পেল না যুবক। বাঁ হাত সোজা রেখে ঝটাং করে মাঝারি এক কারাতের কোপ বসিয়ে দিল রানা তার অ্যাডামস অ্যাপেলের ওপর। তারপর যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতে থাকল।

'ঘ্যাঁক' করে উঠল কমরেড। বোঝা ছেড়ে গলা চেপে ধরে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। সামনেই জিইউএম-এর পাশাপাশি বিশালাকার কয়েকটা এন্ট্রান্স, সবগুলোই টিনটেড কাঁচের। গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা। দড়াম করে পড়ল গিয়ে একটার ওপর, মুহূর্তে এসে পড়ল উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ভেতরে।

ঢুকেই ডানদিকে কয়েকজন খদ্দেরকে জটলা করতে দেখে সেদিকে ছুটল। উত্তেজিত কণ্ঠে বাইরের পুলিসি সাইরেন এবং সংঘর্ষের আওয়াজ নিয়েই আলোচনা করছিল তারা। কি ঘটছে বাইরে গিয়ে দেখে আসবে কি না জল্পনা-কল্পনা করছে, এমনসময় উদভ্রান্ত চেহারার লোকটিকে ছুটে আসতে দেখে সাঁৎ করে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল জটলাটা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে সব কটি মুখ। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় নেই রানার, লোকগুলোকে ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই দু'পাশে উঁচু হ্যাঙ্গার র‍্যাকে সাজানো হাজারো রেডিমেড পোশাকের অসংখ্য সারি পড়ল সামনে। ওর ফাঁক ফোকর ধরে ছুটল রানা পড়িমরি করে।

পিছনে আরেকটা চিৎকার শুনতে পেল ও এই সময়। 'ধর! ধর! চোর চোর!' এত দুঃখেও হাসি পেল রানার। শেষ পর্যন্ত কি না চোর? প্রাণপণে ছুটছে

রানা, সাঁই সাঁই পাশ কাটাচ্ছে একে-তাকে। পোশাকের সারির মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছে, এমন সময় পিছনে হুড়মুড় করে এক সঙ্গে দু-তিনটে এন্ট্রান্স ডোর খুলে গেল, অস্বাভাবিকরকম উঁচু ছাত-ওয়ালা জিইউএম-এর ফাঁপা অভ্যন্তরে অসংখ্য বুট জুতোর আওয়াজ উঠল।

অ্যাপারেল সেকশনের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা, এই সময় হঠাৎ করে একটা হাত এগিয়ে এল সারির শেষ মাথায় ঝোলানো একটা ওভার কোটের ওপাশ থেকে। কিছু বোঝার আগেই পিছন থেকে পেঁচিয়ে ধরল ওর গলা। ধাঁই করে কনুই চালাল রানা আন্দাজে, 'ঘোঁৎ' করে উঠল হাতটির মালিক। সঙ্গে সঙ্গে রাগের মাথায় নাক-মুখ বেড় দিয়ে মারা রানার প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে ঘুরে গিয়ে পড়ল হ্যাঙ্গার র‍্যাকের ওপর। তারপর ওতে ঝোলানো সব কাপড়-চোপড় নিয়ে সটান ফ্লোরে।

সামনে আরেকটা বন্ধ দরজা। দৌড়াবার ফাঁকে ওটার হিঞ্জে চোখ গেল রানার—ওটা একটা সুইং ডোর। কাঁধের ধাক্কায় খুলে ফেলল ও দরজাটা। পরক্ষণেই চমকে উঠল এক বয়স্ক মহিলার আতঙ্কিত চিৎকারে। বোতাম, সুতো, সেলাই মেশিনের যন্ত্রাংশ ইত্যাদির বিশাল সেকশন এটা। সেকশন না বলে গুদাম বলাই উপযুক্ত হবে।

একটি বড়সড় বোতামের টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়েছিল মহিলা এদিকে মুখ করে। রানার চেহারায় কি দেখল কে জানে, চেঁচিয়ে উঠেই থেমে গেল মাঝপথে। উল্টে ফেলে দিল টেবিলটা। ওটার ধাক্কায় পাশের একটা সুতোর র‍্যাকও পড়ল কাত হয়ে। মুহূর্তে হাজার হাজার বোতাম আর সুতোর রীলে ঢাকা পড়ে গেল মেঝে। লাফিয়ে লাফিয়ে ওগুলো টপকে ছুটল রানা রুমের শেষ প্রান্তের একটি সরু করিডরের দিকে। পিছনে আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল মহিলা—প্রথমবারেরটির সমাপ্তি টানল সম্ভবত।

করিডরের মাথায় এসে অন্য প্রান্তের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। শেষ মাথায়, গজ বিশেক দূরে, আরেকটা বন্ধ দরজা। করিডরটা ফাঁকা। দ্রুত পা চালাল রানা সেদিকে। এবার আর দৌড় দিল না। এদিকে সম্ভবত লোকজন নেই, সব চুপচাপ। কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে এ পথ? শেষ মাথায় গিয়ে ব্রেক কষল রানা। বাঁ দিকে কুইবিসেভা এন্ট্রান্স-যেখান দিয়ে ও ঢুকেছে জিইউএম-এ।

ওর কয়েক গজ দূরে অনেকগুলো জটলা, সবাই উত্তেজিত। তাদের আলোচনার বিষয় বুঝতে দেরি হল না। ডানে তাকাল রানা, বিশাল এক হলরুম। প্রায় ফাঁকা। হলরুমের মধ্যিখানে বড়সড় একটি ঝর্ণা। এদিক ওদিক সতর্ক নজর বুলিয়ে ওটার দিকে এগোল ও। মানুষের আনাগোনা বেশ কম ওদিকটায়। ঝর্ণার ওদিকে আরেকটা প্রকাণ্ড কাঁচের দরজা—ওটাই ওর লক্ষ্য। প্রথমে এক যুবতীকে পাশ কাটাল রানা, চোখ কুঁচকে ওকে লক্ষ করল যুবতী। কিন্তু খেয়াল করল না ও। ভদ্রভাবে হেঁটে চলল।

কয়েক মুহূর্ত পর এক বৃদ্ধকে একই ভাবে বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে খটকা লাগল রানার। ব্যাপার কি! ওভাবে তাকাচ্ছে

কেন সবাই ওর মুখের দিকে? চট করে ডান হাত তুলে মুখের ওপর বোলাল রানা। ভেজা! হাতটা চোখের সামনে ধরল ও, রক্ত! বেশ খানিকটা কেটে গেছে ডান গাল। তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে ক্ষতটা চেপে ধরল রানা।

এই সময় পিছন থেকে আরেকটা মোটা গলার চিৎকার। 'ধর, ধর! ওই সেই ব্যাটা!' অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল মাসুদ রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল হাঁটতে হাঁটতে। এন্ট্রান্সের প্রায় প্রতিটি মুখ ঘুরে গেছে এদিকে। মুখে রুমালচাপা অবস্থায় ঘুরে তাকাতেই নড়ে উঠল তাদের মধ্যে অতি উৎসাহী কয়েকজন। দৌড়ে আসতে শুরু করল চেঁচাতে চেঁচাতে। তাদের মধ্যে একজন মিলিশিয়াও রয়েছে।

নিকুচি করেছি ভদ্রতার! দম নিয়ে খিঁচে দৌড় দিল রানা সামনের দরজাটা লক্ষ্য করে। একদল শিশু বেরিয়ে আসছিল, তাদের ফাঁক গলে সাঁৎ করে আবার জিইউএম-এ সেঁধিয়ে গেল। হয়েছে, এবার আস্তে। আস্তে হাঁট, গাধা কোথাকার! নিজেকে চোখ রাঙাল রানা। ভেতরের এরা হয়ত জানে না কি হচ্ছে বাইরে, বেকুবের মত লাফ-ঝাঁপ করে নজর কাড়িসনে এদের।

কাড়তে হল না, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রক্তে রুমাল ভিজে উঠতেই কানাঘুষা আরম্ভ হয়ে গেল ওকে নিয়ে। অবশ্য কেউ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ পেল না, তার আগেই আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে রানা। এটা আরেকটা করিডর। ডানে একটি কাঁচের দরজা—ওটা কসমেটিক সেকশন। বাঁয়ে করিডরের শেষ মাথায় বড় করে লেখা 'মেন'। পা বাড়াল মাসুদ রানা ওদিকে।

ভেতরের প্রকাণ্ড আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই আঁতকে উঠল। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে ডান গালটা। কানের ওপর থেকে প্রায় থুতনি পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে কেটে গেছে। রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত থেকে। শার্ট-কোটের কলার ভিজে লাল হয়ে আছে। অথচ টেরই পায়নি সে এতক্ষণ। এবার পেল। ক্ষতটা চোখে পড়ামাত্র শুরু হয়ে গেল যন্ত্রণা। তাড়াতাড়ি পুরো এক রোল পেপার টাওয়েল ভাঁজ করে মোটা একটা প্যাড বানাল মাসুদ রানা। প্যাডটা গরম ট্যাপের পানিতে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল। কিন্তু থেমে পড়তে হল শুরু করতে না করতেই যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল রানা। ভেতরে খচখচ করছে অসংখ্য কাঁচের গুঁড়ো।

অসম্ভব! ডাক্তারের সাহায্য ছাড়া ওগুলো বের করা যাবে না কোনমতেই। কাজেই অন্যদিকে মন দিল ও। ভেজা প্যাড দিয়ে শার্টের কলার এবং গ্রেটকোটে লাগা রক্ত যথাসম্ভব ডলে ডলে মুছে ফেলল। চুল আঁচড়ে চেহারাটা মোটামুটি ভদ্রোচিত বানাল। বাইরে কোন পায়ের আওয়াজ ওঠে কি না শোনার জন্যে খাড়া রেখেছে কান। রক্তাক্ত প্যাডটা একটা বেসিনের পিছনের ফাঁকে জোর করে গুঁজে দিয়ে আরেকটা তৈরি করল ও। তারপর ওটা দিয়ে ক্ষতটা আড়াল করে বেরিয়ে এল।

করিডর অতিক্রম করে কসমেটিক সেকশনে এসে ঢুকল রানা। এখন বেশ ধীরস্থির। আস্তে, মনে মনে জপ করছে ও, আস্তে হাঁটো। স্বাভাবিকভাবে।

দম নাও গভীর, ছাড়ো আস্তে ধীরে। এদিক-ওদিক তাকাবার দরকার নেই। কসমেটিক মেয়েদের জিনিস, ওতে তোমার কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়। অতএব সোজা হাঁটতে থাকো।

সেকশনের এক প্রান্তে বড় একটা দরজা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল রানা দুরু-দুরু বুকে। ওটা দিয়ে বের হওয়া যাবে? মেয়ে ক্রেতাদের জটলার ফাঁক-ফোকর গলে দরজার কাছে পৌঁছুলো মাসুদ রানা। বাইরে পা রাখতেই খুশি হয়ে উঠল মনটা। সামনে বিস্তৃত শান বাঁধানো রেড স্কয়ার। তার ওপাশে গম্ভীরমুখো ক্রেমলিন।

স্কয়ারের দক্ষিণ প্রান্তে স্পাসকি গেটের নিচে জিলিপির প্যাঁচের মত পাক খাওয়া বিশাল জনতার সারিটা চোখে পড়তে হাসি গিয়ে কানে ঠেকল রানার। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত প্রতিদিনই থাকে ওই সারি—লেনিনের সমাধি দর্শনার্থীদের সারি। আবহাওয়াভেদে ছোট-বড় হয়, তবে ভিজিটিং আওয়ারে দর্শনার্থী থাকে না, এমনটি এক মুহূর্তের জন্যেও ঘটেনি আজও পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালে ওই সারি কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয় কখনও কখনও।

সমাধি রানার দুশো গজের মধ্যেই। কিন্তু সারিটা এ মুহূর্তে কম করেও আধ কিলোমিটার লম্বা। ওটাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। তাড়াতাড়ি পা চালাল রানা শেষ প্রান্তের দিকে। পিছন থেকে এখনও একটা সাইরেনের আওয়াজ আসছে। সারির সামনের দিকের প্রায় সবাই-ই রানার পিছনদিকে তাকিয়ে আছে। অনুমান করার চেষ্টা করছে কি ঘটছে ওদিকে। কেউ কেউ ওর দিকেও তাকাল।

কিন্তু রানা সরাসরি কারও মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। গালে প্যাড চেপে ধরে পাকা চত্বরে হিলের আওয়াজ তুলে দ্রুত হেঁটে চলেছে। নজর জুতোর ডগায়। মনে মনে প্যাডের বর্তমান রঙ নিয়ে শঙ্কিত। ওটা কি সাদা আছে এখনও? না লাল হয়ে গেছে? পরখ করে দেখার সাহস হল না। সারির লেজে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। দাঁড়িয়ে গেল সবার শেষে।

এখন আর কেউ মুখ দেখতে পাচ্ছে না রানার। সবাই পিছন ফিরে আছে ওর দিকে। এইবার নিশ্চিন্তে সামনে তাকাল ও। কিন্তু তেমন কিছু বোঝা গেল না, জিইউএম-এর দিকে কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা নেই। রানার সামনে দাঁড়িয়েছে এক মাঝবয়সী মহিলা। হঠাৎ করেই ঘুরে তাকাল সে রানার দিকে। 'আপনি তো ওদিক থেকেই এলেন, তাই না?' হাত ইশারায় ডিপার্টমেন্ট স্টোরটা দেখাল।

'অ্যাঁ? হ্যাঁ।' দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে রানা।

'কি হয়েছে ওদিকে? অ্যাকসিডেন্ট?'

'জানি না।'

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল মহিলা। তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে আপনার? দাঁতে ব্যথা?'

'হ্যাঁ।' শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। জিইউএম-এর দক্ষিণে প্রকাণ্ড সেন্ট বাসিলস্ ক্যাথেড্রাল। ওটার দেয়াল ঘেঁষে রেড স্কয়ারের দিকে এগিয়ে আসছে

একটা ভলগা। স্কোয়াড কারটার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকল রানা। ওটার একটু পিছনেই আরেকটা। তারপর আরেকটা। আরও একটা! দেখতে দেখতে সাতটা ভলগা এসে পড়ল স্কয়ারে। ধীরগতিতে পুরো স্কয়ার ঘিরে ফেলল তারা। চক্কর দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

'আপনার গাল কেটে গেছে নাকি?' আবার কথা বলে উঠল মহিলা। 'ইশ্‌শ্‌! এত রক্ত!'

'ও কিছু না,' আড়চোখে কারগুলোর দিকে তাকাচ্ছে রানা বারবার। ব্যাটাদের ভাবগতি বোঝার চেষ্টা করছে। 'বরফের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম।'

'তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানো উচিত আপনার।'

আরে ধ্যাৎ! 'হ্যাঁ। এখান থেকে ফিরেই যাব ভাবছি।'

একটা ভলগা থেমে দাঁড়াল। টিউনিক পরা একজোড়া মিলিশিয়া নামল ওটা থেকে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এদিকেই হেঁটে আসছে তারা। হাঁটা দেখে বোঝা যায় তেমন ব্যস্ততা নেই। ওদিকে নিকোলস্কি গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে আরেকটা কার, ওটা থেকেও নেমে পড়ল একজোড়া। মিনিটখানেকের মধ্যে সাত জোড়া হল তারা সংখ্যায়, স্কয়ারের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে সারিটার দিকে।

সটকে পড়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মাসুদ রানা, পরক্ষণেই ধক্ করে উঠল বুক। ওর ঠিক পিছনে, পঞ্চাশ গজমত তফাতে, নাবাতনি টাওয়ারের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে আরেকটা পুলিস-ভ্যান। সাদা পোশাকের এক ডজন পুলিস নামল ওটা থেকে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে তারাও এদিকেই আসছে সরাসরি। আবার অ্যাবাউট টার্ন করল রানা। জিভ শুকিয়ে গেছে মুহূর্তে। বুকের খাঁচায় গুঁতোগুঁতি করতে আরম্ভ করেছে হৃৎপিণ্ড।

'আপনি মস্কো থাকেন?'

'হ্যাঁ।' মহিলার দিকে নজর দিল রানা। মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে এমন ভাব করল যেন বহুদিনের চেনা। আসলে বুঝতে পারছে না এরকম জটিল পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। কি করলে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখা সম্ভব।

'আমরা থাকি আবরামটসেভো।' তার সামনের যুবকটির কাঁধে হাত রাখল মহিলা। 'এ আমার ছেলে, সের্গেই। স্যুয়েজ এঞ্জিনিয়ার। মস্কো বদলি হওয়ার জন্যে খুব চেষ্টা করছে সের্গেই, কিন্তু প্রোপুস্ক তৈরি করতে বড্ডো ঢিলেমি করছে ওর বড় অফিসাররা।'

সের্গেইর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'চেষ্টা চালিয়ে যান। বোঝেন-ই তো, আমাদের সিস্টেমই এমনি।'

ওদিকে বৃত্তটা একটু একটু করে ছোট হয়ে আসছে। চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে লোকগুলো। আর বড়জোর দশ মিনিট, ধরা পড়ে যাবে মাসুদ রানা। পড়বেই। কোন ভুল নেই তাতে। অথচ কিছুই করার নেই ওর। গালের ক্ষতটাই ডোবাবে রানাকে, ওটা না থাকলে এদের সাধ্য ছিল না···।

স্পাসকি গেটের দিকে তাকাল রানা। দুপাশে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে

দুই সেন্ট্রি-রেড আর্মি। এদিকে মুখ করে দাঁড়ানো, নজর জনতার ওপর। দেহের পাশে ওপরমুখো করে ধরে থাকা কালাশনিকভের নলের সাথে যুক্ত দীর্ঘ বেয়োনেটের ফলা চকচক করছে। ওরা নিশ্চয়ই সারির প্রতিটি মুখের ওপর কড়া নজর রাখছে, ভাবল রানা। কারণ চারদিক থেকে অগ্রসরমান পুলিস এবং মিলিশিয়াদের দেখতে পাচ্ছে তারা। অন্তত এটুকু অনুমান করতে পারছে যে ধারেকাছে কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে।

সারির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছে ও গেটের দিকে। আর বড়জোর চল্লিশ-পঁয়তালিশ গজ দূরে আছে গেট। এর মধ্যে আরও শদেড়েক লোক দাঁড়িয়ে গেছে রানার পিছনে। এ সারির সুবিধে হচ্ছে, যত দীর্ঘই হোক খুব তাড়াতাড়ি এগোয়। কারণ সমাধির পাশে দাঁড়াতে দেয়া হয় না কাউকে। কাঁচের কফিনে শোয়ানো লেনিনকে দেখা এবং সেই সঙ্গে ধর্ম-মত অনুসারে কেউ যদি তাঁর প্রতি সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চায়, তা-ও ওই চলার মধ্যে থেকেই করতে হয়-এটাই নিয়ম।

আরেকবার নিজের চারদিকে তাকাল মাসুদ রানা। লাইনের বাইরে যে দুচার জন আছে, ঘুরে ঘুরে জারের প্রকাণ্ড কামান অথবা স্কয়ারের অন্যান্য দর্শনীয় স্থাপনা দেখছে, তাদের কাছে ডেকে এটা-ওটা প্রশ্ন করছে এখন দুই মিলিশিয়া। কি হতে পারে ওদের প্রশ্নগুলো? কাউকে দৌড়াতে দেখেছেন কি না? বা···ভেতরে ভেতরে মস্ত একটা হোঁচট খেল ও। বা, জিইউএম-এর দিক থেকে কাউকে এদিকে আসতে দেখেছেন কি না, এই একটি প্রশ্নই যথেষ্ট। সবাই-ই রানাকে দেখেছে ওদিক থেকে আসতে। এক হাতে গাল চেপে ধরে ছিল ও, এখনও আছে।

মুক্ত থাকার আয়ু আর কসেকেন্ড আছে? অসহায়ের মত ভাবছে রানা। নিজেকে এ গেরো থেকে উদ্ধার করার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না। পাবে কি, থাকলে তো! সারি থেকে বের হলেও ধরা পড়তে হবে, না হলেও। পার্থক্য কেবল, সারিতে থাকলে সময় কিছুটা বেশি পাওয়া যাবে, কয়েক সেকেন্ড বা মিনিট।

'আপনি তো আগেও অনেকবার এখানে এসেছেন, তাই না?' জানতে চাইল মহিলা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'শুনেছি, রোজ বিশ হাজার মানুষ আসে মহামতি লেনিনের সমাধি দেখতে, সত্যি নাকি?'

'বিশ নয়, ত্রিশ। ছুটিছাটার দিনে পঞ্চাশ হাজারও হয়।'

'বা-পরে!'

এগোতে থাকল রানা। আর পঁচিশ গজ গেটের দূরত্ব। তুষার কণার পুরুত্ব আগের থেকে খানিকটা বেড়েছে যেন, পতন দ্রুততর হয়েছে। কালো মেঘ রঙ পাল্টে সুরমা-কালো হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বাতাসের তেজও বেড়ে গেছে। রানার পাঁচ-ছয় গজ সামনে লাইন থেকে বেরিয়ে পড়ল একজোড়া নারী-পুরুষ। তাই দেখে গম্ভীর গলায় হাঁক ছাড়ল এক গার্ড। 'লাইনে ফিরে

যান, কমরেড। তাড়াতাড়ি!'

'আর অপেক্ষা করতে পারছি না,' বলল লোকটি। 'ঠাণ্ডা লেগে গেছে আমার স্ত্রীর।'

'আচ্ছা।' মাথা ঝাঁকাল গার্ডটি।

ফাঁকটুকু পূরণ করে পিছনের কাতাফিয়া টাওয়ারের পাশে দণ্ডায়মান স্পাসকি টাওয়ারের পঁচিশ মণ ওজনের ঘড়িটার সঙ্গে নিজের হাতঘড়ি মিলিয়ে নিল মাসুদ রানা। আসলে পিছনে ওরা আর কত দূরে আছে দেখে নিল। দুজন পৌঁছে গেছে লাইনের শেষ মাথায়। দুপাশ থেকে প্রতিটি দর্শকের মুখে কড়া দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে এগিয়ে আসছে।

জলদি এগোও। মনে মনে সামনের জনতার উদ্দেশে দাঁত খিঁচাল মাসুদ রানা, জলদি! আইডিয়াটা চট করেই মাথায় এসেছে ওর। সমাধি সৌধের পিছনেই এক ভবনে আছে একটি ছোটখাট লেনিন সংগ্রহ-শালা। ওটার ভেতরে কোথাও গা ঢাকা দেয়ার একটা চান্স জুটলেও জুটতে পারে। উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল রানা। প্রচণ্ড নিরাশা আর হতাশার মধ্যে মিউজিয়ামটি সামান্য আশার আলো দেখিয়েছে। সামনের মানুষগুলো এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালালেই হয়।

গেটে ঢোকার মুখে সারিটা অস্থির হয়ে উঠল খানিকটা। একপাশে একটি স্টীলের লকার, প্রত্যেককে যার যার ক্যামেরা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ওতে রেখে আসতে হচ্ছে। এক সময় প্রতীক্ষার অবসান হল, মহিলার পিছন পিছন ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে।

অদ্ভুতরকম নিস্তব্ধতা এখানে। কাঠের ফ্লোরে পা ফেলার মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভেতরে কথা বলা দূরে থাক, এমনকি ফিসফাস করা পর্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই বিপদেও চারদিক তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল ব্যথা, পুলিস-মিলিশিয়া।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত প্রকাণ্ড এক কাঁচের কফিনে শুয়ে আছে হাজারোবার দেখা নিশ্চল ছবির সেই মানুষটি—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিনভ লেনিন। সেই প্রশস্ত মসৃণ ললাট, থুতনিতে পরিপাটি করে ছাঁটা কালো-লালচে দাড়ি। পাশ দিয়ে এগোবার সময় কেমন খটকা লাগল রানার, সত্যিই ওটা লেনিনের মরদেহ? না মোমের মূর্তি? হলপ করে বলা সম্ভব নয়।

সামনের মহিলা হঠাৎ করেই কাঁদতে আরম্ভ করল। কিন্তু দাঁড়াবার উপায় নেই। হাত তুলে তার কাঁধে মৃদু চাপ দিল রানা, এগোতে অনুরোধ করছে নীরবে। পিছনেরজন এরই মধ্যে দুবার টোকা দিয়েছে ওর পিঠে।

'কি সুন্দর!' বিড়বিড় করে বলে উঠল মহিলা, 'কি নিষ্পাপ!'

আবার কাঁধে জোরে টোকা পড়তে বিরক্ত মুখে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। পরক্ষণেই মুখ শুকিয়ে গেল। পিছনেরজন নয়, দুই পুলিস। গম্ভীর মুখে চেয়ে আছে ওর দিকে। ইশারায় বেরিয়ে আসতে বলল একজন রানাকে।

নয়

বেকুবের মত দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। লাইন থেকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। মুহূর্তে মাছির মত ছেঁকে ধরেছে আট-দশজন। 'দেখেছো,' নীরবতা ভাঙল এক মিলিশিয়া। 'কি বিশ্রীভাবে কেটে গেছে ওর গাল? এত দামী কোটটার কি অবস্থা করেছে দেখো!'

এতক্ষণে লক্ষ্য করল রানা ব্যাপারটা। বাঁ বগলের নিচে আড়া-আড়িভাবে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে পুরু অস্ত্রাখান কোট। ফাঁক হয়ে বেশ খানিকটা ঝুলে পড়েছে, ভেতরের কোট দেখা যাচ্ছে ওর। আরেকজোড়া বুটের আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল রানা। এক ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল দ্রুত পায়ে জটলার দিকে এগিয়ে আসছে। 'কি হয়েছে?' কাছে এসে প্রশ্ন করল সে, 'ভিড় কিসের? পেয়েছ তাকে?'

'মনে হয়, কমরেড ক্যাপ্টেন,' বলল রানার গ্রেট কোটের ছেঁড়া আবিষ্কর্তা। 'এর গালের অবস্থা দেখুন।'

রানার দিকে তাকিয়ে মুখ নাচাল ক্যাপ্টেন। 'কেটে গেছে নাকি? কি ভাবে কাটল?' প্রায় জোর করেই রানার হাতটা সরাল সে গাল থেকে। 'ইশ্‌শ্‌!'

ক্যাপ্টেনের সমবেদনায় কোন খাদ নেই বলেই মনে হল রানার। 'বরফে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কখন?' তার নিঃশ্বাস ধোঁয়ার ছোটখাট মেঘের মত আঘাত করছে এসে রানার থুতনিতে। ওর থেকে দুতিন ইঞ্চি খাটো লোকটা।

'এই আধা ঘণ্টাখানেক আগে।'

'এতক্ষণ হয়ে গেল ডাক্তারের কাছে যাননি কেন?' চোখ কোঁচকাল ক্যাপ্টেন।

'ভাবলাম···'

'কি হচ্ছে এখানে?' আরেক ক্যাপ্টেন সঙ্গে কম করেও জনাকুড়ি পুলিস-মিলিশিয়া নিয়ে এসে দল ভারী করল। রানার দিকে এক পলক তাকিয়েই বলে উঠল, 'ও, পেয়েছ তাহলে ব্যাটাকে?'

'এতে ভাবাভাবির কি আছে?' দ্বিতীয় ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল না সে।

'ও মিথ্যে বলছে, কমরেড ক্যাপ্টেন,' চেঁচিয়ে উঠল প্রথম মিলিশিয়া।

'আপনার আই ডি কার্ড দেখান।'

বিনা বাক্যব্যয়ে কার্ডটা বের করে দিল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত ওটার ওপর চোখ বোলাল ক্যাপ্টেন। 'মিখাইল জিভরস্কি। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

এই সময় আরও দুতিনজন মিলিশিয়া হাজির। রানাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'এই সেই লোক, ক্যাপ্টেন! এ-ই চালাচ্ছিল পবেদা। আমি

দেখেছি।'

'তুমি শিওর?'

'একশোবার, কমরেড ক্যাপ্টেন। আমার চোখের সামনেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'বেশ।' দুপা পিছিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। 'গাড়িতে তোলো একে। চারজন সঙ্গে যাও। সাবধান!'

'মার্চ!' পিঠের মাঝখানে আচমকা এক থাবড়া পড়ল রানার। 'আগে বাড়ো!'

ওদিকে দর্শকদের সবাই এগোবার কথা ভুলে চেয়ে আছে এদিকে। সেই মহিলার মুখটা পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা। দূর থেকে চোখ বড় বড় করে ওকে দেখছে। চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় আর বেদনা। মাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেগেই। সে-ও কম বিস্মিত হয়নি।

স্কয়ার অতিক্রম করে রাস্তার দিকে রানাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে লোকগুলো। সামনে পিছনে বেশ কয়েকটি ভলগা, মাঝখানে তিনটে কালো র‍্যাভেন প্রিজন ভ্যান দাঁড়িয়ে। এঞ্জিন চালু আছে ওগুলোর। প্রথম র‍্যাভেনের পিছনের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, রানাকে প্রায় ছুঁড়ে দেয়া হল ভেতরে। গদিমোড়া বেঞ্চে বসানো হল। ওর মুখোমুখি বসল চার পুলিস। লক হয়ে গেল দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল প্রথম ক্যাপ্টেন।

'আপনাদের ভুল হচ্ছে, কমরেড ক্যাপ্টেন,' শেষ চেষ্টা করল মাসুদ রানা। জানে, একবার যদি লুবিয়াঙ্কায় নিয়ে ঢোকানো হয় ওকে, তাহলে সব শেষ। এবং এ-ও জানে, প্রথম যাত্রাবিরতি হবে লুবিয়াঙ্কাতেই। ওখানে ওর পেট থেকে সব বের করে ছাড়বে কেজিবি। কারণ ওখানে রানার পরিচয়পত্র ভুয়া প্রমাণিত হবে। কে তুমি, কেন মিথ্যে পরিচয়ে এদেশে ঢুকেছ, তুমি কোন দেশী, এসব প্রশ্নের কি উত্তর দেবে রানা?

'ভুল তো মানুষেই করে, না কি?'

'আমি সাধারণ একজন কারখানা শ্রমিক, কমরেড।'

'তা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইব আমি।'

এরপর আর কথা চলে না। এক কথায় রানাকে থামিয়ে দিল লোকটা। কাপিস্তা কিরভের কথা মনে পড়ল। কিছু কি জানে সে ওর ব্যাপারে? নিশ্চয়ই জানে, নইলে কেন এমন কাজ করল ব্যাটা? কিন্তু··· কি জানে? কতটা জানে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কিভাবে জানল? এলিনার কথা ভাবল রানা। মেয়েটি কি সতর্ক করে দিয়েছিল কিরভকে?

র‍্যাভেন বাঁক নিতেই সচকিত হল মাসুদ রানা। জায়গাটা চিনতে পারল দেখামাত্র—দযেরঝিনস্কি স্কয়ার। গলা-বুক সব শুকিয়ে উঠল। আরেকটু এগোতেই দেতস্কি মির। উল্টোদিকে লুবিয়াঙ্কা। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত লোহার গেট পেরিয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকল প্রিজন ভ্যান।

লাফিয়ে নেমে পড়ল ক্যাপ্টেন। তার আগেই খুলে গেছে পিছনের

স্বয়ংক্রিয় দরজা। 'আউট!' রানার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে।

দুই পুলিস নামাল রানাকে। বাকি দুজন আগেই নেমে পড়েছে। উঁচু খিলানওয়ালা ওক কাঠের পুরু দরজা খুলে গেল লুবিয়াঙ্কার। প্রথমটা বিরাট এক হলরুম। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটো খটখটে কাঠের বেঞ্চ, আর রুমের ঠিক মাঝখানে চার-পাঁচটা চেয়ার রয়েছে একটি টেবিলকে ঘিরে। ওর পিছনে একটা চ্যাপ্টা স্টীলের আলমারি।

আরেকপাশের দেয়ালে পরপর তিনটে বন্ধ দরজা। সম্ভবত এখানকার অফিসারদের অফিস হবে। রানাকে দেয়ালের কাছে নিয়ে হাত তুলে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ানর নির্দেশ দেয়া হল। তারপর সার্চ করা হল ওর দেহ। নিখুঁত, প্রফেশনাল কাজ। এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ থাকল না। এবার এক মিলিশিয়ার দিকে ফিরে নিচু গলায় কিছু একটা নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। মিনিট দুয়েক পর আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

শেষের লোকটির দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'তুমিই ধাক্কা মেরেছিলে একে কুইবিসেভা উলিসায়? এই লোকই চালাচ্ছিল পবেদা?'

উত্তর দিতে এক মুহূর্তও দেরি করল না লোকটা। 'হ্যাঁ, কমরেড ক্যাপ্টেন।'

'ভাল করে চেহারাটা দেখে নাও আগে,' ধমকে উঠল ক্যাপ্টেন। 'তারপর বলো।'

'দেখেছি, কমরেড। এই-ই সেই লোক।'

'ঠিক আছে, যেতে পারো তুমি। অ্যাই, ভেতরে নিয়ে যাও তোমরা একে। রুম নম্বর নাইন।'

রানাকে ঠেলে গুঁতিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল লুবিয়াঙ্কার দুই গার্ড। গাঢ় সবুজ রঙ করা এখানকার সব দেয়ালে। লম্বা একটা প্যাসেজ ধরে ডানে বাঁয়ে করে এগিয়ে চলল ওরা। ভেতরে বাতাসে কয়েক রকম গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। চামড়া, কালো তামাক, গান অয়েল আর পুরানো আমলের ভবনের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, প্রতিটি আলাদা আলাদা সনাক্ত করতে সক্ষম হল মাসুদ রানা।

ওকে নিয়ে দুই গার্ড অদৃশ্য হয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। বন্ধ তিন দরজার প্রথমটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় ছোট ছোট অক্ষরে লেখা: পলকভনিক আইভান ই. গরস্কি। দুবার নক করল ক্যাপ্টেন, তারপর নব ঘুরিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা আস্তে করে।

'গুড ইভনিং। আমি গরস্কি। কর্নেল আইভান গরস্কি। কেজিবি।'

'গুড ইভনিং, কর্নেল।' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। গালের ব্যান্ডেজটা পরীক্ষা করছে ও। কর্নেলের হাসিটা খুব মিষ্টি লাগল। ঠোঁটের সঙ্গে দুই চোখের কোণও যেন হেসে উঠল তার। গরস্কি খাটো, কিন্তু স্বাস্থ্য গরিলার মত। মুখটা দেহের তুলনায় বড়, চৌকো। লাল চুল। মধু-রঙা চোখজোড়া কেমন চকচক করছে।

পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল কর্নেল। বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'নিন।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।' মাথা দুলিয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করল রানা।

লুবিয়াঙ্কার খুদে একটা রুম এটা। ইন্টারোগেশন রুম সম্ভবত। একটা টেবিলের দুপাশে দুই পিঠ খাড়া চেয়ার, মাথার ওপর ঝুলন্ত একটা শেডওয়ালা বাল্‌ব্। ব্যস, এছাড়া আর কিছুই নেই ভেতরে। রুমটা মোটামুটি পরিচিত মাসুদ রানার। বিসিআইয়ের রেকর্ডস সেকশনে লুবিয়াঙ্কার ইন্টারোগেশন রুমের ওভারপ্রিন্টেড ছবি দেখেছে ও। ওতে এইসব রুমের লুকানো মাইক্রোফোন, ফ্লোর এরিয়া, উচ্চতা, অনেক উঁচুতে, সিলিঙের সঙ্গে বাতাস চলাচলের জন্যে ঝাঁঝরি আকারের জানালা, দরজার পুরুত্ব ইত্যাদি খুঁটিনাটিসহ কোথায় কোনটা আছে সব দেখানো আছে।

অবশ্য ওই ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, এই রুমের বাল্‌ব্ শেডটা সেরকম বাঁকানো নয়। বাল্‌বটা শুধুই রানার মুখের ওপর আলো ছড়াচ্ছে না, বন্দী এবং হবু প্রশ্নকারী দুজনই দুজনকে দেখতে পাচ্ছে। এর মানে কি? ভাবল মাসুদ রানা, ওর সঙ্গে এরকম নরম ব্যবহার কেন? এটা কি তাহলে ইন্টারোগেশন রুম নয়? কেন নয়? ভাল মানুষের মুখোশ পরা পলকভনিকের দিকে ভাল করে তাকাল এবার রানা।

সম্ভবত এই মানুষটিই ওর আজরাইল। সম্ভবত আগামী দুই তিনদিনের মধ্যে অথবা তার আগেই প্রচণ্ড দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে ওর মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে মানুষটি। ধুলোয় মিশিয়ে দেবে ওর আত্মবিশ্বাস। পেটের সব কথা বের করে নেবে, অন্তত চেষ্টা করবে।

উঁহুঁ, মনে মনে বলল রানা, লাভ হবে না। ওই পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই খোলস ছেড়ে বিদায় নেবে মাসুদ রানা। ঠেকাবার সাধ্য নেই কারও। গরস্কিও নীরবে রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ভুরুজোড়া সামান্য কুঁচকে আছে। চিন্তিত। যে-কোন মুহূর্তে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে লোকটা। অজান্তেই কাঁধ ঝাঁকাল রানা, আমিও কম বিপজ্জনক নই।

সঙ্গে সঙ্গে ভুরুর কুঞ্চন আরও ঘন হল কর্নেলের। 'কিছু ভাবছেন?' নরম গলায় প্রশ্ন করল সে।

'না।'

'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'ভালো।'

'আমাদের ডাক্তারের হাতের কাজ কেমন? কাঁচের টুকরোগুলো বের করতে পেরেছ তো?'

'কাঁচের টুকরো ছিল না,' গম্ভীর মুখে বলল মাসুদ রানা। 'তবে মহিলা কাজ ভালই বোঝে।'

একটু আগে গালের ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে এদের এক লেডি ডাক্তার। চারটে স্টিচও করতে হয়েছে ওখানে। অ্যানেসথেটিকসের প্রভাব একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে, নতুন করে জ্বালা করতে শুরু করেছে

ব্যান্ডেজের নিচে।

'আপনি দেখেননি, ছিল।' মৃদু হাসি ফুটল আইভান গরস্কির মুখে, দাঁত দেখা গেল। ওগুলোও চৌকো। 'দুর্ঘটনাটা যা-তা ছিল না। প্রাণে যে বেঁচে গেছেন তাই বেশি।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ওই শেডটার ভেতরে কি মাইক্রোফোন আছে? ভাবছে ও, আছে হয়ত। উজ্জ্বল আলোর জন্যে দেখতে পাচ্ছে না ও। পাশের রূমে আছে নিশ্চয়ই আরেকজন, টেপ রেকর্ডারের সামনে অপেক্ষায় আছে। দেয়াল হয়ত বিশেষভাবে তৈরি ওপেক ওয়াল, ওপাশ থেকে এ রূমের ভেতরটা দেখা যায়।

আইভান গরস্কি সম্ভবত ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের, কাউন্টার এসপিওনাজ। সে কি নিজেই রানার ব্যাপারটা সামাল দেবে? না কি উচ্চপদস্থ আর কেউ তাকে পরিচালিত করছে?

'আমরা অহেতুক পরস্পরের সময় নষ্ট করব না,' বলে উঠল কর্নেল, 'ঠিক আছে?'

পলকহীন চোখে তার দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। উত্তর দিল না এবারও।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল লোকটা। তারপর টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর চাপিয়ে সামনে ঝুঁকে বসল। দেহটা নিয়মিত ছন্দে দুলছে একটু একটু। পা নাচাচ্ছে। 'আপনি মিখাইল জিভরস্কি নন। আপনার কাগজপত্র ঠিকই আছে, জাল নয়। তবে নাম-ঠিকানা ভুয়া। আমাদের মেইন কম্পিউটরে দিয়ে চেক করে দেখেছি, বুঝলেন? ওটার মতে মিখাইল জিভরস্কি সাত মাস বয়সেই মারা গেছে, নিউমোনিয়ায়। সে জন্মেছিল সক্‌ভিরা, উক্রেইনে। অথচ আপনি জন্মেছেন মস্কোয়।' থেমে আরেকবার হাসির ভঙ্গি করল কর্নেল। 'জুতোজোড়া ফিট্ করেনি আপনার পায়ে।'

মশকরা করছে ব্যাটা। মস্কোয় এ ধরনের আলোচনায় জুতো বলতে কাগজপত্র বোঝায়। রানাও ভালই জানে ওগুলো ভুয়া, কিন্তু জাল নয়। নিজে পরীক্ষা করে দেখেছে ও কার্ডটা কাল রাতে ডেরায় ফিরে। সঠিক মাপের সেফটি পেপার, হালকা কালির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফিউজিটিভ লাইন, জলছাপ, পারফরেট পাঞ্চের ছিদ্র, সাঙ্কেতিক নম্বর মোটকথা সবই খাঁটি, নির্ভেজাল।

এটা বিএসএস-এর বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্তি একেবারে অসম্ভব না হয়ে পড়লে কখনই ওরা জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে না। তবে এদেশের ব্যাপার আলাদা। এদেশে প্রতিটি নাগরিকের জন্ম-মৃত্যু অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে 'ফীড' করা হয়ে থাকে মেইন বা সেন্ট্রাল কম্পিউটরে। গরস্কি চাইলে সত্যিকার জিভরস্কির কবরটিও হয়ত বের করে ফেলতে পারবে ওটার সাহায্যে। কর্তৃপক্ষের ওই পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন না পড়লে শেষ পর্যন্ত জিভরস্কি-ই থাকত মাসুদ রানা। মাঝখানে বাদ সাধল ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভ।

বাদ সাধুক আর যা-ই ঘটে থাকুক, এখন আর ওই পরিচিতিতে কাজ হবে না, ভাবল রানা। 'আমার কিছু বলার নেই।'

'মুশকিলেই ফেললেন, সাহেব। আমার যে না শুনলেই নয়! আপনি কে, কি, এসব যে জানতেই হবে আমাকে!'

'নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নেই আমার,' বলল রানা।

'বেশ তো, বেশি কিছু না থাকে অল্প কিছুই বলুন।'

'আপনার লোকেরা ভুল করে আমাকে ধরে এনেছে অন্য কেউ ভেবে। আমি বরফে আছাড় খেয়ে গাল কেটে...'

'আপনি একবার কেন একশোবার আছাড় খান, তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' কর্নেলের বলার ভঙ্গি কঠোর হলেও মুখটা বেশ হাসি হাসি। 'একবার কেন হাজারবার গাল-কাটুন, তাতেও আমার কিছুটি যায় আসে না। কিন্তু একবার পরিচয়পত্রে উল্টোপাল্টা করলেই বিপদে পড়ে যাই আমি। এবং সে বিপদ থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যাই। সে যাক, আপনার সত্যিকার পরিচয়টা বলুন।'

চোখ বুজে বসে থাকল মাসুদ রানা। মুখ খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

'বলুন। এভাবে সময় নষ্ট করে কোন লাভ হবে না।'

'বলব না।'

চুপ করে থাকল আইভান গরস্কি। রানা ভেবেছিল এখনই রেগে উঠবে কর্নেল, কিন্তু রাগল না। বরং সহজ কণ্ঠে বলল, 'আপনার সমস্যা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি আপনার পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে চাই। এবং সে ব্যাপারে আমি যে সফল হব তা-ও আপনি জানেন। অন্তত অনুমান করতে পারেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে অন্যরকম। ভাবছি দুজনে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে খোলাখুলি আলোচনা করব।' হেলান দিয়ে বসল কর্নেল গরস্কি। তার কোমরের চওড়া বেল্টের সোনালী বাকলস্ চিক চিক করে উঠল আলো লেগে। 'আপনি যে সময় নষ্ট করছেন, তাতে এখনও আমি মাইন্ড করছি না। একে আমি রুশ জেসচার অভ হসপিটালিটি হিসেবে দেখছি। আপনি জানেন আমরা কিরকম অতিথি পরায়ণ জাতি।'

'অস্বীকার করি না।'

এ পর্যন্ত একবারও এদিক-ওদিক, বিশেষ করে কোন দেয়ালের দিকে তাকায়নি লোকটা, ওর দিকেই চেয়ে আছে। তার মানে এ রুমে কোন ওপেক ওয়াল নেই। ওপাশ থেকে গরস্কিকে ইশারায় কেউ কোন নির্দেশ দিচ্ছে না। তাহলে অবশ্যই টের পেত রানা। ওর কেস সম্ভবত লোকটা নিজেই পরিচালনা করছে। ঘাড়ের ওপর বড় কেউ নেই বলেই বসে বসে খোশগল্প করছে। আশা করছে মুখ খুলবে ও। অনেক ঝামেলা বেঁচে যাবে তাতে।

'আতিথেয়তার প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তখন খানিকটা ড্রিঙ্ক হলে কেমন হয়? ভদকা?'

'এখনই নয়।' এমন ভাব করল রানা যেন ওর পিছন পিছন পানীয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কর্নেল, যখন ওর মর্জি হবে গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দেবে।

'কামন! টু ম্যান'স পার্টিতে একজনই যদি না থাকল, জমে নাকি?'

'আপনি শুরু করে দিন।'

মাথা নাড়ল গরস্কি। 'তাহলে বরং থাক। অতিথিকে রেখে পান করব, এরকম অতিথি পরায়ণ ভেবেছেন নাকি আমাকে?' হা হা করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল লোকটা।

কি ভাবে শুরু হতে যাচ্ছে ব্যাপারটা? একটা ঢোঁক গিলল মাসুদ রানা। প্রথমে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করবে কর্নেল ওর ওপর? একে দেরি করিয়ে দিয়ে কি লাভ হবে বলে আশা করছে ও?

'আপনি কোন ইন্টেলিজেন্সের? ব্রিটিশ?'

প্রশ্নটির মধ্যে চমকে ওঠার, ডিগবাজি খাওয়ার প্রচুর উপাদান থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে নিজেকে স্থির রাখল রানা। চেহারায় অবাক হওয়ার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কি দেখে মনে হল আমি কোন ইন্টেলিজেন্সের লোক?'

'মিথ্যে কাগজপত্র, কাউকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অনুসরণ করা, গ্রেফতার এড়ানর চেষ্টা। তারপর ধরুন, এই যে এখনও নিজের সত্যি পরিচয় জানাতে চাইছেন না, এসব কি যথেষ্ট নয়? আমি মনে করি যথেষ্ট। ধরে নিতে পারি নিজের সেলের নাম ফাঁস করতে চান না আপনি। বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে যায় সেটা, ঠিক না?' হাসিটা আরও চওড়া হল কর্নেলের।

'আপনাদের নিয়ে সমস্যা হল,' বলল রানা, 'সব কিছুকেই নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত আপনারা।'

'স্বীকার করি। কিন্তু ভেবে দেখুন, গালটা যেভাবেই কেটে গিয়ে থাকুক, আপনার উচিত ছিল সাথে সাথে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা। কিন্তু তার ধারকাছ দিয়েও যাননি আপনি। ওরকম একটা ক্ষত নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষ কখন এসব করে? যখন তার নিজেকে গোপন রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন। নরফোকে বিএসএস-এর ইন্সট্রাক্টররা তাদের ট্রেইনি অপারেটরদের এ ব্যাপারে যেমন শিখিয়ে থাকেন, দ্য আইডিয়াল টু এইম অ্যাট ইন আ পোটেনশিয়ালি হস্টাইল এনভায়রনমেন্ট, ইজ টু রিকাম অর রিমেইন ইনভিজিবল, ইনঅডিবল্ অ্যান্ড আনফাইন্ডেব্‌ল্। পরিবেশটা আপনার জন্যে হস্টাইল বলেই ইনভিজিবল থাকতে চেয়েছিলেন আপনি, বুঝি। কিন্তু আপনার এইমটা কি ছিল বুঝতে পারছি না। কেন ফলো করছিলেন লোকটিকে। যেটা যে-কারও জন্যে স্বাভাবিক ছিল, আপনি তা করেননি। করেছেন ঠিক উল্টোটি। আমি, সাহেব, কিছুতেই ওই ব্যথা সহ্য করতে পারতাম না। আগে সোজা দৌড়াতাম ডাক্তারের কাছে। পরের কথা ভাবতাম পরে।'

কেমন সন্দেহ হল রানার। ব্যাটা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে কেন টেনে আনছে এরমধ্যে? কিছু টের পেয়ে গেছে নাকি? কিন্তু তা কি করে হয়! উঁহুঁ, খুব সম্ভব আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে রানার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে। ভেবেছে এভাবে খোঁচাখুঁচি করে ঝোলার বেড়াল বের করতে পারবে।

'বললেন না, কোন ইন্টেলিজেন্সের আপনি?' আগে থেকে আরও

মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্নটা করল গরস্কি। 'বিএসএস, তাই না?'

উল্টে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। 'কেন? আর কোনোটা হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, হতে পারে। তবে সাধারণত ইংরেজরাই এই পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। নাম-ঠিকানা ভুয়া হলেও কাগজপত্র তৈরির সময় খুব সতর্ক থাকে। পারতপক্ষে জালিয়াতির আশ্রয় নেয় না অন্যদের মত।'

ঘড়ি দেখল রানা। পাঁচটা পঁচিশ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে হ্যারল্ড টিলসন। একটা দুটো নয়, পর পর সাতটা নির্দিষ্ট যোগাযোগের সময় পেরিয়ে গেছে, যোগাযোগ করেনি রানা। কথা ছিল প্রতি ঘণ্টা যোগ পনেরো মিনিট অন্তর ওর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলার।

কি করছে টিলসন? এখনও অপেক্ষা করছে ওর আশায় আশায়? না কি খবর পাঠিয়ে দিয়েছে ঢাকায় মাসুদ রানাও নিরুদ্দেশ? খবর পেয়ে কি করবে বুড়ো? সোহেল?

'কি? আমার অনুমানটা মিলে গেল তো?'

'লেগে থাকলে দর্শনে ভালই করতেন আপনি, কর্নেল।' পকেট থেকে নিজের সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা–দামী রুশ ব্র্যান্ড। বাড়িয়ে ধরল কর্নেলের দিকে।

'ধন্যবাদ। আমি সামান্য তিনশো রুবলের সরকারী কর্মচারী। অত দামী সিগারেট জীবনেও খাইনি। পেটে সইবে না ও ধোঁয়া। সে যাক, আপনি কিন্তু এ পর্যন্ত আমার একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেননি।' শেষটুকু বলল কর্নেল অনেকটা অভিযোগের সুরে।

নীরবে সিগারেট টেনে চলেছে রানা অন্যদিকে ফিরে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে খানিকটা ভাবনা চিন্তা করতে চাইছে। কিন্তু এগোতে পারছে না। বার বার থেমে পড়ছে হোঁচট খেয়ে। মন থেকে এখনও মেনে নিতে পারছে না সত্যিই ও ধরা পড়ে গেছে। ফেঁসে গেছে জনমের মত। রানা ওর জিভরস্কি পরিচয় কোনমতেই খাঁটি প্রমাণ করতে পারবে না আইভানের কাছে। করা সম্ভবও নয়। সত্যি হলে তবেই না প্রমাণের প্রশ্ন আসে। অতএব মুখ যদি খুলতেই হয়, সত্যি কথাই বলতে হবে। নয়ত বন্ধ করে রাখতে হবে। তাইরেনাইরে করে কাজ হবে না।

ও মাসুদ রানা। নগণ্য এক দেশসেবক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অসংখ্য অপারেটরের মধ্যে একজন, প্রথম সারির। নীতির প্রশ্নে জীবনে কখনও আপোষ করেনি, করবেও না। নিজের জীবনের চাইতে বরাবরই দেশ ওর কাছে বড়। তার সম্মান, তার মর্যাদা কিছুতেই ভূলুণ্ঠিত হতে দিতে পারে না রানা। কোন কিছুর বিনিময়েই নয়। অতএব? জীবন গেলেও মুখ খোলা চলবে না।

'স্বেচ্ছায় আমি মুখ খুলব না, কর্নেল,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ও। 'আপনি বরং অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখুন।'

পলকহীন চেয়ে থাকল গরস্কি ওর মুখের দিকে। নড়ছে না একচুল। একটু

যেন থমকে গেছে। যখন ফের কথা বলতে আরম্ভ করল, মনে হল যেন বহুদূরে রয়েছে সে। 'যে দেশেরই সন্তান হোন আপনি, দেশটি বড় ভাগ্যবান। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক আপনি। কারণ লুবিয়াঙ্কার পেটের ভেতরে বসে জীবনে কখনও কোন বন্দীকে এত দেমাগের সাথে কথা বলতে শোনেনি কেউ। আপনার ওপর নির্যাতন চালাতে খারাপই লাগবে আমার। সত্যি বলতে কি, আপনাকে বেশ খানিকটা ভালই লেগে গিয়েছিল। কিন্তু,' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল আইভান গরস্কি, 'আমাকেও যে আমার কর্তব্য করতে হবে! আমিও নিজেকে দেশপ্রেমিক মনে করি। তবে আপনার মত অতটা খাঁটি হয়ত নয়।'

'ধন্যবাদ।' গলা শুকিয়ে চৈত্র মাসের চষা খেতের মত খটখটে হয়ে গেছে রানার।

'আমি আর দশজনের মতই সাংসারিক মানুষ। আমার স্ত্রী আছেন, খুবই চার্মিং লেডি। দুটি মেয়ের বাপ আমি। বড়টির বয়স বারো, ছোটটির দশ। উজ্জ্বল সোনালী রঙের চুল ওদের। ভারি মায়াভরা চোখ। অফিস শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরি, ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে ওরা আমার প্রতিদিন। নিমিষে সব ক্লান্তি ভুলে যাই আমি। এই যে সুখ, অনুমান করতে পারেন নিশ্চয়ই?'

'না,' কর্কশ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল মাসুদ রানা।

'না!' বিস্মিত হল গরস্কি। 'দেশে আপনার বউ-বাচ্চা নেই?'

'না, ওসব আমার নেই।' অন্তরে গোপনে লালিত রানার নিষ্ফল স্বপ্নবৃক্ষটির শেকড় ধরে টান দিয়েছে কর্নেল। অনেকটা হাহাকারের মত শোনাল কথাগুলো। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল ও। ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে ওঠার জন্যে বিরক্তও হল নিজের ওপর।

আবার প্রসঙ্গে ফিরে গেল কর্নেল। 'সে যাকগে। এত কথা বলছি এটুকু আপনাকে বোঝাতে যে এই ইউনিফর্মের নিচে আমিও সাধারণ একজন মানুষ। মানবিক দুঃখবোধ, কষ্টবোধ, সবই আছে আমার মধ্যে। যে জন্যে আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই মুখ খোলার। আশা করব অপ্রীতিকর কিছু করার আগেই আমাকে রেহাই দেবেন আপনি। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। তাহলে আবার নতুন করে শুরু করা যাক? এক মিনিট,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে হাসল কর্নেল। চেয়ার ছেড়ে উঠল। কাছে গিয়ে দরজায় দুটো টোকা দিল। খুলে গেল পুরু দরজা। নিচু গলায় কাউকে কিছু বলল সে, তারপর দরজা খোলা রেখেই ফিরে এল। চেয়ারে বসল না এবার কর্নেল, হাসিমুখে রানার সামনে টেবিলের ওপর নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসল।

পিছনে দুজোড়া বুটের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবার আগেই দুপাশ থেকে ওর দুহাত চেয়ারের হাতলের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরল দুজোড়া শক্তিশালী লোমশ হাত। ওদিকে চোখের পলকে ওয়েস্ট হোলস্টার থেকে নিজের বিশাল অটোমেটিক রিভলভারটা বের করে ফেলেছে গরস্কি।

পরমুহূর্তে 'মাফ করবেন,' বলেই বাঁ হাতে দড়াম করে মারল সে রানার

মাঝ পেটে। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রানা, দু পা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেছে আপনাআনি। দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁ করে দম নিতে গেল ও। ওটাই চাইছিল আইভান গরস্কি, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের লম্বা নলের প্রায় অর্ধেকটাই পুরে দিল ওর মুখের ভেতর। ঘটনার আকস্মিকতায় বেকুব বনে গেল রানা পুরোপুরি। লোকটার দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করছে। কি ঘটতে চলেছে অনুমান করতে পেরে আপাদমস্তক শিউরে উঠল রানার ভীষণভাবে।

ঠোঁট টিপে হাসছে কর্নেল। 'আগেই মাফ চেয়ে নিয়েছি কিন্তু। আপনার দাঁতগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'কে আপনি?' রাগে ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল গরস্কি। ঘণ্টা দুয়েক হল 'নতুন করে' শুরু করেছে সে। তখন থেকেই এভাবে চেঁচাচ্ছে লোকটা। হাতের তালু খোলা রেখে প্রচণ্ড এক থাবড়া বসিয়ে দিল টেবিলে। লাফিয়ে উঠল ভারী টেবিলটা। 'কি নাম আপনার, পরিচয় কি!'

'বলব না।' কথাটা শান্ত কণ্ঠে বললেও ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে গেছে রানা লোকটার মধুরঙা চোখে ক্রোধের আগুন দেখে। বলা যায় না, যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে সময়মত বাধা দিতে হবে। নইলে প্রথম ধাক্কাতেই আধমরা করে ফেলবে। রানার শেষ আশা-ভরসা সায়ানায়িড বিষযুক্ত মাড়ির নকল দাঁতটা কায়দা করে বের করে নিয়েছে কর্নেল। রুদ্ধ করে দিয়েছে ওর আত্মহত্যার পথ। তার পর থেকে খানিকটা বিচলিত মনে হচ্ছে রানাকে।

শঙ্কিত, আতঙ্কিত। কেজিবি-র ইন্টারোগেশনের টেকনিক জানা আছে রানার। খুব ভাল করেই জানে এদের নির্যাতনের মুখে বড়জোর দু দিন টিকতে পরবে ও। তারপর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে···। একমাত্র আশার কথা, এখনও মুক্ত রয়েছে রানা। হাত-পা বাঁধা হয়নি।

'বলুন!' আবার হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল। 'বলতেই হবে আপনাকে। মুখ বুজে থাকলে রেহাই পাবেন না। বলুন! বলুন!!' ভীষণ খেপে গেছে লোকটা, রাগে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, ইউনিফর্মের বগলের কাছটাও ভিজে গেছে। ঘন ঘন দম ফেলছে সে ঝড়ের গতিতে। 'কেন এসেছেন এ দেশে? কেন? কে, কারা পাঠিয়েছে আপনাকে? বিএসএস? কি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাততে চান মাদার রাশার বিরুদ্ধে?' চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে দাঁড়াল সে।

মুখের রক্ত সরে গেছে মাসুদ রানার, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। দেখলে যে-কারও মনে হবে বুঝি ভয় পেয়েছে। আসলে তা নয়। মুহূর্ত কয়েক আগে চরম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। শুনলে যে-কেউ রানাকেই উন্মাদ সাব্যস্ত করবে। ঠিক করেছে মার লাগাবে কর্নেলকে। ওর গায়ে হাত তুললে পাল্টা আঘাত করবে। এ ঘরে এখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। তাছাড়া, বোঝা যাচ্ছে চারদিকের দেয়াল নিরেট ইটেরই দেয়াল। ভেতরে কি ঘটছে বুঝবে না কেউ। তবে আর চিন্তা কি? মরতে তো এমনিতেও হবে, সে কেজিবি-র নির্যাতনের কারণেই হোক অথবা স্পাইঙের

অভিযোগে ফায়ারিং স্কোয়াডেই হোক। তার আগে হাতের সুখ মিটিয়ে নেবে মাসুদ রানা। লুবিয়াঙ্কার ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখে যাবে নিজেকে।

পরক্ষণেই অন্য এক আশার সঞ্চার হল রানার মধ্যে। যদি আচমকা আক্রমণ করে কাবু করে ফেলতে পারে ও গরস্কিকে, তাহলে হয়ত পালিয়ে যাওয়ারও একটা সুযোগ করে নিতে পারবে। কাজটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। পারবে ও। জায়গা বদল করে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হাত কাঁধ এবং পিঠের পেশীতে নেমে গেছে রক্ত। এই জন্যেই ফ্যাকাসে লাগছে চেহারা। এখন শুধু মোক্ষম সময়ের প্রতীক্ষা। কখন রাগে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায় আইভান গরস্কি, রক্তের নেশায় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে।

তবে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে গরস্কিকে আন্ডার এস্টিমেট করা চলবে না ভুলেও। নিজেকে সতর্ক করল রানা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একজন ফুল কর্নেল গরস্কি। হেজিপেজি নয়। মাসুদ রানার মত বিপজ্জনক চরিত্রকে সামাল দেয়ার ক্ষমতা অবশ্যই রাখে সে। যা করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে। শক্তির চেয়ে কৌশল খাটাতে হবে বেশি।

লম্বা করে দম নিল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্তটা আত্মধ্বংসী। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন পথও আসলে খোলা নেই সামনে। নকল দাঁতটা কেড়ে নিয়ে গরস্কি-ই পরোক্ষে বাধ্য করেছে ওকে এ কাজে। ওটা থাকলে অন্য লাইনে চিন্তা করত রানা।

'বলুন, কে আপনি!' একটানে কোমরের বেল্টটা খুলে ফেলল কর্নেল গরস্কি। চোখের পলকে ওটা ঘুরিয়ে মারল প্রচণ্ড শক্তিতে। পুরু, ভারী বাকল্‌টা 'চড়াৎ' করে আছড়ে পড়ল টেবিলের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে চলটা উঠে গেল কাঠের।

অনেকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুহাত তুলেছিল মাসুদ রানা। আসলে গরস্কির ঘাড়ের করোটিড নার্ভের ওপর কারাতের আঘাত করবে বলে তুলেছিল হাত। মারটা গায়ে লাগলে তাই করত রানা।

'ভুয়া প্রোপুস্ক কারা সরবরাহ করেছে আপনাকে? একজন রুশ নাগরিককে অনুসরণ করছিলেন, গ্রেফতার এড়ানর চেষ্টা করেছেন। তার ওপর আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে···।' মাঝ পথে থেমে গেল গরস্কি। দুই পা এগিয়ে এল রানার দিকে। 'আপনি জানেন, কত বছর রুশ লেবার ক্যাম্পের ঘানি টানতে হবে আপনাকে এই অপরাধের জন্যে? জানেন আপনি?'

আরেক পা এগোও, শালা! মনে মনে বলল রানা, আর এক পা। এতে সুবিধে হবে ওর। রানার তরফ থেকে আক্রমণ ভুলেও আশঙ্কা করছে না গরস্কি। করার কথাও নয়। পানিতে নেমে কুমীরের সঙ্গে লড়ে না কেউ। সে আত্মবিশ্বাস তার ষোলো আনাই আছে। কাজেই রানার কোন সমস্যা নেই। সমস্যা গরস্কির, চরম বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

আবার চেঁচাতে শুরু করল আইভান গরস্কি, সেইসঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নকে বেশি বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্যে চলতে লাগল বেল্ট দিয়ে টেবিল পেটানো। প্রতিটি আঘাতে চলটা উঠছে। দেখতে দেখতে ওটার পালিশ করা সমতল পিঠ

চাঁদের উল্টোপিঠের মত চেহারা পেল। 'কি করে বুঝব আমি যে আমার দেশের বিরুদ্ধে কোন নোংরা অভিপ্রায় নেই আপনার? কি করে বিশ্বাস করি যে আমাদের বড় কোন বিপদে ফেলতে যাচ্ছেন না আপনি? বলুন, মুখ খুলুন! কে আপনি? কেন এদেশে এসেছেন? কোন ইন্টেলিজেন্স আউটফিটের লোক আপনি?'

রানার মনে হল সত্যি সত্যিই বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে মানুষটা। সাদা আলোর নিচে ঘামে জবজবে মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেহারা ওরকম হতে পারে না।

'যাকে অনুসরণ করছিলেন, কে সে? কি নাম তার?'

প্রশ্নটা চমকে দিল রানাকে। সন্দেহ হল ঠিক ওই প্রশ্নটিই সে করেছে কি না। অবশ্য পরমুহূর্তেই সন্দেহ দূর হল।

'কে ছিল লোকটা?' আরেক টুকরো চলটা খোয়াল টেবিল। 'উত্তর দিন, কাকে অনুসরণ করছিলেন?'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জানি না।'

কিন্তু কণ্ঠস্বর বিশ্বাসঘাতকতা করল। যে ভাবে বলল, শব্দ দুটো ঠিক সে ভাবে নয়, অন্যভাবে গেল গরস্কির কানে। থমকে গেল কর্নেল। অবিশ্বাসে সামান্য বিস্ফারিত হল দু চোখ। স্থির দৃষ্টিতে ঝাড়া দশ সেকেন্ড চেয়ে থাকল রানার দিকে। তারপর নড়ে উঠল। ইউনিফর্মের নিচে তার ব্যায়ামপুষ্ট চওড়া বুকের ছাতি অনেকখানি স্ফীত হল, মনে হল ঘরের সব অক্সিজেন একটানে ফুসফুসে টেনে নিল লোকটা।

চাপা হিসহিসে কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'এত আস্পর্ধা! এতবড় সাহস! আমার গায়ে হাত তুলতে চান? কমিটেড গসুদারস্তভেনয় বেসপুসনস্তির পলকভনিকের গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস তারই হেডকোয়ার্টারে বসে?' মুখটা কয়েক ইঞ্চি সামনে বাড়াল গরস্কি, সরু হয়ে গেছে চাউনি। 'এর পরিণতি কি, জানেন? জানেন, বিনা বিচারে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করা হবে আপনাকে এ-জন্যে, জানেন?'

'জানি।' দু হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোন পথ চোখে পড়ছে না আমার, কর্নেল। আপনি কি আশা করছেন, আপনি আমাকে বেল্ট দিয়ে ধোলাই করবেন আর আমি আঙুল চুষব বসে বসে?'

পিছিয়ে গেল কর্নেল। কপাল কুঁচকে আছে-চিন্তিত। বেল্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিজের চেয়ারের দিকে। লক্ষ্য ঠিক ছিল না, গড়িয়ে চেয়ারের নিচে চলে গেল ওটা। এবার দুম্ দুম্ করে পা ফেলে রুমের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করে বেড়াতে শুরু করল। দু হাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ, মুখচোখ গম্ভীর। মনে মনে কোন কঠিন শপথ নিচ্ছে হয়ত।

এ নিঃসন্দেহে কিরভের-ই কাজ। ভাবছে রানা, এখানেই ফোন করেছিল সে তখন। কিন্তু নিজের পরিচয় কেন জানায়নি ব্যাটা এদের? নিজেকে কেন গোপন করে গেল সে? ওকে ধরিয়ে দেয়ার কি প্রয়োজন পড়ল তার? শুধুই

অনুসরণ করার জন্যে? নাকি এলিনার মুখে ওর ব্যাপারে কিছু শুনেছে কিরভ? এবং ও জামান শেখের বন্ধু, এটুকু শুনেই অনুমান করে নিয়েছে রানা কে হতে পারে। কি দাঁড়াল তাহলে? ধুত্তোর! মেজাজ চড়ে গেল রানার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

একনাগাড়ে দশ মিনিট পায়চারি করল কর্নেল। চোখ দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত অনুসরণ করল তাকে রানা। প্রথমে যতটা মনে হয়েছিল, ততটা খাটো নয় আসলে লোকটা। চওড়ায় রানার দেড়গুণ। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই পরিষ্কার বোঝা যায় প্রয়োজনে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে সে। দ্বৈত-লড়াই যদি বেধেই যায়, ফলাফল কি হবে অনুমান করার চেষ্টা করল রানা।

ওর দিকে পিছন দিয়ে থামল গরস্কি। বাঁ হিলে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নাটকীয় ভঙ্গিতে। 'এখনও সময় আছে। এখনও নিজেকে বাঁচাতে পারেন আপনি। বলুন, কাকে অনুসরণ করছিলেন।'

'আমিই কি ছাই জানি?' বলল রানা। 'পরিচয় জানার জন্যেই তো অনুসরণ করছিলাম লোকটিকে!'

'বিশ্বাস করলাম না!' প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল কর্নেল বাঁ হাতের তালুতে। 'কেন তার পরিচয় জানার প্রয়োজন পড়ল? কে লাগিয়েছে আপনাকে তার পিছনে?'

আবার! বিরক্তি বোধ করতে লাগল মাসুদ রানা। লোকটা জানে এ পথে কাজ হবে না, তারপরও কেন ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন করছে! এখন তো ও নিশ্চিত যে রানা একজন স্পাই, যে আউটফিটের-ই হোক। এ-ও ভালই বোঝে কোন স্পাই স্বেচ্ছায় মুখ খোলে না। ব্যাটা কি ওপরওয়ালাদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে এসব করছে? দেখাতে চাইছে কোন নির্যাতন করা ছাড়াই বিদেশী স্পাইয়ের মুখ খোলাবার ক্ষমতা তার আছে?

মাটির দিকে চোখ রেখে চেয়ারের কাছে ফিরে এল কর্নেল গরস্কি। বেল্টটা তুলে নিয়ে পরে ফেলল। মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পারছে না রানা।

'এই শেষবার জানতে চাইছি, কে আপনি?'

'মিখাইল জিভরস্কি। বলেইছি তো আমাতে নয়, গণ্ডগোল আছে আপনাদের মেইন কম্পিউটরে।'

'ভেরি ওয়েল। দেখব আমি কত সহ্যশক্তি আপনার।' টেবিলে দু হাতের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল কর্নেল। 'প্রয়োজনে আমাদের সমস্ত মেথড প্রয়োগ করব আপনার ওপর, প্রতিটি টেকনিক প্রয়োগ করব ইন্টারোগেশন সেলে। তখন চাইলেও ক্ষমা পাবেন না। বুঝতে পারছেন আমার কথা, মিখাইল জিভরস্কি?'

'হ্যাঁ।'

'আশা করছি এর অন্তর্নিহিত অর্থটাও অনুধাবন করতে পেরেছেন?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'পেরেছি।'

দশ

পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে বসে আছে ইঁদুরটি।

অপলক চোখে দেখছে ওটাকে মাসুদ রানা।

বসার সুবিধের জন্যে পা দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে খুদে প্রাণীটা। গা ভরা ধূসর, ভেলভেটের মত মোলায়েম পশমের নিচ দিয়ে ছোট ছোট নখগুলো বেরিয়ে আছে। সামনের পা জোড়া অত্যন্ত দ্রুত, ছন্দোবদ্ধ তালে কাজ করছে-নাক চুলকাচ্ছে।

দেখতে পায়নি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে।

চোখের মণি স্থান বদল করল রানার, সাপটার ওপর গিয়ে স্থির হল। কালচে দেহটা দুটো প্যাঁচ খেয়ে ছড়িয়ে আছে মেঝের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। মাথাটা মাটি থেকে ছইঞ্চি ওপরে, বুকের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে উঠে গেছে সোজা। এখনও ফণা বিস্তার করেনি। হঠাৎ দেখলে লাঠিগোছের কিছু মনে হতে পারে। ধৈর্যের সঙ্গে চেয়ে আছে শিকারী শিকারের দিকে। ওদের মাঝখানে তিন ফুটের মত ব্যবধান। তবে ওটা সমস্যা হবে না। সাপটার দৈর্ঘ্য কম নয়, সময় মত চোয়াল তার ঠিকই পৌঁছুতে পারবে সঠিক স্থানে।

সাপ রয়েছে ইঁদুরটির ডান দিকে। তার পুঁতির মত ছোট, চকচকে কালো চোখের মণিতে রুমটির মিনিয়েচার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে গোল হয়ে। রানা ভাবছে, আমিও আছি নিশ্চয়ই ওখানে। ওর যমদূতও। মনে হল ইঁদুরটিও সম্ভবত সাপটিকে দেখতে পাচ্ছে। কারণ তার চোখের রেটিনার সীমানার মধ্যেই সে আছে। কিন্তু যেহেতু সাপ স্থির, রেটিনা সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারছে না ওটাকে। বিপদ সঙ্কেত পাঠাতে পারছে না ইঁদুরটির খুদে মস্তিষ্কে। হয়ত ভাবছে দড়ি-টড়ি কিছু হবে, অথবা কোন ছায়া। টের পেলে হাওয়া হয়ে যেত ক-খ-ন!

হিমশীতল মৃত্যুদূতটির নড়াচড়া চোখে পড়ল এবার মাসুদ রানার। একচুল একচুল করে এগোতে শুরু করেছে গোটা কুণ্ডলিটা। গতি এতই মন্থর, রানার সন্দেহ হল ব্যাপারটা সত্যি কি না। ও ঠিক দেখছে কি না। না, সত্যিই। একচুল এগোচ্ছে, সেই সঙ্গে সমপরিমাণ উত্থান
ঘটছে ফণার। এবং বুক থেকে উপরের অংশটুকু ক্রমশ পিছিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ লাগল ফণাটার পূর্ণ বিস্তার লাভ করতে। ততক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে কুণ্ডলী, ফণাটিকে বিদ্যুৎগতিতে চালনার জন্যে দেহের পুরো শক্তি এসে জমা হয়েছে ঘাড়ের পেশীতে।

এই সময় প্রকৃতি বা নিয়তি, যে-ই হোক, সঙ্কেত পৌঁছে দিল শিকারের মস্তিষ্কে। অনুভূতিটা ইঁদুরের, মানুষের উপযুক্ত নয়। তাই বুঝতে পারল না রানা সেটা কেমন। হবে হয়ত হাতের উল্টোপিঠের রোম দাঁড়িয়ে পড়ার মত একটা

কিছু। ঘুরে তাকাল ইঁদুর। রানা দেখছে তো দেখছেই। অনুমান করার চেষ্টা করছে, যদি···রক্ত হিম করা 'ফোঁশ্‌শ্‌!' এর সঙ্গে চাবুকের মত ছোবল হানল শিকারী। লাফ দেয়ার চেষ্টা করল ইঁদুরটা শেষ সময়···

'শুনতে পাচ্ছেন?'

···নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ইঁদুরটি কিন্তু···।

'এই যে! শুনছেন?' আবারও দুটো চাপড় পড়ল কাঁধে।

ধাক্কা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল মাসুদ রানা। খেঁকিয়ে উঠল কর্কশ কণ্ঠে। 'কি মনে হয় তোমার?' চোখ খুলতে গেল ও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল দৃষ্টি আলোর বন্যায়। আবার টেবিলে মাথা রাখল।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' নিশ্চিত হতে চাইছে যেন অদৃশ্য কণ্ঠধারী।

রানার চার হাতের মধ্যেই রয়েছে আলোর উৎস। বিশাল একটা ফ্লাড বাল্‌ব্‌, ডায়ামিটার দুই ফুট। এ মুহূর্তে ওটার দিকে তাকাতে পারছে না রানা। কিন্তু গত রাতের প্রায় পুরোটাই তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে ওকে। ইচ্ছে থাকলেও চোখ বুজতে পারেনি চোখের পাতায় লোকাল অ্যানেসথেটিক পুশ করার কারণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রানার চোখ এবং মস্তিষ্কের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছে আলোর বন্যা।

এখন বরং সেই তুলনায় বেহেশতে আছে ও। ভোরের দিকে পলকভনিক গরস্কির নির্দেশে সুই ঢুকিয়ে টেনে বের করে নেয়া হয়েছে তরল পদার্থটুকু। হাতের বাঁধনও খুলে দেয়া হয়েছে। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে ওকে। বোঝা গেছে গরস্কি বেশ উদার মনের মানুষ, অন্যদের মত সেলে ঢুকিয়েই ধর তক্তা মার পেরেক রীতিতে কাজ শুরু করেনি সে। অথচ কেজিবি-র ইন্টারোগেশন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওই নিয়মেই শুরু হয়। ওর বেলায় প্রথম অধিবেশনটা গেছে আলো আর ইঞ্জেকশনের ওপর দিয়ে।

গত সন্ধেয় সেলে ঢুকিয়ে প্রথমে চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয় মাসুদ রানাকে। তারপর চোখের পাতায় ইঞ্জেকশন পুশ করে জ্বেলে দেয়া হয় ফ্লাড বাল্‌ব্‌। ওটার পিছনে, আলোর আওতার বাইরে কোথাও বসে বসেই রাতটা কাটিয়েছে আইভান গরস্কি, রানা জানে। অথচ আর একটিবারও আগের মত প্রশ্ন করেনি, আপনি কে, বা কেন এসেছেন এদেশে। তার উপস্থিতি কখনও কখনও টের পেয়েছে রানা আধা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে।

গ্লাস-বোতলের ঠোকাঠুকি, কাঁটা চামচ প্লেট-ডিশের আওয়াজও শুনেছে। অর্থাৎ ওখানে বসে রাতের ডান হাতের কাজটিও সেরেছে সে। সেল ছেড়ে বাইরে কোথাও যায়নি। হয়ত আশা ছিল যে কোন সময় মুখ খোলার আগ্রহ দেখা দিতে পারে রানার মধ্যে। তাই অনুপস্থিত থাকার ঝুঁকি নেয়নি। ভোরে সহকারীকে কিছু নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে। দশটায় আসবে আবার। এসব অবশ্য রানা জানে না।

এই নিয়ে তিনবার ওকে ঘুমের মাঝামাঝি স্তর থেকে ঠেলে জাগাল লোকটা। তিনবার, নাকি চারবার? কোন ব্যাপার নয়। তবে আগামীতে আরও

কঠিন সময় আসছে। কষ্টসাধ্য হলেও এরপর থেকে প্রতিটি বিষয় মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, নিজেকে বলল মাসুদ রানা। গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকলেও থাকতে পারে ওর মধ্যে। ধরা যাক, এটা তৃতীয়বার। হিসেবটা মনে রাখতে হবে।

শালার সাপ, ভাবল ও। একেক সময় ওটাকে মনে হয়েছে যেন গরস্কির কোমরের বেল্ট। ছোবলের ভঙ্গিতে বারবার আছড়ে পড়ছে এসে ওর পিঠে। লোকটা কোথায় এখন, গরস্কি? সাড়া নেই কেন, ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? ঘড়ি দেখতে গেল রানা, থেমে গেল মাঝপথে। মনে পড়েছে, এখানে নিয়ে আসার পর ঘড়িটা খুলে নিয়ে গেছে কে যেন। অতএব সময় জানার উপায় নেই।

মুখ তুলল রানা। চোখের সামনে হাতের আড়াল রেখে এদিক ওদিক তাকাল। অনেক ওপরে, সিলিঙ ঘেঁষে ছোট একটা ফোকর। অন্ধকার। এর মানে অবশ্য এই নয় যে বাইরে এখন রাত। এটা নিশ্চয়ই ক্লোজ কনফাইনমেন্ট সেল। সময় সম্পর্কে বন্দীকে বিভ্রান্ত করার জন্যে ওরকম ভেন্ট থাকে এগুলোয়, কালো পেইন্ট করা। রানার অবচেতন মনের ঘড়ি যদি মিথ্যে না বলে তাহলে সকাল হয়ে গেছে। এক আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক অবশ্য হতে পারে। তবে রাত নয় এখন কিছুতেই। তা-ও অবশ্য হলপ করে বলা যায় না, ভাবল রানা। তিনবার ঘুমিয়ে পড়েছিল ও প্রচণ্ড অবসাদ আর ক্লান্তিতে। তিনবার, না চারবার? তিনবার-ই হবে।

কাছেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কেউ মোটা গলায়। কিন্তু যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল মাঝপথে চিৎকারটা। কান খাড়া করল রানা, কিসের চিৎকার? মরুক্‌গে! ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, তুমি তোমার কাজ করো। আজ তো বিস···না, হ্যাঁ, বিস্যুৎবার।

রোববার এই সময় কক্সবাজার ছিল ও, গ্লাইডার নিয়ে বিচরণ করছিল আকাশে। হঠাৎ করে সোহেলের বার্তা, বার্লিন-হ্যানোভার-লাইপজিগ-মস্কো। এর মধ্যে কয় ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছে হাতে গুনে বলতে পারবে রানা। ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মধ্যে বড়জোর সাত, কি আট ঘণ্টা···

দেখতে ভুল করেছিল মাসুদ রানা। ছোবল এখনও দেয়নি আসলে সাপটা। এইবার দিতে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে ইঁদুরটিকে সাবধান করতে চাইল ও, কিন্তু স্বর ফুটছে না। কে যেন দুহাতে সজোরে চেপে ধরেছে গলা, ঝাঁকাচ্ছে ভীষণভাবে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'উঠুন, উঠুন! আর কত ঘুমাবেন?'

শা-লা! তুমি দম বন্ধ করে আমাকে হত্যা করবে আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব! দাঁড়া···!

'আরে, এই যে, উঠে পড়ুন!'

'কী মুশকিল! জেগেই তো আছি,' গুঙিয়ে উঠল রানা।

'জ্বী না, আপনি ঘুমুচ্ছেন।'

'জাহান্নামে যাও তুমি, শা-লা!'

আবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কে যেন। সম্ভবত পাশের রুমেই, মনে

হল মাসুদ রানার। তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে কেউ। এবারও মাঝপথে রুদ্ধ হয়ে গেল তা, যেন লোকটির গলা চেপে ধরা হয়েছে।

নিজের ভাবনায় ফিরে গেল রানা। এরা ওর নাম জানে না, জানে না কিরভের পরিচয়ও। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। টেলিফোনে ঠিক কি বলেছিল লোকটা এদের? পবেদা নিয়ে আমার পিছু লেগেছে অচেনা এক লোক, তাকে পাকড়াও করুন? শুধুই এই? এটুকু শুনেই পুলিস আর মিলিশিয়ার এতবড় বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে কেজিবি ওর পিছনে?

তাদের অন্তত জানতে চাওয়া উচিত ছিল লোকটি কে, বা আপনি কে। তা করেনি ব্যাটারা। নাকি করেছে? নিজের পরিচয় চেপে গেছে হয়ত কাপিস্তা কিরভ। ভীষণ গরম লাগছে। ওভারকোট, কোট, টাই অনেক আগেই খুলেছে রানা, ত্যক্ত হয়ে শার্টটাও এবার নামাল। ফ্লাড বাল্বের উত্তাপ যেন আগের থেকে আরও বেড়েছে। বাদ দাও! আবার আজেবাজে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি। কাজের কথা ভাবো।

কি দাঁড়াল তাহলে? ঘোড়ার ডিম! ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে মিলিশিয়াটিকে কি বলেছিল কিরভ? কি বের করে দেখিয়েছিল তাকে? যাই দেখাক, নিজের আসল পরিচয় জানতে দেয়নি তাকে। হয়ত···এখানটাতেই কেমন খটকা লাগে। অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক ফোন করে আরেক অজ্ঞাতপরিচয়কে আটক করার জন্যে বলল, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটল ব্যাটারা—অবিশ্বাস্য নয়?

ব্যাপারটিকে আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে লাগল মাসুদ রানা। কেউ কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ব্রিটিশ এমব্যাসির? ওর কথা জানিয়ে দিয়েছে এদের নাম উল্লেখ না করে? সম্ভব? হতে পারে। সম্ভব। উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ও। এর সাথে কিরভের টেলিফোনের হয়ত কোন যোগসূত্র আছে। ঝিমুনি শুরু হয়ে গেল রানার আবার। গরস্কি, বুড়ো শকুন, তোমার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি? লোকাল কল, বেশি খরচ হবে না। টিলসনকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন।

'মুখ তুলুন!'

'কি?'

'মুখ তুলুন, আলোর দিকে তাকান।'

কাংসপাত্র নাকি হে তুমি? কেন কানের কাছে ঠং ঠং করছ!

'বলছি মুখ তুলুন!' ধমকে উঠল এবার অদৃশ্য কণ্ঠধারী।

পাল্টা ঝাঁঝ দেখাল রানা। 'কেন বিরক্ত করছ···?'

'কি বললেন? আবার বলুন।' একটু যেন বিস্মিত হল লোকটি।

লক্ষ রাখো। কোন ভাষায় বলেছ তুমি কথাটা? বাংলা না ইংরেজিতে? ভুলে যেয়ো না তুমি রাশিয়ান। রুশ ছাড়া আর কোন ভাষা জানো না।

এবারও ইংরেজিতে বলে উঠল আধা অপ্রকৃতিস্থ রানা। 'শাট আপ, বাস্টার্ড!'

অর্থ বুঝল না লোকটা, তবে ওটা যে বিদেশী ভাষা তা ঠিকই বুঝতে

পেরেছে। কিছুক্ষণ রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল সে হতভম্বের মত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল দ্রুত, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। বুট জুতোর প্রতিধ্বনি তুলে বেরিয়ে গেল রুম ছেড়ে।

ঝিম ঝিম ভাবটা ভীষণ অস্বস্তিকর। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই ওর, সব যেন কেমন এলোমেলো লাগছে। মাথাটা যেন তুলোর তৈরি, এক রত্তি ওজনও নেই। ফাঁকা, শূন্য-বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরময়। ভাসতে ভাসতে এক কোণে গিয়ে থেমে দাঁড়াল ওটা, ঘুরে চেয়ে থাকল মাথাহীন মাসুদ রানার দিকে। ওপরে-নিচে দুলছে একটু একটু।

'কেমন বুঝছ, মিস্টার স্পাই?' হঠাৎ কথা বলে উঠল ওটা। 'এবার কোন আশা নেই তোমার। তোমার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে, এই লুবিয়াঙ্কাতেই। বড় জঘন্য মৃত্যু, বুঝলে? এভাবে কলে পড়া ইঁদুরের মত ছটফট করে মরবে ভাবতে খারাপ-ই লাগছে!'

ইঁদুর! চমকে উঠল মাসুদ রানা, ওটা কি বেঁচে আছে এখনও? না হারামী সাপটার পেটে গেছে? কি করছে এখন খুদে ইঁদুর? বেঁচে আছে এখনও? বেরোবার জন্যে ছটফট করছে ওটার পেটের ভেতর? আহ্! কি শান্তি! এই মুহূর্তে যদি ঘুমিয়ে যেতে পারত রানা, অন্তিম ঘুম, বড় ভাল হত।

নিজের অফিস রুমে বসে আছে পলকভনিক আইভান গরস্কি। খানিকটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। চোখ দুটো লাল, বসে গেছে। নির্ঘুম রাত কাটানোর ফল। বাসায় যায়নি সে কাল। এ এক দুর্লভ ঘটনা। তবে অজ্ঞাত পরিচয় কারও টেলিফোনের ওপর ভিত্তি করে আরেক অজ্ঞাত-পরিচয় বিদেশী স্পাই ধাওয়া করে ধরে আনাও কম দুর্লভ নয়।

অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে টেলিফোনটা সে-ই রিসিভ করেছিল গতকাল। তার নির্দেশেই চিরুনি অভিযান চালানো হয় মাসুদ রানাকে ধরার জন্যে। লোকটা স্পাই, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন দেশের? ব্রিটিশ? সম্ভাবনার কথাটা আচমকা মাথায় এল গরস্কির, লোকটা ইসরায়েলি নয় তো? মোসাদ? মস্কোর ইহুদী স্যাবোটিয়ারদের সংগঠিত করে কোন বদ মতলব হাসিল করতে এসেছে হারামজাদা?

ভাবনাটা প্রায় কাঁপিয়ে দিল আইভান গরস্কিকে। ওহ্, গড! মধুরঙা চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'গড! গড!' বিড়বিড় করছে সে। নিজেকে তার একটা তৃতীয় শ্রেণীর আহাম্মক বলে মনে হল। এই সহজ ব্যাপারটা মাথায় আসতে এত সময় লেগেছে কেজিবি-র একজন কর্নেলের ভাবতেই মেজাজ বিগড়ে গেল। ইচ্ছে হল চড়িয়ে তুবড়ে দেয় নিজের গাল।

নিশ্চয়ই ওলেগ পেঙ্কোভস্কি এবং তার সঙ্গীদের বিচারের প্রতিশোধ নেয়ার কোন পরিকল্পনা করেছে বেজন্মা ইহুদীর বাচ্চারা। এই হারামীর বাচ্চাকে হয়ত পাঠানো হয়েছে মস্কোর ইহুদী অ্যানার্কিস্টদের সংগঠিত করে মারাত্মক কিছু একটা···কি? কি সেটা? কি হতে পারে! গা কাঁপতে শুরু করল গরস্কির। হাত কাঁপছে রীতিমত থরথর করে।

মাত্র দুদিন পর রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কো আসছেন বন্ধুপ্রতীম বাংলাদেশের মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আর এই সময়-ই কিনা···। দিশেহারার মত তড়াক করে আসন ছাড়ল কর্নেল গরস্কি কি ভেবে। থমকে গেল। আবার বসে পড়ল ধপ্ করে। এলোমেলো চুলগুলো দুহাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল সে।

জোর করে বিক্ষিপ্ত মনটাকে স্থির করল গরস্কি। ঠাণ্ডা মাথায় পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবতে বসল। কাঁপাকাঁপি বন্ধ হয়ে গেল এক সময়। অদ্ভুত রকম শান্ত এখন পলকভনিক আইভান গরস্কি। ইহুদীদের ব্যাপারে ক্রেমলিনের আগের নির্দেশটা নিয়ে ভাবল। ওতে ছিল, ছোট ছোট জটলায় বাধা দেয়ার দরকার নেই, তবে বড় ধরনের সমাবেশ অবশ্যই কঠোর হাতে দমন করতে হবে। প্রয়োজনে নেতাগোছের যারা, তাদের আটক করা যেতে পারে। একরাত হাজতে কাপড়-চোপড় খুলে বসিয়ে রাখা যেতে পারে। তারপর মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

এছাড়াও 'বিশেষ নির্দেশ' ছিল, সন্দেহভাজন বিপজ্জনক ইহুদী অ্যানার্কিস্টদের ওপর শুধুমাত্র সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে, বিশেষ পরিস্থিতি দেখা না দেয়া পর্যন্ত। দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। দিয়েছে, ভাবল কর্নেল, 'বিশেষ পরিস্থিতি'-ই দেখা দিয়েছে এখন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরেই ক্রেমলিনের ওই নির্দেশ বাতিল করে দিতে পারে গরস্কি। সে ক্ষমতা সুপ্রীম সোভিয়েত কম্যান্ড দিয়েই রেখেছে কেজিবি-কে।

টেলিফোন তুলে ফাইলিং ক্লার্ককে একটা বিশেষ ফাইল এখনই তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিল গরস্কি। এক মিনিটের মধ্যে ওটা বগলদাবা করে উপস্থিত হলো ক্লার্ক। বিপুল বিক্রমে ফাইলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্নেল। সন্দেহভাজন ইহুদী অ্যানার্কিস্টদের নামের তালিকা আছে ওতে। কে কতটা বিপজ্জনক তা বোঝাবার জন্যে প্রতিটি নামের পাশে লাল কালিতে তারকা আঁকা আছে।

এক থেকে তিন তারকাওয়ালা মহারথী পর্যন্ত আছে তাদের মধ্যে। শেষেরগুলোই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। নিয়ম অনুযায়ী এদেরই প্রথমে আটক করার কথা। কিন্তু নিয়মের বাড়ির ধার দিয়েও গেল না সে, চিহ্নগুলোর পাশে ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ করে কলমের আঁচড় টেনে যেতে লাগল দ্রুত। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার দশা হল শেষ পর্যন্ত। একটি নামও চোখে পড়ল না যেটার পাশে দাগ নেই। একটা কাগজে লিখল কর্নেল: রেড অ্যালার্ট স্টপ প্রায়র ইন্সট্রাকশনস্ রিগার্ডিং স্টার মার্কড জুইশ রেসিডেন্ট ক্যানসেলড্···ইত্যাদি ইত্যাদি। কাগজটা লুবিয়াঙ্কার কমিউনিকেশনস সেলের চীফকে ডেকে তার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'এখনই পাঠাতে চেষ্টা করো বার্তাটা,' গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বলল গরস্কি। 'একটা পোস্টও যেন বাদ না পড়ে।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে ফাইল বন্ধ করল কর্নেল। হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। চোখ বুজে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। আরেকটা কাজ আছে। তার

এই পদক্ষেপ সম্পর্কে উর্ধ্বতন অফিসারদের অবহিত করতে হবে। অবশ্য সেটা সন্ধের পর হলেও চলবে। এ মুহূর্তে নিজেকে ব্যস্ত রাখার মত তেমন কিছু নেই। ওই স্পাইটিকে জেরা করার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করবে বলে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওটাও আপাতত স্থগিত রাখল সে।

তার পরিচয় সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে। অতএব ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আগে 'রেড অ্যালার্ট' ইন্সট্রাকশনটা কার্যকর হোক, তারপর সব তারকার সঙ্গে ওটাকেও এক পাত্রে ঢেলে সেদ্ধ করা হবে। কি করে মুখ না খুলে পারে সে দেখে ছাড়বে কর্নেল আইভান ইগোরোভিচ গরস্কি।

এগারো

গরস্কির মন খারাপ। 'রেড অ্যালার্ট' ঘোষণা করার পর তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। চারদিক থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো মেসেজ এসেছে, তার প্রত্যেকটি হতাশাব্যঞ্জক। তিন বা দুই তারকাওয়ালা কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি কেজিবি এখনও। গত ক'দিন থেকে এমনিতেই খুব একটা প্রকাশ্যে দেখা যেত না লোকগুলোকে। আজ ধরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কেউ নেই। হাওয়ায় উবে গেছে যেন কয়েক ডজন বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর ইহুদী অ্যানার্কিস্ট।

সময় যত গড়াচ্ছে ভেতরের রাগ ততই মিইয়ে আসছে গরস্কির। বদলে আতঙ্কিত হয়ে উঠছে সে। কি করা যায় ভাবছে। সন্ধে পর্যন্ত দেরি না করে বেজন্মাগুলোর উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখনই বরং জানিয়ে দেয়া যাক বিভাগীয় প্রধানদের, ভাবল গরস্কি। সেটাই যথোপযুক্ত হবে। এতে আর কিছু না হোক, এখনই সতর্ক হওয়ার, পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা যাবে। সে-ই ভাল।

চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল কর্নেল। লাঞ্চ আওয়ারের আধ ঘণ্টা বাকি আছে। এখনই সঠিক সময়। একবার লাঞ্চে বেরিয়ে গেলে বড় কর্তাদের ফিরতে, একত্রিত করতে সময় লাগবে। টেবিলের ওপর তিনটে টেলিফোন আর ইন্টারকমের মত দেখতে আরেকটা সেট আছে। বহুমুখী কাজ ওটার। শেষেরটার দিকে হাত বাড়াতে গেল কর্নেল, থেমে গেল মাঝপথে।

ঝন ঝন করে বেজে উঠল একটা টেলিফোন। মুখ ঘুরিয়ে সেটটার দিকে তাকাল সে। ওটা 'বিশেষ' টেলিফোন, ডিরেক্ট। খুব কম লোকই জানে ওটার কথা। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলল কর্নেল। কানে লাগাতেই মৃদু 'টুঁ' জাতীয় একটা আওয়াজ উঠল লাইনে। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে গেল তার। আইএসডি লাইনে হয় এই বিশেষ আওয়াজ, যে করছে এবং যে অপর প্রান্তে রিসিভার তুলছে, দুজনেই শুনতে পায়। লং ডিসট্যান্স কল।

অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কর্নেলের অন্য হাতটা দ্রুত এগিয়ে গেল

ইন্টারকম সেটটার দিকে, ওটার একটা সুইচ টিপে দিল সে। এর ফলে লুবিয়াঙ্কার অত্যাধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বিশেষ টেলিফোন ট্রেসিং কম্পিউটরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল লাইনটা।

'পলকভনিক গরস্কি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। আড়চোখে সঠিক সময়টা দেখে নিল। ওদিকে টেলিফোনকারী কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তার প্রথম কয়েকটা শব্দ শুনেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কর্নেলের। দেখতে দেখতে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। কলটা মাত্র দশ সেকেন্ড স্থায়ী হল, এইটুকু সময়ের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানান রঙের খেলা দেখা গেল গরস্কির চেহারায়।

লাইন কেটে যাওয়ার পর অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে যেতেও হুঁশ হল না। রিসিভার নামিয়ে রাখার কথা ভুলে হাঁ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকল কর্নেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আচমকা যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হল সে। রিসিভার ছুঁড়ে ফেলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আরেক টেলিফোনের রিসিভার তুলল কর্নেল, ততক্ষণে টকটকে লাল হয়ে গেছে মুখটা। ও প্রান্তের সাড়া পেতেই কথার তুবড়ি ছোটাল সে, ধমকের সুরে নির্দেশ দিতে লাগল এক্সচেঞ্জের কম্পিউটর সেকশনকে।

পাঁচ মিনিট পর তরুণ এক লেইটেনেন্ট এসে ঢুকল হন্তদন্ত হয়ে। হাতে একটা প্রিন্ট আউট এবং একটা মিনি টেপ রেকর্ডার। গরস্কির দিকে এমন ভাবে তাকাল ছোকরা, যেন হিংস্র বাঘ সে। ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে যে-কোন মুহূর্তে। কর্নেলের চোখে চোখ রেখে পা টিপে টিপে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কথা বলতে সাহস হল না। মুখ নিচু করে কিছু একটা ভাবছেন হয়ত কর্নেল, ছেদ পড়লে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

'এনেছ?' এক সময় মুখ তুলল গরস্কি।

'জ্বি।' প্রিন্ট আউটটা বাড়িয়ে দিল সে।

'ওটা থাক। টেপটা বাজাও, শুনি। পরিষ্কার উঠেছে তো সব কথা?'

'জ্বি, কমরেড পলকভনিক।'

'কোত্থেকে এসেছিল কলটা?'

'লাইপজিগ, কমরেড।'

'নম্বরটা ট্রেস করা গেছে?'

'জ্বি। ওটা একটা পাবলিক ফোন বুদ।' কাগজটা দোলাল সে।

'থাক এখন। আগে টেপ বাজাও।'

অজ্ঞাত কণ্ঠধারীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল কর্নেল নতুন করে–বার বার, অনেকবার। ওর সঙ্গে প্রিন্ট আউটের কপি মিলিয়ে দেখল, ঠিকই আছে। তারপর আবার ভাবতে বসে গেল বিষয়টি নিয়ে।

বন্ধ দরজার ওপাশে কয়েকজোড়া পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যস্ত পায়ে এদিকেই আসছে। খুলে গেল দরজা দড়াম করে। মাথা টেবিলের ওপর রেখে শুয়েই থাকল মাসুদ রানা। কারা এল, দেখার ইচ্ছে থাকলেও ঘাড় ঘোরাবার

কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হল না অবসাদগ্রস্ত পেশীগুলো।

'এই যে।' একটা কর্কশ হাত থাবড়া বসাল রানার উন্মুক্ত কাঁধে। 'উঠে বসুন। সোজা হয়ে বসুন।'

উঠল না মাসুদ রানা। একচুল নড়লও না। আরেকবার ছুঁয়ে দেখ আমাকে, হারামজাদা, ভাবল ও। তোর বারোটা যদি না বাজিয়েছি তো···। বেশি কিছু করতে হবে না, থাইরয়েডে সঠিক ওজনের একটা হাফ-ফিস্ট। ব্যস, আর দেখতে হবে না। যমের বাড়ির লম্বা পথ কয়েক সেকেন্ডে পাড়ি দেবে শালা। মাত্র দশমিক পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার, কেউ রক্ষা করতে পারবে না মৃত্যুর হাত থেকে।

খবরদার! অমন কাজ ভুলেও কোরো না। আবেগ বড্ড বিপজ্জনক। ওর কবল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকে এখান থেকে বেরোতে হবে, যে করেই হোক। মনে রেখো, তোমার সঙ্গে তোমার দেশের মান ইজ্জতের প্রশ্নও জড়িত। তোমাকে যদি এরা মুখ খুলতে বাধ্য করে, ওসবের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মুখ দেখানোই অসম্ভব হয়ে পড়বে, সারা পৃথিবী ধিক্কার দেবে তোমাদের। কাজেই মাথা ঠাণ্ডা রাখো, কি ভাবে নিজেকে উদ্ধার করা যায়, তাই ভাবো। পেশী নয়, বুদ্ধি খাটাও। জানো না, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়?

'আমাদের সাথে যেতে হবে আপনাকে। চলুন,' বলল আরেকজন।

'কোথায়?' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল রানার গলা দিয়ে।

'গেলেই দেখবেন।'

ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ওভারকোট ছাড়া আর সব পরে ফেলল ধীরেসুস্থে। সবুজ রঙ করা করিডর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওকে দুই সার্জেন্ট। অনেক লম্বা করিডরটা। এক মাথা থেকে একেবারে অন্য মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। এই হাঁটাটুকু বেশ কাজে দিল, শরীরের আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেল রানার অনেকটা।

সামনেই একটি বন্ধ দরজা। ওর পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দরজায় চাপ দিল এক সার্জেন্ট। ভেড়ানো ছিল, খুলে গেল। এদিকে মুখ করে ভেতরে বসে আছে কর্নেল আইভান গরস্কি। রাগের ছিটেফোঁটাও নেই চেহারায়। বরং কেমন কৌতূহলী, হাসি হাসি ভাব নিয়ে রানাকে দেখছে। যেন রানা সার্কাসের ভাঁড়, ওর ভাঁড়ামি উপভোগ করছে সে।

মুখোমুখি দুটো চেয়ারের মাঝখানে একটি টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই এ রূমে। এ নিশ্চয়ই কালকের সেই রূম, ধরে এনে প্রথমে যেখানে জেরা করেছিল ওকে কর্নেল। ভাবল মাসুদ রানা। হয়ত টেবিলটা পাল্টে ফেলা হয়েছে। কারণ সারফেস খাওয়া-খাওয়া নয় এটার।

দুদিক থেকে ধরে ঠেলতে-ঠেলতে কর্নেলের মুখোমুখি নিয়ে এসে বসিয়ে দিল ওকে দুই সার্জেন্ট। রানার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই ধমকের সুরে তাদের কিছু বলল গরস্কি। সসম্ভ্রমে মাথা দোলাল লোক দুটো, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রূম ছেড়ে। পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ উঠতেই চেয়ার ছাড়ল ও।

'কি ব্যাপার, চেয়ার পছন্দ হয়নি?' প্রশ্ন করল গরস্কি।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে ততক্ষণে মাসুদ রানা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেশীর জড়তা দূর করতে হবে। 'খানিকটা এক্সারসাইজ দরকার।'

'নিশ্চই, নিশ্চই,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল গরস্কি। সেই সঙ্গে যোগ করল, 'আপনার এ অবস্থার জন্যে কিন্তু আপনিই দায়ী। আমাকে সহযোগিতা করলে,' দুহাতের তালু চিত করে কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'আপনার উপযুক্ত আতিথেয়তার আয়োজন করতাম আমি।'

রানা কিছু বলে কি না শোনার জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল গরস্কি। কিন্তু কিছু শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। ও ওর নিজের কাজে ব্যস্ত। গরস্কি হয়ত আশা করছে নতুন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে রানা এবার সহযোগিতা করবে তাকে। না করলে অবশ্যই আরও কঠিন নির্যাতনের ব্যবস্থা করা হবে, সন্দেহ নেই। সেটা কি হতে পারে ভাবছে, মাসুদ রানা। সেই সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করছে মানসিকভাবে।

'আমি হয়ত কাল একটু বেশিই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম,' আবার বলল কর্নেল। 'আশা করি কিছু মনে করবেন না। আমরা, রুশরা, বোধহয় একটু নাটকীয়তা পছন্দ করি। সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে ভালবাসি। ব্যাপারটা কখনও কখনও খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি পর্যায়ে চলে যায়। বা আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশিও বলতে পারেন। আমাদের মিউজিক, গ্র্যান্ড অপেরা লক্ষ করলেই বুঝবেন,' বলতে বলতে আসন ছাড়ল গরস্কি। '...কি বোঝাতে চাইছি।' রুমের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পায়চারি শুরু করল সে।

ওদিকে মাসুদ রানাও আরও আগে থেকেই এক জায়গায় দৌড় থামিয়ে পায়চারি করছে। মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে হাঁটছে দুজনে।

'বুঝেছি,' বলল রানা।

'গুড!' বেশ আশ্বস্ত হল যেন আইভান গরস্কি। চওড়া হাসি ফুটল বড়সড় চৌকো মুখটায়। 'ভাল কথা, গালের ক্ষতটা আজ কিরকম? ব্যথা-ট্যথা নেই তো? থাকলে বলুন, ডাক্তার ডাকি।'

'ধন্যবাদ। ব্যথা নেই।'

'বেশ। যা বলছিলাম। রাগের মাথায় আপনার সাথে কাল বেশ দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি, জানি। ব্যাপারটা, মনে করুন রাশান টেম্পারামেন্ট, ঠিক আছে?'

তীর কোনদিক থেকে আসে লক্ষ রেখো, নিজেকে বলল রানা। ব্যাটা বলছে এমন ভাবে যেন আমি রুশ, তুমি নও। লক্ষ রাখো। 'টেবিলটার কাছেও দুঃখ প্রকাশ করা উচিত আপনার, কর্নেল,' হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'ছাল-চামড়া সব উপড়ে ফেলেছেন আপনি বেচারীর।'

রসিকতাটা গায়ে মাখল না গরস্কি। কথার ফাঁকে থেমে পড়েছিল, আবার শুরু করল হাঁটাহাঁটি। দুহাত পিছনে বাঁধা। তার চকচকে পালিশ করা বুটের গোড়ালি এবং পাতা একই সঙ্গে পাথরের মেঝে স্পর্শ করছে। 'পরিবেশটা এ

মুহূর্তে যতটা তরল মনে হচ্ছে আপনার, আসলে কিন্তু ততটা নয়। আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত। ঠিক ততটাই চিন্তিত আমি আমাকে নিয়েও। আপনি যেমন পণ করেছেন মুখ খুলবেন না, আমিও তেমনি পণ করেছি সব কথা শোনা চাই আমার। অর্থাৎ সমস্যাটা আমাদের দুজনেরই।'

এখন একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? ভাবল মাসুদ রানা। দুই লাফে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবে ও লোকটির কাছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতের কিনারা দিয়ে করোটিড নার্ভের ওপর কারাতের একটা কোপ, অথবা মধ্যমা উঁচু রেখে মুঠো পাকিয়ে দড়াম করে থাইরয়েডের ওপর ঝেড়ে বসতে পারলেই···।

'কি বুঝলেন?' নিজের চেয়ারটা কাছে টেনে আনল আইভান গরস্কি। বুটসহ একটা পা তুলে দিল তার ওপর। কোমরে একহাত রেখে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াল। 'অবশ্য···' ডান মধ্যমার নখ দিয়ে বাঁ ভুরুর মাঝখানটা চুলকে নিল, '···সমস্যাটা আজ কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেছে কালকের থেকে। জবর ধাঁধায় ফেলে দিয়েছেন আমাকে, সাহেব। জানতাম দুয়ে দুয়ে চার হয় সব সময়। কিন্তু আপনার বেলায় কিছুতেই মিলছে না সহজ হিসেবটা, কেবলই আণ্ডা হয়।' দুহাত শূন্যে ঘুরিয়ে বড় একটা ডিমের আকৃতি করে দেখাল কর্নেল। 'আপনার সাহায্য ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না, সিনসিয়ারলি টেলিং। যে জন্যে আরেকবার এলাম। আমার বিশ্বাস এবার আপনার সহযোগিতা পাবই।'

চালিয়ে যাও, মনে মনে বলল মাসুদ রানা, থামলে কেন? ইন্টারোগেশনের এ এক ক্লাসিক টেকনিক—এই নরম, এই গরম। চলতে থাকে কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাল কাজ দেয় কৌশলটা।

'তাহলে আমাদের উভয়েরই ভাল হবে,' বলে চলল গরস্কি, 'একটি সম্মানজনক মীমাংসায় পৌঁছতে পারব আমরা অনায়াসেই।'

'মীমাংসা!' অন্য চেয়ারটা উল্টো করে বসল মাসুদ রানা দুদিকে পা দিয়ে। হাত দুটো রাখল কাঁধ সমান উঁচু খাড়া পিঠের কিনারায়।

'হ্যাঁ। আপনার ব্যাপারে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'কিসের সিদ্ধান্ত?' একটু অবাক হল রানা। লোকটিকে বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে। তাছাড়া এসব কথা ক্লাসিক টেকনিকের পর্যায়ে পড়ে না।

'আপনাকে মুক্তি দেব আমি।' অমায়িক হাসি ফুটল পলকভনিকের চৌকো মুখে। চোখ দুটোও হেসে উঠল সেই সঙ্গে।

তীর নয়, কামানের গোলা আসছে বোধহয়। 'মানে?' সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন করল ও।

'ঠিকই শুনেছেন। আপনাকে মুক্তি দেব আমি। এ আমার একার সিদ্ধান্ত। মারাত্মক ঝুঁকি আছে এতে স্বীকার করেন নিশ্চই? বড় কর্তাদের কাউকে এখনও জানাইনি আপনাকে আটক করার কথা। তবে তার আগে একটা শর্ত পালন করতে হবে আপনাকে। কঠিন কিছু নয়, অনেস্টলি স্পিকিং। ইচ্ছে করলেই তা পূরণ করতে পারেন আপনি এবং সসম্মানে মুক্তি পেতে পারেন। যদি···'

কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে মানুষটির মধ্যে, এই প্রথমবার লক্ষ করল রানা। অপলক চেয়ে চেয়ে দেখছে ও লোকটিকে। অনুমান করার চেষ্টা করছে, সেটা কি। সারাক্ষণ হাসছে গরস্কি। কথা বলছে নাটকীয় অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে। ভেতরে ভেতরে বেশ উল্লসিত, সন্দেহ নেই। রানা কথা বলবে না ধরেই নিয়েছে সে, তাই নিজেই আবার শুরু করল।

'...আপনার মস্কো আগমনের পিছনে আমার দেশের বিরুদ্ধে কোন হীন চক্রান্ত চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলেই। এবং তার আগে আমার সন্তুষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট একটা সময় এখানেই থাকতে হবে আপনাকে। অবশ্য এভাবে নয়, বন্দী অবস্থায় নয়। আমার সম্মানিত অতিথি হিসেবে। সময়টা অতিক্রান্ত হলেই ছেড়ে দেয়া হবে আপনাকে। প্রমিজ।'

পা নামিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল আইভান গরস্কি। ভুরু নাচাল রানার চোখের দিকে তাকিয়ে। 'কি? আগ্রহ বোধ করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

মুহূর্তে বোধশক্তি হারিয়ে বিকলাঙ্গে পরিণত হল রানা। চোখের সামনে পুরো ঘর, কর্নেল গরস্কি দুলতে শুরু করল ভীষণভাবে। ভূমিকম্প হচ্ছে যেন। চেয়ার শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ও, বসে থাকল চোখ বুজে। ভয় হচ্ছে পড়ে যাবে মাথা ঘুরে।

'অবাক হচ্ছেন কি করে আপনার পরিচয় জানলাম ভেবে? মজা দেখুন, কাল অজ্ঞাত একজনের টেলিফোন পেয়ে ধরে আনা হল আরেক অজ্ঞাতনামাকে। আজ আবার একটু আগে আরেক অজ্ঞাতপরিচয় টেলিফোন করে জানাল আপনার পরিচয়। আপনাকে রীতিমত হিংসে হচ্ছে আমার, সাহেব। দেশে-বিদেশে অনেক শত্রু আপনার। দেখুন না, কেমন ফাঁসিয়ে দিল আপনাকে! এটা কিন্তু স্পাইদের জন্যে গর্বের বিষয়, কি বলেন? সে যাক, এ জন্যেই বলছিলাম আপনার বেলায় দুইয়ে দুইয়ে কেবলই আণ্ডা হয়। হাজার মাথা খাটিয়েও বুঝতে পারছি না আপনি মস্কোয় কেন এ সময়। দুদিন পর মস্কো আসছেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রীয় সফরে। অতীতের যে-কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। এরকম স্পর্শকাতর মুহূর্তে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের স্পাই, আপনি, মস্কোয় কেন। উদ্দেশ্য কি আপনার? আমি বিশ্বাস করতে চাই না মাদার রাশার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করছে বিসিআই। কাজেই আশা করব এ গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে আমাকে সাহায্য করবেন আপনি। যদি অসহযোগিতা করেন, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেব আমি। তার ফলাফল কি হবে বুঝতেই পারছেন। আর...দয়া করে আমার সময় নষ্ট করবেন না আর। আপনার পরিচয় জানার পরও কোন কঠিন পদক্ষেপ নেইনি আমি। কারণ অতীতে বেশ কয়েকবার আমাদের সাহায্য করেছেন আপনি। উপকার করেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কর্তৃপক্ষের অগোচরে আপনার এবারকার মস্কো উপস্থিতি স্বাভাবিক চোখে দেখব আমরা। সব খুলে বলুন, ছেড়ে দেয়া হবে আপনাকে। অবশ্য যদি বুঝি আমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ মতলব নেই বিসিআই-এর। তা-ও এখনই নয়। আপনাদের প্রেসিডেন্টের সফর ভালয় ভালয় শেষ হওয়ার পর ছাড়া হবে

আপনাকে। খুব একটা কঠিন কিছু নয় ব্যাপারটা। আগেই বলেছি, আমি এবং আমার অধস্তনরা ছাড়া ওপরের কেউ জানে না আপনার আটক হওয়ার কথা। জানবেও না। গোপনে ছেড়ে দেয়া হবে আপনাকে। আমি আন্তরিকভাবেই চাই না আরও কঠোর হতে। কারণ পরেরবার হয়ত নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না।'

চেয়ার স্বস্থানে টেনে নিয়ে বসে পড়ল কর্নেল গরস্কি। দুহাত এক করে পেটের ওপর বাঁধল। অপেক্ষা করছে। আশা করছে এবার মুখ খুলবে মাসুদ রানা। এদিকে মহা ধাঁধায় পড়ে গেছে রানা নিজেও। কে টেলিফোন করল? সে কি করে জানল যে ও-ই মাসুদ রানা? আশ্চর্য! আচ্ছা, জামান শেখকে যারা গায়েব করে দিয়েছে, এ লোক কি তাদের কেউ? ব্যাপারটা কি! ওকে সরিয়ে ফেলেছে, রানার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে···কেন?

যত ভাবছে, ততই মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছে রানা। হাতামাথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর জানা মতে দু'চার মাসের মধ্যে বিসিআই-এর মস্কো সেল কারও কোন ক্ষতি করেনি। করলে না হয় বোঝা যেত প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অমুকে করছে এসব। তা-ও তো নয়।

না কি···রাহাত খানের আশঙ্কাটাই সত্যি হতে যাচ্ছে? কেউ অত্যন্ত বাজে কিছু করিয়ে নিতে চাইছে জামানকে দিয়ে। এদিকে তার নিখোঁজ সংবাদ জানাজানি হয়ে পড়ায় রানা এসেছে ওকে খুঁজে বের করতে। এতে পরিকল্পনা বরবাদ হয়ে যেতে পারে তাদের রানার উদ্দেশ্য সফল হলে, সেই ভয়ে ওর পরিচয় ফাঁস করে দেয়া হয়েছে? কাপিস্তা কিরভ তাহলে দলটির কেউ নয়? তাই হবে হয়ত। জানা থাকলে তখনই রানার নাম-ধাম জানিয়ে দিত সে কেজিবি-কে।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করে চেয়ার ছাড়ল কর্নেল গরস্কি। ঘড়ির ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি লাঞ্চে চললাম। আধ ঘণ্টা পর আসব। এরমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন কি করবেন।'

গটমট করে বেরিয়ে গেল কর্নেল। দরজার বাইরেই ছিল দুই সার্জেন্ট, উঁকি দিয়ে ভেতরে নজর বুলিয়ে নিল। অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান সার্জেন্টটি চলে এল ভেতরে। রুমের এক কোণে রানার হাত চার-পাঁচেক তফাতে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়জন রুমে ঢুকল পাঁচ মিনিট পর। হাতে রানার জন্যে এক প্লেট পাঁউরুটি ডিম ইত্যাদি। সঙ্গে এক মগ গরম কফি। প্লেটের দিকে তাকালই না রানা, খাওয়ার রুচি নেই। মগটা কাছে টেনে নিল। অমৃতের মত স্বাদ কফিটার। সার্জেন্ট দুজন ভেতরেই থাকল। পাহারা দিচ্ছে।

মাথার ব্যথায় উন্মাদ হওয়ার দশা মাসুদ রানার। গোটা মাথাটা যেন একটা আগুনে বোমায় পরিণত হয়েছে, বিস্ফোরিত হতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে অবিরল ধারায়। হাত তুলে চোখ মোছার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। চরম ক্লান্তি আর অবসাদ সত্যি সত্যিই পঙ্গু করে দিয়েছে ওকে। আবার জ্ঞান হারাতে পারে রানা যে-কোন মুহূর্তে।

কর্নেল আইভান গরস্কির প্রস্তাবের উত্তরে ভাল-মন্দ, হ্যাঁ-না কিছুই বলেনি রানা। কিছুই না। স্রেফ মুখ বুজে বসেছিল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর যা বোঝার বুঝে নিয়েছে লোকটা, আবার নিয়ে এসেছে ওকে কাল রাতের সেই কক্ষে। এ মুহূর্তে দেয়ালের সঙ্গে চেয়ার ঠেকিয়ে তাতে বসিয়ে রাখা হয়েছে মাসুদ রানাকে। হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে ও। মাথার পিছনটা দেয়ালে ঠেকে আছে। ঘুম ঘুম একটা ভাব রানাকে তলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অতলে।

ফ্লাড বাল্‌বটার ওপাশে বসে আছে কর্নেল, অন্ধকারে। মোটা গলায় গুন্‌গুন্ করে গাইছে, 'স্লোভো ও পোলকু ইগোরেভি।' প্রিন্স ইগরকে নিয়ে লেখা একটি রুশ দেশাত্মবোধক গান। রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে সে। ভাবছে, ইঞ্জেকশনটা খুব কড়া হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে আছে সে। আবার যদি জ্ঞান হারায়, তাহলে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই যেন ধরে ফেলতে পারে। কি করেছে ওরা আমার? ভাবছে রানা, এত দুর্বল লাগছে কেন?

বাল্‌বটা আজ যেন আরও বেশি আলো ছড়াচ্ছে, আরও বেশি উত্তাপ ঢালছে। এক কথায় ভয়ঙ্কর। যেন একটি আগুনের বল, চার কিনারা ঘিরে ধোঁয়ার মত কি যেন আছে। কাঁপছে। ঠিক যেন মাঝদুপুরের সূর্য। সরাসরি চেয়ে আছে রানা ওটার দিকে।

পুরোপুরি সচেতন নয় ও। থেকে থেকে ঝিমুনির একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে—সম্ভবত আলফা ও থিটা স্তরের মধ্যবর্তী কোথাও। দু-চার মিনিট। তারপর আবার উঠে আসছে। চোখ মেলে তাকাচ্ছে। ঘোলাটে বিভ্রান্ত চাউনি। গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে ভয়টা রানার মধ্যেও আছে। তাই দুপা দুদিকে খানিকটা মেলে দিয়ে বসেছে, দুই হাত হাঁটুর ওপর। বগলের ঘাম শিরশির করে গড়িয়ে নেমে আসছে হাত বেয়ে। কনুই পর্যন্ত এসে একটু বিরতি, তারপর আবার রওনা হচ্ছে নিচের দিকে।

এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও, ইঁদুরের অর্ধেকটা পর্যন্ত ঢুকে গেছে সাপের পেটে। পিছনের পা জোড়া ঘন ঘন সামনে পিছনে করছে ইঁদুরটির। কিছু একটা আঁকড়ে ধরে রক্ষা করতে চাইছে নিজেকে। ভেলভেটের মত নরম পশম মোড়া খুদে দেহটা তীব্র আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে থেকে থেকে।

একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল বেচারী, পুরো সেঁধিয়ে গেছে সাপের পেটে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পেটের ভেতরে একটু একটু করে নেমে যাচ্ছে প্রাণীটা। এখন দিন না রাত, জানে না মাসুদ রানা। অবচেতন মনের ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। খুব সম্ভব রাত-ই হবে।

'শুনতে পাচ্ছেন?' ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়ল গরস্কি। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

বহুকষ্টে ঘাড় সোজা করল রানা। কথা বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। স্বর ফুটছে না। এভাবে আর কতক্ষণ টিকতে পারবে ও? মনের জোর বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। অথচ তেমন উল্লেখযোগ্য কোন নির্যাতন করা হয়নি এখনও ওর ওপর। আসলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে, যাতে মূল কাজে হাত দিয়ে ফল পেতে বেশি সময় না লাগে। এবং যখন মুখ খুলবে মাসুদ রানা, নিজেও

জানতে পারবে না কি করছে ও, কি বলছে।

অতএব যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। বেশি সময় পাওয়া যাবে না। আত্মহত্যা করার পথ নেই ভেবে একেবারে হতাশ-ই হয়ে পড়েছিল মাসুদ রানা। এখন আবার নতুন আলোয় উজ্জীবিত হয়েছে ভেতরে ভেতরে। আশা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। পথ আছে! মনে পড়ে গেছে, ওর মত পরিস্থিতির শিকার হয়ে আগেও দুই একজন এ কাজ করেছে। সফলও হয়েছে।

কঠিন কিছু নয়, কনুইয়ের ভেতরদিক দিয়ে কব্জির দিকে নেমে গেছে যে কিউবিটাল আর্টারি, দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে ওটা। তারপর মাত্র ষাট সেকেন্ড–শেষ! মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে মাসুদ রানাকে। তবে এ ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ একা হতে হবে ওকে। কিন্তু গরস্কি ভুলেও চোখ সরাচ্ছে না ওর ওপর থেকে। এমন কি বাথরুমে গেলেও পিছনে একজন লেগে থাকে।

কাজ সারতে হচ্ছে দরজা খোলা রেখেই। পাছে কমোডে নিজের মাথা জোর করে ঢুকিয়ে দেয় মাসুদ রানা। কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে চলবে না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। তাড়াতাড়ি, সময় নেই। পাশের রুম থেকে আতঙ্কিত, টানা চিৎকার ভেসে এল। কে ওটা? চমকে উঠল রানা, আমি না তো?

'শুনতে পাচ্ছেন?' আবার জানতে চাইল গরস্কি। গলাটা এবার বেশ নরম মনে হল।

'হ্যাঁ।' দেয়ালে মাথা রাখল রানা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। পরক্ষণেই কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে।

বারো

এখানেই তাহলে মৃত্যু লিখে রেখেছে নিয়তি।

অথচ মাস তিনেক আগেই ব্যাপারটা ঘটতে পারত, যখন তিউনিসের হোটেল আফ্রিকার সামনে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গিয়েছিল রানার গাড়ি। রক্তমাংসের একটা পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল ও। অথবা গত বছর হংকং উপকূলে, অক্ষাংশ একশো চোদ্দ ডিগ্রি, দ্রাঘিমাংশ বাইশ ডিগ্রির দশ ফ্যাদম গভীর পানিতে, প্রচণ্ড ঝড়ে ইয়টডুবীর সময়। মরেই তো গিয়েছিল রানা। তারপরও বেঁচে গিয়েছিল অলৌকিকভাবে। আরও অসংখ্যবার ঘটেছে একই ঘটনা, মরতে মরতেও বেঁচে ওঠা।

বোঝা যাচ্ছে আজকের এই সময়টিরই প্রতীক্ষায় ছিল নিয়তি। এখানে, এই তুষার ঝরা মস্কোর লুবিয়াঙ্কায়, সবুজ রঙ করা বারো গুণ চোদ্দ এক কানাকক্ষে ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা। সামনে বসে আছে গরস্কি, রানার আজরাইল।

চিন্তার মোড় ঘুরে গেল রানার। কেন, উল্টে ও আজরাইল হতে পারে না ব্যাটার? নিজের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল ও। স্বচ্ছন্দে! কে নিষেধ করেছে তোমাকে? এর আগে অসংখ্য সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছে নিয়তি, আরেকবার হারালে কিসসু আসবে যাবে না। আর···যদি নিয়তিকে প্রতিহত করতে একান্তই ব্যর্থ হয় রানা, তাহলে···বন্ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। পড়েই যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল চেয়ার আঁকড়ে ধরে।

না, আমি মরব না, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। আমাকে বাঁচতে হবে। যে করেই হোক, বাঁচতেই হবে। পালাতে হবে এই মৃত্যুফাঁদ থেকে। দরজাটা কোনদিকে যেন?

চোখ মেলল রানা।

অসহ্য আলো! ঝপ করে নেমে গেল চোখের পাতা।

রুমের ও-মাথায় সিলিং ছোঁয়া অন্ধকার গরাদটার ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে আইভান গরস্কি। ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। মধুরঙা চোখ দুটো আরও লাল দেখাচ্ছে, আরও খানিকটা গর্তে বসে গেছে। কিন্তু চেহারায় সামান্যতম ক্লান্তির ছাপ নেই। শক্তিশালী হাত দুটো ঝুলছে দেহের দুপাশে।

বাঁ চোখ এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ফাঁক করল রানা। প্রথমেই দেখে নিল সার্জেন্ট দুজন আছে কি না। না, নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাসটা মনে মনে ত্যাগ করল রানা। এইবার! পারবে তো ও? নাকি অনর্থক নতুন ঝামেলা বাধিয়ে বসবে? মাথা ঝাড়া দিল রানা। কি ওষুধ পুশ করেছে ব্যাটা কে জানে। বারবার ফিরে ফিরে আসছে ঝিমুনি ভাবটা। সোজা পথে এগোচ্ছে না ভাবনা-চিন্তা।

'আর সময় দিতে পারছি না, মিস্টার রানা।' খুদে কক্ষটা গম গম করে উঠল গরস্কি কথা বলে উঠতে। ওই এক বাক্যেই যেন অনেক কিছু বোঝাতে চাইল সে। আওয়াজটা ছুটে এসে আঘাত করল ওর মস্তিষ্কে। আঘাতটা ঠিক যেন হাতুড়ির ঘা। এ ধরনের আক্রমণের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রানা। থর থর কর কেঁপে উঠল আপাদমস্তক। অভাবিত এক অভিজ্ঞতা। মিনিট পনেরো আগে পুশ করা সর্বশেষ ইঞ্জেকশনটির প্রতিক্রিয়া, ভাবল রানা।

গরস্কিও লক্ষ করল ব্যাপারটা। বেশ সন্তুষ্ট মনে হল তাকে, যেন এ ধরনের কিছুই আশা করছিল সে। মাথা তোলার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বেশি তুলতে পারল না। কেন শুধু শুধু কষ্ট করছ? ঘুমিয়ে পড়ো। লম্বা একটা ঘুম দাও···।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ঘর ফাটিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল গরস্কি বাঘের মত। আওয়াজটা উঠে এল তার বুকের গভীর থেকে। আবার কেঁপে উঠল রানা। চোখ-মুখ বিকৃত করে দুহাতে কান চেপে ধরে বসে থাকল। জলদি, জলদি ঠিক করো কি করবে। এভাবে আর দুচার মিনিটের বেশি টিকতে পারবে না তুমি। অতএব সময় থাকতে সেরে ফেলো কাজটা। প্রতি মুহূর্তে

একটু একটু করে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে তোমার। এরপর কিছুই হবে না তোমাকে দিয়ে।

মনস্থির করে ফেলল মাসুদ রানা। প্রথম আঘাতেই অচল করে দিতে হবে কর্নেলকে, এর কোন বিকল্প নেই। আঘাতটা হতে হবে চরম। ভাবছে, সেই সঙ্গে বুঝতেও পারছে রানা, শরীরের যে অবস্থা তাতে এ কাজ কোনদিনই সম্ভব হবে না ওকে দিয়ে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে এ-ও জানে, প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি থাকলে দৈহিক শক্তির ঘাটতি কোন বাধা নয়। জানোই যখন, বসে আছ কেন?

অনেকক্ষণ থেকেই কি যেন একটা ছবি ভাসছে রানার মনের পর্দায়। কখনও মনে হয়, যেন পাখির পালক, ধপধপে সাদা। কখনও লাগে কাশবনের মত, মৃদু মাথা দোলাচ্ছে কাশের ডগা। হঠাৎ করেই স্পষ্ট হল ছবিটা। একজোড়া কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে আছে বিরক্তিতে। ওর নিচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ, নীরবে কি যেন বলছে রানাকে।

জাদুর মত কাজ করল ছবিটা। চিন্তাশক্তি ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে এল মাসুদ রানার। হাত নামিয়ে খাড়া হয়ে বসল ও। কিন্তু মুখ তুলল না। মনে মনে জপ করছে, কাছে আয়, হারামজাদা! হাতের নাগালে আয়!

'আমার বন্ধুত্বের প্রসারিত হাত প্রত্যাখ্যান করেছেন আপনি বারবার, মিস্টার মাসুদ রানা। মূল্য দেননি আমার শুভেচ্ছার, অতএব আপনার ব্যাপারেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি আমি পুরোপুরি। আপনি বাঁচলেন কি মরলেন তাতে এখন কিচ্ছু এসে যায় না আমার।'

দু পা এগিয়ে এল আইভান গরস্কি। 'সার্বস্কি ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি ইন্সটিটিউটের নাম শুনেছেন কখনও আপনি? জানেন কি ধরনের মধ্য-যুগীয় টেকনিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেখানে? উঁম?' পায়ে পায়ে রানার তিন ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল সে। একেবারে নাগালের মধ্যে, অথচ ওর মনে হল সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার রয়েছে লোকটা।

হঠাৎ করেই তাল হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। রাজ্যের ঘুম এসে ভর করেছে দু চোখের পাতায়। চেষ্টা করেও চোখ খোলা রাখতে পারছে না। মিনিট দুয়েক ঝিম মেরে বসে থাকল রানা। তারপর আচমকা অনুভূতিটা ছেড়ে গেল ওকে। বদলে ভীষণ জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেল খুলির পিছনদিকের চামড়ায়। মনে হয় জায়গাটায় কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ এইমাত্র।

ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিয়েছে ওদিকে পলকভনিক। মার্চের ভঙ্গিতে পা ফেলছে সে পাথুরে মেঝেতে, প্রতিটি পদশব্দ ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে রানাকে। 'অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। কর্নেল গরস্কি কি চীজ হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়ব।'

'উফ্!' অস্ফুটে কাতরে উঠল রানা। দু হাতে খামচে ধরল মাথার পিছনটা।

আওয়াজটা কানে যেতে থেমে দাঁড়াল কর্নেল। ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

কয়েক মুহূর্ত রানার ছটফটানি দেখল চোখ কুঁচকে। 'এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে মুখ খুলতে পারেন।' এখনও হাল ছাড়তে পারছে না সে।

দেহ কুঁকড়ে ছোট করে আনল রানা, যেন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, সহ্য করার চেষ্টা করছে। আসলে কর্নেলকে কাছে পেতে চাইছে ও আরেকবার। দেখে যতটা কষ্ট পাচ্ছে বলে মনে হয়, তার বারো আনাই মিথ্যে। অভিনয় করছে রানা। লোকটা নাগালের মধ্যে এলেই····প্রথমেই শাঙ্কুটসু চালাতে হবে, ঠিক করে ফেলেছে মাসুদ রানা। পলকে বাঁ পা ঘুরিয়ে কর্নেলের ডান পায়ের পিছনে বাধাতে হবে। পরমুহূর্তে ডান হাতের চার আঙুলের প্রথম গাঁট ভাঁজ করে গায়ের জোরে গুঁতো মারতে হবে তার কিডনিতে। একই সঙ্গে বাঁ হাতের কিনারা কোনাকুনিভাবে উঠে যাবে খাকি শার্টের কলারের আধ ইঞ্চি ওপরে, কণ্ঠনালী সই করে।

সত্যি সত্যি দু পা এগিয়ে এল গরস্কি। যদিও এখনও নাগালের বাইরেই আছে। সামান্য ঝুঁকে রানার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। চোখ উল্টে যাচ্ছে ওর, দুলছে দেহটা···পড়ে যেতে পারে। পড়ে যাচ্ছে···।

এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল গরস্কি, দু হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরতে গেল। ঝট্ করে পা বাড়াল মাসুদ রানা, পেঁচিয়ে ধরল কর্নেলের ডান পা, যেন সরে যেতে না পারে। পরবর্তী সেকেণ্ডের দশ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে চরম বিস্ময় বাসা বাঁধতে দেখল ও লোকটির বিস্ফারিত দু চোখে। লাফিয়ে সরে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। সর্বশক্তি দিয়ে মেরে বসল রানা গরস্কির কিডনি বরাবর।

যতটা জোরে হবে বলে ভেবেছিল ও তার অর্ধেকও ছিল না মারটায়। কিন্তু তাতেই কুঁকড়ে গেল কর্নেল। 'ঘোঁক্' করে বিকট আওয়াজ বেরিয়ে এল বুক চিরে। তার দেহটা কুঁকড়ে যাওয়ায় পরের মারটা জায়গামত লাগল না, কর্নেলের কনুইয়ের ওপরে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেল। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। আবার ডান হাত চালাল কর্নেলের নাক মুখ সই করে। কিন্তু ততক্ষণে গুলি খাওয়া বাঘের মত শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে লোকটা। প্রচণ্ড রাগে চেহারাটাও বাঘের মত হয়েছে দেখতে। পুরো এক সেকেন্ড সময়ও লাগল না এত কিছু ঘটে যেতে।

ডান পা মাটিতে দিয়ে পড়ল গরস্কি, পড়েই অনেকটা স্প্রিঙের মত ফের উঠে গেল শূন্যে। ভারী বুটসহ বাঁ পা তলোয়ারের আপার স্ট্রোকের মত উঠে আসছে রানার থুতনি লক্ষ্য করে। ঝাঁকি মেরে মাথা সরিয়ে নিল ও সময়মত, ব্যর্থ করে দিল কর্নেলকে। মারটা মিস হয়ে যেতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল গরস্কি, দেহটা নেমে যাচ্ছে মাটিতে। দু পা দুদিকে ছড়ানো।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে। পাল্টা আপার স্ট্রোক চালাল ও, হাত মুঠো করে দড়াম করে মেরে বসল কর্নেলের দুই পায়ের ফাঁকে। চার হাত-পা ছড়িয়ে পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল গরস্কি, কেঁপে উঠল পুরো ঘর। একই সঙ্গে পিছনে ঝটাং করে খুলে গেল বন্ধ দরজা। ছুটে এসেছে দুই সার্জেন্ট। পিছন থেকে একজন ভয়ঙ্কর এক রদ্দা মেরে বসল রানার ঘাড়ে। পর মুহূর্তে

মেরুদণ্ডের ওপর ওজনদার এক লাথি খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা। জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল মাসুদ রানা। চামড়ার নয়, মনের চোখ। সারাদেহে প্রতিটি হাড়ের সংযোগে অসহ্য ব্যথা। সামান্যতম নড়াচড়া করতে গেলেও ভেতর থেকে গোঙানি উঠে আসছে বুক চিরে। অনুভব করতে পারছে রানা, চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। আগের মতই মুক্ত, তবে দু হাতে মাথাটা ধরে রেখেছে কেউ। সম্ভবত যেন পড়ে না যায়, সেই জন্যে।

এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে ওর নাকে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা খেয়ে। চোখের পাতার ওপর ফ্লাড বাল্বের কড়া আলো টের পাচ্ছে ও, তাই চোখ খুলতে সাহস হল না। ওর চারদিকে কয়েকটি কণ্ঠ কথা বলছে নিচু কণ্ঠে। একটু পর আস্তে আস্তে মাথা ধরে থাকা হাত দুটো সরে গেল।

হাজার চেষ্টা করেও মাথা সোজা রাখতে পারল না রানা। একটু একটু করে নামতে নামতে বুকের সঙ্গে ঠেকল থুতনি একসময়। দু পাশ থেকে ধরে চেয়ারসমেত ওপরে তোলা হল রানাকে, খানিকটা সরিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসানো হল আবার। মোটামুটি বুঝতে পারছে রানা কি ঘটছে। কিন্তু চোখ খুলে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। ওই অবস্থাতেই কষ্টেসৃষ্টে মাথার পিছনটা দেয়ালে ঠেকাল ও। এতেই নিঃশেষ হয়ে গেল শক্তি, হাঁপাতে লাগল শব্দ করে।

একটু একটু করে রেগে উঠতে আরম্ভ করেছে রানা। রাগটা ওর নিজের ওপরেই। চরম বোকামি করেছে ও কর্নেলের গায়ে হাত তুলে। এবার নিশ্চয়ই সে ভুলের মাশুল আদায় করে নেবে লোকটা। কাজটা পুরো করতে পারলেও না হয় বুঝ দেয়া যেত মনকে। হঠাৎ শরীরের ব্যথা সম্পর্কে সচেতন হল রানা। এত ব্যথা করছে কেন? আগে তো ছিল না!

পরক্ষণেই বুঝল ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই অজ্ঞান থাকা অবস্থায় মনের সুখে পেটানো হয়েছে ওকে। এ ঠিক গরস্কির কাজ—ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিয়েছে লোকটা। চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করল রানা। কয়েক হাত দূরে টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে হাঁপাচ্ছে কর্নেল। চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। ঘামে ভিজে আছে সারামুখ। এক সার্জেন্ট তার পাশেই দাঁড়িয়ে, হতভম্বের মত চেয়ে আছে রানার দিকে।

তার মানে! সবিস্ময়ে ভাবল মাসুদ রানা, এখনও ধাতস্থ হতে পারেনি লোকটা? না কি···কতক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল ও? দেখে তো মনে হচ্ছে দুই-এক মিনিট, বড়জোর। তাহলে গায়ে ব্যথা কিসের? নাকি আবার কোন ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে?

'আমি ঠিক আছি।' পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্ট সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়েছিল কর্নেল নড়ে উঠতে। হাতটা সরিয়ে দিল গরস্কি। 'তেমন কিছু হয়নি।' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল সে। তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল। চেহারায় রাগ বিদ্বেষ কিছুই নেই।

রানার দিকে একবারও তাকাল না সে। যেন এ ঘরে নেই ও। যেন একটু

আগে তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়নি রানা। বেরিয়ে গেল কর্নেল ঘর ছেড়ে। নিশ্চয়ই আত্মসম্মানে লেগেছে বন্দীর হাতে অপদস্থ হয়ে। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয় এ প্রস্থান, একটু পরই হয়ত ফিরে আসবে সে। তারপর কি ঘটবে সেটাই চিন্তার বিষয়।

চোখ বুজে বসে থাকল ও। আলোর উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে যেন। আধঘণ্টা পর ফিরে এল কর্নেল। হাত ইশারায় সার্জেন্ট দুজনকে বিদেয় করে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। সতর্ক চোখে রানাকে মাপছে, আর কোন বদ মতলব আছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে হয়ত।

'ঘুরে বসতে পারি?' প্রশ্ন করল রানা।

'কি?'

'ঘুরে বসতে চাই,' ইশারায় আলোটা দেখাল কর্নেলকে। 'চোখে লাগছে খুব।' অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না ও। কথা শেষ করেই চেয়ার ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসল। কিন্তু লোকটা কিছু বলল না। বেশ অবাক-ই হল রানা। এবার শুরু করে দেয়া যেতে পারে, ভাবল ও। কর্নেল ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কি করছে বুঝতে পারবে না পিছন থেকে।

মৃত্যুই এখন একমাত্র বাঁচার উপায়। যদি সার্বস্কি ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি ইন্সটিটিউটে নিয়ে ঢোকান হয়, তাহলে এ রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। ওখানে খাতির করে চেয়ারে বসিয়ে খোশ-গল্প করা হয় না বন্দীর সঙ্গে। হাত-পা মুক্ত থাকার তো প্রশ্নই আসে না।

অতএব এখানেই তোমার কর্মময় জীবনের ইতি টানো, মাসুদ রানা, নিজেকে শোনাল ও। দাঁতে টেনে ছিঁড়ে ফেলো কিউবিটাল আর্টারি। নইলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জোর করে মুখ খোলাবে ওরা তোমার। গোপন থাকবে না কিছু, পেটের সব কথা বের করে নেয়া হবে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না তোমার দেশ। একজন মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব। তার পুরোটা না হোক, কিছুটা তো করেছ তুমি।

পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার না করে তোমার উপায় নেই। এ অবস্থায় আর কি-ই বা করার আছে নিজের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা ছাড়া? মন খারাপ কোরো না, তোমার এ ব্যর্থতা আসলে ব্যর্থতা নয়। বরং সফলতা। এক ধরনের। কারণ একটা কাজ অন্তত করতে পেরেছ তুমি, শেষ পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছ।

চেয়ারের ওপর দু পা তুলে গুটিসুটি মেরে বসল রানা। হাত দুটো তুলে অনেকটা নিজেকেই আলিঙ্গন করল। ডান হাত থাকল বাঁ কাঁধে, বাঁ হাত ডান কাঁধে। যেন শীত ঠেকানর চেষ্টা করছে। মাথা ঝুঁকে যাচ্ছে বুকের দিকে। মনে হল ঘুমিয়ে পড়ছে। ডান হাতের কবজি একটু একটু করে মুখের সামনে নিয়ে এল রানা কাঁধের পেশী একটিও না নড়িয়ে।

এই সময় আরেক বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হল মাসুদ রানা। রগ ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে হড় হড় করে বেরোতে শুরু করবে রক্ত। কম নয়, প্রায় দেড় গ্যালন। অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তে ভেসে যাবে ফ্লোর, বুঝে ফেলবে গরস্কি কি

ঘটছে। তারপর কি হবে? যা হওয়ার তাই হবে। রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে সে যে ভাবে হোক। প্রয়োজনে নতুন করে রক্ত ঢোকাবে ওর দেহে। রানাকে মরতেও দেবে না গরস্কি, তার কাছে ওর প্রয়োজন অপরিসীম।

মাথার পিছনদিক, পিঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। দেয়ালে নিজের ছায়াটা স্পষ্ট। এক ইঞ্চি সামনে এগোচ্ছে, আবার এক ইঞ্চি পিছিয়ে যাচ্ছে-দুলছে রানার দেহ। আমি কি জেগে আছি? সন্দেহ জাগল রানার। নির্দিষ্ট একটা ছন্দে দুলছে ও, চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না দোলটা।

রূমের বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। এর পরপরই কয়েকটি কণ্ঠস্বর। ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে কারা যেন। তাকিয়ে দেখার আগ্রহ জাগল না, বরং এ মুহূর্তে ওর সবচেয়ে বড় সঙ্গী ছায়াটার দিকে চেয়ে থাকল রানা। ওটা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই যেন। ওর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব-ই যেন ওই ছায়া। ওর পরিচয়···।

'আউট!' কানের কাছে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

কেঁপে উঠল রানা।

'স্ট্যান্ড আপ্! আউট!' হাত ধরে হ্যাঁচকা এক টানে চেয়ারসহ মেঝেতে আছড়ে ফেলল কেউ ওকে। সামলে ওঠার আগেই একজোড়া হাত দুই বাহু ধরে তুলে ফেলল, দাঁড় করিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়াল রানা। গরস্কি বসে আছে আগের জায়গায়। সদ্য আসা তিন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে রানাকে ঘিরে। একজন মেজর, দুজন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনদের একজনকে পরিচিত মনে হল। এই লোকই কাল ধরে এনেছিল ওকে।

নাক কুঁচকে ঘর্মাক্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল মেজর। 'পাঁঠার গন্ধ বেরোচ্ছে শালার গা থেকে,' বলে উঠল সে। 'নিয়ে যাও, শেষ গোসলটা করিয়ে আনো। থাকলে নতুন এক সেট পোশাক পরিয়ে নিয়ো। দেরি কোরো না। কুইক!' ঘুরে দাঁড়াল সে, কর্নেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে।

'কামন! ইউ বাস্টার্ড!'

দুদিক থেকে রানার কলার চেপে ধরল দুই ক্যাপ্টেন। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল বাইরে। করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় প্রিজনারস' ল্যাভেটরি। দরজাবিহীন একসার বাথরুম, শাওয়ার আছে প্রতিটিতে। সার্জেন্ট দুজনও এল ওদের সঙ্গে। রানার পরনের কাপড় চোপড় প্রায় ছিঁড়েই নামানো হল গা থেকে। ধাক্কা মেরে একটা বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল এক সার্জেন্ট, অন্যজন খুলে দিল শাওয়ার।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল রানার। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। বন্দীদের জন্যে গরম পানির ব্যবস্থা রাখেনি এরা। পানি তো নয় যেন ধারালো কাঁচের লক্ষ লক্ষ টুকরো, শিউরে শিউরে উঠছে রানা। পাঁজরে ভয়ঙ্কর এক খোঁচা দিয়ে সামনের দেয়ালের তাকে রাখা একটা সাবানের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুখচেনা ক্যাপ্টেন—ওটা ব্যবহার করতে বলছে।

নির্দেশটা পালন করল ও নীরবে। গোসল শেষে এক সেট নতুন শার্ট-

প্যান্ট এবং মোটা একটা পুল ওভার পরতে দেয়া হল। নিজেকে বেশ খানিকটা হালকা লাগছে রানার এখন, তরতাজা লাগছে। পানির স্পর্শে ভেতরে জমে থাকা উত্তাপ বেরিয়ে গেছে। কোন ব্যথাও টের পাচ্ছে না।

এবার অন্য এক সেলে আনা হল রানাকে। এটা আরও ছোট। জানালা নেই। দেয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা পাথরের বেঞ্চ আছে কেবল ভেতরে, আর কিছুই নেই। ভেতরের আবহাওয়ায় রক্তের গন্ধ পেল মাসুদ রানা। নাক কুঁচকে উঠল আপনাআপনি। বেঞ্চের সঙ্গেই দেয়ালের গায়ে রক্তের দাগ, শুকিয়ে আছে।

'সিট ডাউন!'

বেঞ্চের এক কোণে বসে পড়ল রানা। কারও দিকে না তাকিয়ে হাতের ভেজা তোয়ালেটা দিয়ে ডলে ডলে মাথা মুছতে লাগল। আগের থেকে এখন অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে ওর নিজেকে। আবোল-তাবোল চিন্তা ভাবনা দূর হয়ে গেছে। নিজেকে ফিরে পেয়েছে যেন রানা আবার।

মাথা মোছা শেষ করে এদিক-ওদিক তাকাল ও। অফিসাররা দুজন চলে গেছে। দরজা খোলা। বাইরে অপেক্ষা করছে দুই সার্জেন্ট। চোখ তাদের রানার ওপর। পুরো সেলের ওপর দিয়ে ঘুরে এল রানার নজর। মনে মনে হাসল ও। এটাও ইন্টারোগেশনের আরেক জটিল টেকনিক।

এখানে এনে পরোক্ষে ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে গরস্কি যে এটাই তোমার উপযুক্ত স্থান, আগেরটা নয়। এর ফলে বেশিরভাগ বন্দী-ই অপমানিত বোধ করে, হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে। কাঁধ ঝাঁকাল রানা আপনমনে। মনে মনে বলল, কিছুই এসে যায় না। উঠল ও। খুদে সেলের এ মাথা ও মাথা পায়চারি শুরু করল। সাত কদম সামনে, সাত কদম পিছনে। তোয়ালে কাঁধে ঝুলছে। বুকে পিঠে ঠাণ্ডা অনুভব করছে রানা ওটা ভেজা বলে।

সেলটা এমনিতেই স্যাঁতসেঁতে। মাথার ওপরে অল্প শক্তির বাল্‌ব্, লালচে আলো ছড়াচ্ছে। শীত করতে শুরু করল রানার। হাঁটার বেগ আরও দ্রুততর করল ও। মিনিট পাঁচেক পর গরস্কিকে দেখা গেল দোড়গোড়ায়। পিছনে রয়েছে সেই তিন অফিসার। কর্নেলের পরনে খাকি গ্রেট কোট, মাথায় উঁচু চুড়োর ক্যাপ–ফুল ইউনিফর্মড্। রানার আপাদমস্তক নজর বোলাল কর্নেল। 'আসুন আমার সাথে,' বলল সে।

বাইরে এসে করিডরের দুদিকে তাকাল রানা। সিলিঙে জ্বলছে একসার উজ্জ্বল পাইলট ল্যাম্প। নির্দিষ্ট দূরত্বে বসানো ছোট ছোট ভেন্ট দিয়ে বাইরের রাস্তার নিওন আলোর আভাস আসছে ভেতরে। আগের সেলে ফিরিয়ে আনা হল মাসুদ রানাকে। হাত ইশারায় চেয়ারে বসতে বলল কর্নেল। তার পিছনে বুকে হাত বেঁধে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে অন্য তিনজন। নিশ্চল। সবাই অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

এরা সবাই যেন শবযাত্রায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে–মাসুদ রানার শবযাত্রা। গরস্কিকে বেশ হতাশ মনে হচ্ছে। ওর মুখ খোলাতে না পারার, ব্যর্থতার হতাশা। 'লুবিয়াঙ্কার ইতিহাসে ব্যাপারটা রেকর্ড হয়ে থাকল,' বলল

কর্নেল। 'কোন স্পাইকে মুখ খোলাতে কেজিবি কখনোই এত নমনীয় মনোভাব দেখায়নি, যা আমি দেখিয়েছি। কারণ আপনার কাছে আমার দেশ খানিকটা ঋণী ছিল। ছিল। এখন আর নেই। চুকেবুকে গেছে ওসব।'

ক্লাসে বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলে চলল কর্নেল, 'সমঝোতায় আসার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছিলাম আপনাকে, আপনি তা গ্রহণ করেননি। বরং আমার গায়ে হাত তোলার মত চরম দুঃসাহসও দেখিয়েছেন। আপনার অনেক দুঃসাহসের কথা জানা আছে আমার, নতুন আরেকটা দেখালেন আজ। আপনার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষকে শ্রদ্ধা করি আমি। সেই সঙ্গে সময় বিশেষে ভয়ও করি। যেমন এ মুহূর্তে, মূর্তিমান এক ত্রাস, আতঙ্ক আপনি আমার জন্য। ঠিকমত চেষ্টা করলে আর বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা টিকতেন আপনি, তারপর মুখ খুলতেই হত। কিন্তু আর ঝুঁকি নিতে পারছি না। সময় নেই। মাঝে মাত্র দুটো দিন, তারপরই মস্কো আসছেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কাজে ওদিকে ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। তার আগেই আপনার ব্যাপারে একটা সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। যে জন্যে আপনাকে সার্বস্কি ইন্সটিটিউটেই নিয়ে যাব বলে ঠিক করেছি। নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, ওখানে মধ্যযুগীয় কায়দায় অভ্যর্থনা জানানো হবে আপনাকে। মুখ তো খুলবেনই, গানও গাইবেন আপনি তখন,' দু আঙুল তুলে ইংরেজি 'গ'-এর মত করে দেখাল সে। 'মাত্র দুঘণ্টা সময় নেবে ওরা। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত। তবে তার আগে আরেকটা সুযোগ দিতে চাই আমি। শেষ সুযোগ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে ঠিক করতে হবে কি করবেন আপনি। মুখ খুলবেন, না…'

পটমা কমপ্লেক্সের সার্বস্কি ইন্সটিটিউট অভ ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জানা আছে মাসুদ রানার। বিশাল গ্র্যানিট পাথরের ভবন। চার দিকে উঁচু দেয়াল, ভেতরদিকে বাঁকানো কাঁটাতারের বেড়া আছে তার ওপর। হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় ওর মধ্যে দিয়ে। ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটা শুনেছে রানা, তার পঁচিশ ভাগও যদি সত্যি হয়, তাহলে সার্বস্কি ইন্সটিটিউট-ই এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর সেরা।

'রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী'-দের জন্যে স্ট্যালিন আমলে তৈরি হয় এই ইন্সটিটিউট। ওখানে 'নীতিবিচ্যুত' বন্দীদের প্রথমে 'স্পেশাল ডায়াগনোসিস' করা হয়। এর পর 'ট্রিটমেন্ট'। যার মধ্যে একটি 'ক্যানভাস ট্রিটমেন্ট'। বন্দীকে উলঙ্গ করে ভেজা ক্যানভাস দিয়ে মুড়ে বেঁধে ফেলা হয় প্রথমে, তারপর 'কোল্ড স্টোরেজে' তাকে স্থানান্তর করা হয়। 'অন্যায় স্বীকার' করবে কিনা, 'মনস্থির' করার জন্যে।

'সময় শেষ,' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে ঘোষণা করল আইভান গরস্কি। 'কিছু বলার আছে আপনার?'

নেই। মুখ তুলল না মাসুদ রানা। দু হাতের তালু পরীক্ষা করছে মন দিয়ে।

'আঁদ্রোপভ!' দু পা সরে দাঁড়াল কর্নেল। সারি থেকে বেরিয়ে এল মেজর।

চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটে আছে লোকটির। যেন রানা মুখ না খোলায় খুশি হয়েছে।

'গেট আপ!' চেঁচিয়ে বলল আঁদ্রোপভ। হাত বাড়াল রানাকে ধরার জন্যে। কিন্তু সুযোগ হল না, ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিল ও হাতটা। নিজেই উঠে দাঁড়াল।

'চলুন,' শান্ত গলায় বলল রানা কর্নেলের উদ্দেশে। একটা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এরমধ্যে।

করিডর পেরিয়ে লুবিয়াঙ্কার মূল দরজার সামনে একটু থামল পাঁচ জনের দলটা। সশব্দে ভেতরদিকে খুলে গেল বিদ্যুৎচালিত ভারী দরজা। দুইঞ্চি তুষার মোড়া সিঁড়ির ধাপে পা রাখল রানা। চারদিকে তাকাল ও। অনেক বদলে গেছে আবহাওয়া। ওকে যখন ঢোকানো হয় লুবিয়াঙ্কায়, প্রায় শুকনো ছিল তখন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কত বদলে গেছে। খুশি হয়ে উঠল রানা কেন যেন।

সীমানা প্রাচীরের ভেতরে বাইরে বড় গাছগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে মাথায় তুষারের বোঝা নিয়ে। ধপধপে সাদা হয়ে গেছে লুবিয়াঙ্কার ঢালু পাথরের ছাত, প্যারাপেট। চাপা পড়েছে ছইঞ্চি বরফে। রাস্তার নীলচে আলো গায়ে মেখে চক-চক করছে চারদিক। সামনে চার আসনের কালো এক সেলুন দাঁড়িয়ে। কোন আরোহী নেই। নরম তুষার মাড়িয়ে এগোল ওরা গাড়িটার দিকে। কর্নেল সবার আগে। মেজর আঁদ্রোপভ রয়েছে রানার ডানে। বাঁ দিকে এবং পিছনে দুই ক্যাপ্টেন।

পিছনের দরজা খুলে নিজেই উঠে বসল কর্নেল গরস্কি। রানাকে বসানো হল তার পাশে, আসনের মাঝামাঝি জায়গায়। তারপর উঠল মেজর, অপ্রশস্ত আসনে কাঁধ সরু করে গায়ে গায়ে বসল তিনজন। দুই ক্যাপ্টেনের একজন বসল হুইলে। অন্যজনকে হাত ইশারায় সঙ্গে আসতে নিষেধ করল আইভান গরস্কি।

স্টার্ট নিল সেলুন সশব্দে। হিটারের কল্যাণে সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠল ভেতরটা। জোরালো হেডলাইট জোড়া জ্বলে উঠতে মেইন গেটে দাঁড়ানো প্রকাণ্ডদেহী দুই সশস্ত্র গার্ড ঘুরে তাকাল, তাদের তুষারমোড়া হেলমেট ঝিঁকিয়ে উঠল। গেটের ভারী দুই পাল্লা খুলে গেল। বেরিয়ে এল সেলুন লুবিয়াঙ্কা কম্পাউন্ড ছেড়ে। দুলুনির ফলে টায়ারের সঙ্গে ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে তার স্নো চেইন, আওয়াজ উঠছে খটাং খটাং।

খাঁ খাঁ করছে চওড়া দয়েরঝিনস্কি স্কয়ার। যতদূর চোখ যায় কেবল তুষার আর তুষার। একেবারে শূন্য। একটা গাড়ি কি পথচারী কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। আশেপাশের ইমারতগুলোর চুড়োয় ঘুরে বেড়াতে লাগল রানার দৃষ্টি, ঘড়ি খুঁজছে। রাত কটা বাজে কে জানে। দ্রুত বাঁক নিয়ে রেড স্কয়ারে পড়ল সেলুন। এবার স্পাসকি টাওয়ারের ঘড়িটা চোখে পড়ল। কিন্তু পাশ থেকে ওটার একটা দিক কেবল দেখা গেল, ফলে কাঁটাগুলোর অবস্থান বোঝা গেল না। ক্রেমলিনের আলোকিত গম্বুজগুলো পলকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল দালানকোঠার আড়ালে।

তলপেটে দু হাত বেঁধে গম্ভীর মুখে বসে আছে কর্নেল আইভান গরস্কি। নজর আটকে আছে সামনে। এ পর্যন্ত রানার দিকে একবারও তাকায়নি। চোখমুখের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওকে আর পছন্দ করছে না সে। গাড়িতে উঠে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। যেন সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ওর ব্যাপারে।

খুবই স্বাভাবিক, ভাবল মাসুদ রানা। তার স্থানে ও নিজে হলেও এরকম আচরণই করত হয়ত। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে রানার আক্রমণ। নিজের হেডকোয়ার্টারে বিদেশী এক স্পাইয়ের মার খাওয়া কম অপমানজনক নয়। তার ওপর লজ্জা দুই সার্জেন্টের দেখে ফেলা। মনে মনে ফুঁসছে সম্ভবত।

স্বাভাবিকের চাইতে সামান্য জোরেই গাড়ি চালাচ্ছে ক্যাপ্টেন লোকটা। তুষারের গভীরতা খুব সম্ভব বেশি নয়, ভাবল রানা। তাছাড়া প্রতিটি টায়ারেই স্নো-চেইন রয়েছে। অতএব ভয় পাওয়ার তেমন কিছু নেই। আবার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা। সিদ্ধান্তটা কোথায় কার্যকর করা যায়, জায়গা খুঁজছে। নাহ্, বড় রাস্তায় কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। তারচেয়ে বরং আরেকটু দেরি করা যাক। পটমা কমপ্লেক্সের দূরত্ব সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জানে মাসুদ রানা। কম করেও এক ঘণ্টা লাগবে ওখানে পৌঁছুতে। উপযুক্ত স্থান একটা না একটা পাওয়া যাবেই।

নীরবে দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। সেলুনের গতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে চালক। চেইনের ক্রমাগত ঝন্ ঝন্ ঠং ঠং আওয়াজ তুলে ছুটছে গাড়ি। এরমধ্যে মাত্র চারটে ভলগা পাশ কাটিয়েছে ওরা। এ-ও আরেক শুভ লক্ষণ, ভাবল রানা, টহলযান বেশ কম মনে হচ্ছে আজ রাস্তায়। কোন প্রাইভেট গাড়ি বা ট্রামও নেই। তার মানে রাত যথেষ্ট গভীর।

সুযোগটা হঠাৎ করেই এসে গেল। বাঁক নিয়ে একটা সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল সেলুন। অনেকগুলো লাইটপোস্টে আলো নেই এ রাস্তার। বেশ অন্ধকার চারদিক। কেবল সামনেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হেডলাইটের আলোয়।

দুদিকের চাপ থেকে মুক্ত করে নিল রানা হাত দুটো। খানিকটা সামনে ঝুঁকে বসল। কর্নেল বা মেজর, কেউ-ই ব্যাপারটা খেয়াল করল না। এবার দেহের সব শক্তি দিয়ে একসঙ্গে দুই কনুই চালাল রানা পিছনদিকে। দুজনেরই বুকের খাঁচায় ভয়ঙ্কর শক্তিতে আঘাত করল ওপরমুখো মারটা। কতটা লাগল, কার কি হল দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না রানা। ঝট্ করে যতটা সম্ভব পিছিয়ে আনল নিজেকে। তারপর দু পা এক করে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল সামনের আসনের পিছন-দিকে, চালকের পিঠের ঠিক মাঝ বরাবর। আচমকা আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন, স্টিয়ারিঙের সঙ্গে ভীষণ জোরে ঠুকে গেল থুতনি। আর্তনাদ করে উঠল সে, হুইল থেকে দুটো হাতই ছুটে গেল।

ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। মুহূর্তে 'সড়াৎ' করে পিছলে গেল দ্রুতগতি সেলুন তুষারের চাদর-মোড়া ভেজা রাস্তায়, কোন কাজেই এল না স্নো-চেইনের প্রোটেকশন। পলকে শূন্যে উঠে গেল বাঁ দিকের চাকা দুটো, কাত হয়ে

কাণ্ডজ্ঞানহীন দানবের মত ছুটতে লাগল সেলুন। হাত বাড়িয়ে ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর দিয়ে হুইলটা ধরতে গেল রানা, সেই সঙ্গে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল কোমরে ঝোলানো নিজের রিভলভারটা একটানে বের করে নিয়েছে মেজর আঁদ্রোপভ। প্রায় একই মুহূর্তে পিছন থেকে দুহাতে শক্ত করে জাপটে ধরল ওকে গরস্কি। টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনতে চাইছে।

প্রথম সমস্যা মেজর। না তাকিয়েই দ্রুত বাঁ পা চালাল রানা পিছনদিকে, লোকটির দুপায়ের ফাঁক লক্ষ্য করে। আঘাতটা ওর মনমত হলেও কোথায় লাগল বোঝা গেল না। তবে কানের কাছে তার বিকট চিৎকার শুনে মনে হল ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। সেই সঙ্গে ধপ্ করে ফ্লোর ম্যাটের ওপর ভারী কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ পেল রানা।

সেলুন ততক্ষণে আরও কাত হয়ে গেছে, প্রায় উল্টে পড়ার অবস্থা। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সাঁই সাঁই ছুটছে মাতালের মত। এরমধ্যে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে চালক, বিপদ টের পেয়ে একহাতে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে রানার সঙ্গে। হুইলের কাছ থেকে ওর হাত সরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অন্যহাতে থুতনি চেপে ধরে রেখেছে। তার আঙুলের ফাঁক গলে দরদর করে গড়িয়ে নামছে রক্ত, পুরো হাত ভিজে গেছে।

আচমকা রাস্তায় পড়ে থাকা কোন কিছুর ওপর চড়ে বসল কারের সামনের দিকের মাটি ছোঁয়া চাকাটা। লাফ দিল সেলুন, বন্ করে একটা চক্কর খেয়ে আড়াআড়ি হয়ে গেল রাস্তার ওপর, পরমুহূর্তে গতির তোড়ে দ্রুত একটা গড়ান খেয়েই সটান দাঁড়িয়ে গেল চার চাকায়। রাস্তার সঙ্গে সংঘর্ষে তুবড়ে গেল ছাত, সামনের উইন্ডশীল্ডসহ সবগুলো জানালার কাঁচ ঝন ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল। কেবল পিছনের উইন্ডশীল্ডটা অক্ষত থাকল। ছোট-বড় কাঁচের গুঁড়োয় ভরে গেল গাড়ির ভেতর। এক কর্তব্য শেষ হওয়ামাত্র পরবর্তী কর্তব্য পালন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল কারটা, আবার ছুটতে আরম্ভ করল পাগলা ঘোড়ার মত, কোণাকুণি।

ডিগবাজি খেয়ে গতি খানিকটা কমে গেছে। ড্রাইভারের পিঠে লাথি হাঁকার সময় এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল রানা স্পীডোমিটারের ওপর, আশি কিলোমিটার গতি ছিল তখন।

ষাট-পঁয়ষট্টি কিলোমিটার বেগে একটা লাইটপোস্টের ওপর পড়ল গিয়ে এবার সেলুন। দড়াম করে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা খেয়ে প্রায় উড়ে ফিরে এল রাস্তার মাঝখানে।

উন্মত্তের মত গরস্কির হাত ছোটাবার চেষ্টা করতে লাগল মাসুদ রানা। নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে বিপদ, কখন কিসের আঘাতে মৃত্যু হল টেরও পাবে না। কর্নেলও অক্টোপাস, ধরেছে তো ধরেছেই। একচুল শিথিল হচ্ছে না বন্ধন। এভাবে হবে না, বুঝতে পারল রানা। সময়ও বেশি পাওয়া যাবে না। যে গতি এখনও সেলুনের, তাতে নিরেট কিছুর সঙ্গে ভালমত সংঘর্ষ ঘটলে প্রাণে বাঁচবে না একজনও। অপ্রস্তুত অবস্থায় ওকেও মরতে হবে আর সবার সঙ্গে।

হুইল দখলের আশা ছেড়ে চট্ করে কর্নেলের একহাতের বুড়ো আঙুল মুঠো করে ধরল ও খুঁজেপেতে। উল্টোদিকে হ্যাঁচকা এক টান দিতেই মট্ করে ভেঙে গেল আঙুলটা। চেঁচিয়ে উঠল গরস্কি, মুহূর্তে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। এবার ডান হাত ঘুরিয়ে কনুই দিয়ে জোরালো এক আঘাত হানল তার নাকের ওপর। নরম সীটে মাথাটা সেঁধিয়ে গেল কর্নেলের। গুঙিয়ে উঠে নাক চেপে ধরল সে, পড়ে গেল কাত হয়ে। ভাঙা আঙুল সহ অন্য হাতটা চেপে ধরল দুই উরু দিয়ে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

এই সময় পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল আঁদ্রোপভ, কি যেন বলল চালককে। রানার লাথি খেয়ে হাত থেকে অস্ত্রটা ছুটে গিয়েছিল, তুলে নিয়েছে আবার ওটা। কিন্তু গুলি করতে পারছে না সেলুনের উল্টোপাল্টা আচরণের জন্যে, কর্নেলের লেগে যায় যদি। বেচারা সামাল দিতে পারছে না নিজেকেও, একহাতে জানালার ফ্রেম আঁকড়ে ধরে বসে আছে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় চোখ মেলে রাখতে পারছে না।

এত কিছু এক মুহূর্তে দেখা হয়ে গেল রানার। তার রিভলভার ধরা হাতের কবজি লক্ষ্য করে কারাতের কোপ চালাল ও। 'কেঁউ' করে উঠল আঁদ্রোপভ, আবার হাতছাড়া হয়ে গেল অস্ত্রটা। পরমুহূর্তে এক আঙুল উঁচানো মোটামুটি ওজনদার একটা হাফ-ফিস্ট বসিয়ে দিল ও তার কণ্ঠনালীর ওপর। ভেঙে বসে গেল মেজরের কার্টিলেজ।

হাজার মাইল বেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন সেলুনের অপরিসর অভ্যন্তরে। মুহূর্তের মধ্যে একসঙ্গে এতকিছু ঘটে যাচ্ছে যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে মস্তিষ্কের নির্দেশ পালন মহা দুঃসাধ্য এক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে এঞ্জিন নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে রানা। ফুয়েলশূন্য হয়ে পড়েছে কারবুটের, আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় পরিষ্কার, ক্রমে মিইয়ে আসছে।

অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়। বন্দীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের আগে বাহনের ট্যাঙ্কে পর্যাপ্ত ফুয়েল ছিল না, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে গাড়ি, জেনেও উপযুক্ত পদক্ষেপ এরা নেয়নি তা হতেই পারে না। তাহলে? সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস জবাবটা পৌঁছে দিল মাসুদ রানার নাকে। গ্যাসোলিনের উৎকট গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে।

ফুটো হয়ে গিয়েছিল নাকি পেট্রল ট্যাঙ্ক? ভাবল ও। নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। সম্ভবত লাইটপোস্টের সঙ্গে কারের পিছনটা ধাক্কা খাওয়ার সময়ই গেছে ট্যাঙ্কটা। এতক্ষণে হয়ত সব তেল পড়ে গেছে। নাকি আছে? পরমুহূর্তে খক্ খক্ করে কেশে উঠল সিলিন্ডার। যেন রানাকে বোঝাতে চাইল, নেই, বিশ্বাস করো, এক ফোঁটাও নেই।

পেট্রলের উগ্র গন্ধে মোচড় দিয়ে উঠল রানার খালি পেটটা, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল আতঙ্কে। যে কোন মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে উত্তপ্ত এঞ্জিনে, গাড়িতে। এক হাতে চালকের ঘাড় শক্ত করে চেপে ধরে আছে রানা, যাতে এদিকে ফিরতে না পারে ব্যাটা। হঠাৎ ডান চোখের নিচে মারাত্মক এক

খোঁচা খেল ও। পিলে চমকে উঠল।

সীটের ওপর এক হাঁটু রেখে উঠে বসেছে গরস্কি কোন ফাঁকে। অপেক্ষায় ছিল, বাগে পেতেই ভাল হাতটার তর্জনী চালিয়েছিল সে ওর এক চোখ লক্ষ্য করে–উপড়ে নেবে। আঙুলটা আর আধ ইঞ্চি ওপরে উঠলেই হয়ে গিয়েছিল। মিস হয়ে যেতে খেপে গেল পলকভনিক। অসহ্য রাগে আর যন্ত্রণায় পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা। সেই সঙ্গে বন্দী পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট, চোখ বিস্ফারিত, নাকের ফুটো ঘন ঘন ফুলে উঠছে তার।

রানা ঘুরে তাকানোমাত্র আবার খোঁচা মারার চেষ্টা করল সে। ঝট্ করে মাথা পিছিয়ে নিয়ে ব্যর্থ করে দিল রানা তাকে। মরিয়া হয়ে আবারও হাত চালাল আইভান, এবার আঙুলটা সঠিক জায়গাতেই পৌঁছুল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পলকে ঝাঁকি খেয়ে সরে গেছে শত্রু। ঝাঁকিটা তার নিজের তৈরি নয়, সেলুনের।

আরেকটা ডিগবাজি খেল কার অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে। এবার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল পিছনের উইন্ডশীল্ড। তরল কিছু ছিটকে এসে পড়ল রানার চোখেমুখে। পেট্রল! অন্ধের মত পিছনের ফাঁকটা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, বড়সড় ফোকর দিয়ে কোমর পর্যন্ত বেরিয়ে এল মুহূর্তে। কিন্তু আর এগোতে পারলো না। এক পা ধরে ফেলেছে আইভান গরস্কি। ওদিকে সেলুন তখন শেষ ডিগবাজি খাওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে সময় নিয়ে লাথিটা মারল মাসুদ রানা, ঠিক তার ভাঙা নাকে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল, ছিটকে পড়ল গিয়ে সামনের সীটের পিছনে। চালকের মাথার সঙ্গে 'ঠাস্' করে ঠুকে গেল তার মাথা। রানা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তার ওপর বসে আছে চারপেয়ে জানোয়ারের মত। রক্তে সারা শরীর মাখামাখি। চেয়ে আছে তোবড়ানো সেলুনের দিকে।

সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছে পলকভনিক আইভান ইগোরোভিচ গরস্কি। নইলে গাড়ি উল্টে যাচ্ছে দেখেও; যেদিকে কাত হচ্ছে, সেদিকেরই জানালা গলে বেরোনর চেষ্টা চূড়ান্ত বোকামি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারত সে। কোমর পর্যন্ত বের করে এক পা টেনে বের করতে চেষ্টা করছে, এই সময় পুরোপুরি কাত হয়ে পড়ল গাড়ি। রানার মাত্র কয়েক গজ তফাতে।

রাস্তার সঙ্গে ছাতের কিনারার চাপে 'মড়াৎ' করে ভেঙে গেল কর্নেলের মেরুদণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে গেল কারটা। চার চাকা আকাশে তাক করে সড় সড় করে তুষার ঠেলে ছুটে গেল গজ বিশেক, তারপর আরেক লাইটপোস্টের সঙ্গে গুঁতো খেয়ে থেমে পড়ল, নৌকার মত সামনে-পিছনে মৃদু দোল খাচ্ছে, চার চাকা ঘুরছে বন্ বন্।

উঠে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে ছুটল মাসুদ রানা। পালাচ্ছে! হঠাৎ সামনেই নিজের ছায়াটিকেও তাল মিলিয়ে দৌড়াতে দেখল ও। বিস্মিত হয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল, আগুন ধরে গেছে সেলুনের এঞ্জিনে। তুষারের ওপর এখানে-ওখানে নাচানাচি করছে আগুনের অসংখ্য খুদে শিখা–ট্যাঙ্ক

থেকে ছিটকে পড়া পেট্রলের মজুত। প্রচণ্ড তাপে জ্বলে উঠেছে।

এবার সশব্দে বিস্ফোরিত হল ওটার ট্যাঙ্ক। চারদিক থেকে গাড়িটা ঘিরে ধরল সাদাটে কমলা আগুন। ওরই ফাঁকে জানালা গলে কে একজন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে দেখতে পেল রানা। সারা গায়ে আগুন ধরে গেছে লোকটার। ও নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন লোকটা হবে।

ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল মাসুদ রানা।

***

অগ্নিশপথ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

'কোথায় গিয়েছিলে?' বিধ্বস্ত মাসুদ রানার দিকে অপলক চেয়ে আছে টিলসন। 'যোগাযোগ করোনি কেন? কি হয়েছিল?'

বিদঘুটে চেহারা হয়েছে রানার। গ্রেট কোট ট্রাউজার ছিঁড়ে ফেটে গেছে বহু জায়গায়। দুই কনুই কাঁধ পিঠ হাঁটু সর্বত্র অসংখ্য ছোট বড় ক্ষত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রক্তাক্ত ক্ষতমুখগুলো জমাট বেঁধে গেছে, চটচট করছে। ভিজে উঠেছে গালের ব্যান্ডেজ, কালচে লাল হয়ে গেছে সাদা প্যাড। ওখানটায় কখন চোট লেগেছে রানা জানে না। তবে এখন যন্ত্রণা হচ্ছে খুব, টন টন করছে ভেতরের পেশীগুলো। এক আধটা স্টিচ্ ছিঁড়ে গেছে কি না কে জানে।

শহরতলীর এক ঘন গাছপালাপূর্ণ পার্কে দাঁড়িয়ে আছে ওরা মুখোমুখি। নিজের বিধিনিষেধ নিজেই ভেঙেছে রানা একটু আগে, টেলিফোন করেছিল টিলসনকে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভর করে উড়ে এসেছে সে। গত প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা যোগাযোগ নেই দুজনের। চরম উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে গেছে টিলসন। মুখ শুকিয়ে এতটুকু, গর্তে বসা চোখ টকটকে লাল।

দু হাত গ্রেট কোটের পকেটে রানার, কাঁপছে হি হি করে। থেকে থেকে শিউরে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মুখ খুলল ও। খানিকপর থামল বাকি বক্তব্য গুছিয়ে নেয়ার জন্যে। ওদিকে যেটুকু শুনেছে, তাতেই হতভম্ব হয়ে পড়েছে টিলসন। দাঁড়িয়ে আছে বজ্রাহতের মত। চাউনি বিস্ফারিত, দু ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ওর ভেতর দিয়ে অন্তিম চাঁদের মৃদু ঘোলাটে আলোয় সামনের দাঁতগুলো তার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। নিষ্প্রাণ মূর্তি যেন হ্যারল্ড টিলসন, একটি পেশীও নড়ছে না।

হিম উত্তুরে বাতাসে ভর দিয়ে মাঝে মধ্যে মোটরের চাপা গুঞ্জন ভেসে আসছে দূর থেকে। ফাঁকা সড়ক ধরে গন্তব্যে ছুটে চলেছে কোন নিঃসঙ্গ ক্যারিয়ার বা আর কিছু। মাথার ওপরের ডাল-পালায় মৃদু কোমল শব্দে বাসা বাঁধছে ঝরা তুষার, একটু একটু করে স্তূপ হচ্ছে। ভার সামলাতে না পেরে হঠাৎ হঠাৎ হুড়মুড় করে ধসে পড়ছে ওদের আশেপাশে।

ধ্যান ভাঙল হ্যারল্ড টিলসনের। নড়ে উঠল সে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, 'আবার বলো। প্রথম থেকে, প্লীজ।' প্রতি সোয়া ঘণ্টা অন্তর তার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল রানার। কিন্তু গত দেড় দিন সাড়া ছিল না ওর। দীর্ঘ নীরবতার পর এই সাক্ষাৎটা তাকে চিন্তামুক্ত করবে ধরে নিয়েছিল টিলসন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

মধ্যমা আর বুড়ো আঙুল দিয়ে দু চোখের পাতা ডলতে লাগল মাসুদ

রানা। জ্বালা করছে ভীষণ। কিছুতেই কর্নেল গরস্কির মুখটা ভুলতে পারছে না ও। ঘুরে ফিরে বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে লোকটা। মধুরঙা দু চোখে তার কি এক অব্যক্ত ফরিয়াদ যেন। জীবিত গরস্কির চাইতে মৃত গরস্কি অনেক অনেক বেশি ভোগাচ্ছে রানাকে। শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না একটি মুহূর্তও।

থেমে থেমে ঘটনাটা আবার খুলে বলল ও। কেবল শোনা নয়, প্রতিটি শব্দ হাঁ করে গিলতে লাগল টিলসন। শুনতে শুনতে ক্ষণে ক্ষণে একেক রূপ নিল তার চেহারা। একসময় রানার বলা শেষ হল। ছেঁড়াফাটা গ্রেট কোটটা টেনেটুনে নিজেকে ওটা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে নিতে চাইল ও। ঠাণ্ডা বাতাসের কামড় দুর্বল শরীরে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

'কাপিস্তা কিরভ!' নিচু গলায়, আপনমনে উচ্চারণ করল টিলসন।

'এলিনার কাছে শুনেছি লোকটা নাকি জামানের বন্ধু। ওদিকে জামানের সঙ্গে সেদিন যাকে দেখেছ তুমি, তার সাথেও মিলে যায় এর বর্ণনা। এর ব্যাপারেই বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলাম।'

'সরি, দোস্ত। সব তথ্য জোগাড় করতে…'

'আমার ধারণা আমাকে চেনে লোকটা,' টিলসনকে থামিয়ে দিল রানা। 'তোমাকেও হয়ত চেনে। আসল পরিচয় জানে কি না কে জানে।'

'আমাদের চেনে!' অন্যমনস্কের মত গাল চুলকাতে লাগল লোকটা। দু চোখের মাঝখানে লম্বালম্বি সরলরেখার মত ইঞ্চিখানেক দীর্ঘ দুটো গভীর ভাঁজ পড়ল।

'হয়ত।'

'তার মানে…তার মানে, মিখাইল জিভরস্কিকে চিনে ফেলেছে কেজিবি? ফাঁস হয়ে গেছে তোমার ছদ্ম পরিচয়?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে শিওর হচ্ছ?'

'ধরা পড়ে ছিলাম আমি কেজিবির হাতে।'

'কি!' সাপ দেখার মত আঁতকে উঠল টিলসন। 'কি বললে, ধরা…!'

'লুবিয়াঙ্কায় আটক ছিলাম আমি,' সহজ কণ্ঠে বলল রানা। 'ওদের মেইন কম্পিউটরে ধরা পড়ে গেছে মিখাইল জিভরস্কি।'

গোল গোল চোখ কপালে তুলে রানাকে দেখছে টিলসন। বেকুব বনে গেছে। এরকম পিলে চমকানো সংবাদ কি না এত দেরিতে জানা গেল! এমন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে আছে লোকটা যেন ও একগাছা ফাস্ট বার্নিং ফিউজ, যে-কোন মুহূর্তে সশব্দে বিস্ফোরিত হবে। 'কি করে…' একটা ঢোঁক গিলল টিলসন। 'ছাড়া পেলে কি করে, পালিয়েছ?'

'সার্বস্কি ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা আমাকে। পথে দুর্ঘটনায় পড়ল গাড়ি…' স্লো মোশন ছায়াছবির মত পুরো ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। মেরুদণ্ড ভাঙা আইভান গরস্কির যন্ত্রণাকাতর মুখটা মনে পড়তেই আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল।

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল টিলসন। 'তারপর?'

'কেজিবি-র তিন অফিসার আর আমি ছিলাম গাড়িতে। তারা সবাই মারা গেছে।' এতক্ষণে হয়ত ওর খোঁজে ফুল স্কেল হান্ট অপারেশনে নেমে পড়েছে কেজিবি, ভাবল রানা। গরস্কির কথা যদি সত্যিও হয়, রানার আসল পরিচয় যদি বড় কর্তাদের কাউকে সত্যিই সে না জানিয়ে থাকে, তবুও নিস্তার নেই। দুই সঙ্গীসহ কর্নেল নিহত হলেও আরও অন্তত একজন জানে ওর পরিচয়। এক ক্যাপ্টেন, যাকে লুবিয়াঙ্কা ত্যাগ করার সময় সঙ্গে নেয়নি কর্নেল, ফিরিয়ে দিয়েছিল। দুর্ঘটনাকবলিত সেলুন এবং তিন অফিসারের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়ামাত্র মুখ খুলবে সে।

লোকটা ওর আসল পরিচয় জানে? ভাবল রানা, অধস্তনদের কাছে কি ওর পরিচয় জানিয়েছিল গরস্কি? নাকি ওপরওয়ালাদের মতো ওদের কাছেও গোপন করে গেছে? না বোধহয়। গালের ব্যান্ডেজে আলতো করে হাত বোলাল রানা। চুপ করে আছে হ্যারল্ড টিলসন। এখন আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে। একটু আগে ডুবে গেছে চাঁদ। অনেক দূর থেকে ট্রামের আওয়াজ কানে এল। সোলদাতস্কায়া উলিসার দিকে আছে হয়ত গাড়িটা, রেলের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণে ঠং ঠং শব্দ উঠছে।

আবার আনমনা হয়ে পড়ল রানা। কি যেন বলেছিল গরস্কি? 'আমার স্ত্রী···চার্মিং লেডি। দুটি মেয়ের বাপ আমি···উজ্জ্বল সোনালী রঙের চুল···ভারি মায়াভরা চোখ···ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে আমার···' কপালের দু পাশের রগ শক্ত করে চেপে ধরল রানা। কি করছে এখন গরস্কির স্ত্রী? মেয়ে দুটো? পরপর দুই রাত তাকে কাছে পায়নি ওরা, পাবেও না আর কোনদিন।

বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার। হায়রে জীবন! এপার ওপারের মাঝে কী সামান্য-ই না ব্যবধান। কত সহজেই না দেহ পিঞ্জর ছেড়ে শূন্যে ডানা মেলে প্রাণ পাখি, আর বছরের পর বছর ধরে বহু যত্নে গড়ে তোলা দেহখানি···।

'···আমাদের চাই।'

'কি?' নড়ে উঠল রানা।

'লোকটিকে যে কোন মূল্যে ধরতে হবে, রানা। কিরভকে। আমাদের আর কোন ক্ষতি করার সুযোগ দেয়া যাবে না তাকে। তার আগেই পাকড়াও করতে হবে।'

'হ্যাঁ। কথা বলা দরকার লোকটার সঙ্গে।' থেমে আবার ব্যান্ডেজে হাত বোলাল রানা। 'কিন্তু আগে এখানটা মেরামত করা দরকার। ভেতরে কাঁচ রয়ে গেছে অনেক।'

'সে আমি দেখছি। তোমার কি মনে হয় যে কিরভ সত্যিই আমাদের পরিচয় জানে?'

'অসম্ভব নয়।'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা চুলকাতে লাগল টিলসন। আনমনে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'চিনল কিভাবে? কেন করল সে এ কাজ?'

রানাও কম মাথা ঘামায়নি এ নিয়ে, কিন্তু কোন কূল করতে পারেনি।

কেজিবি-কে যখন ওর পিছনে লেলিয়ে দিল কাপিস্তা কিরভ, তখন নিজের পরিচয়টা কেন জানাল না সে ওদের? অথচ ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে মিলিশিয়া গার্ডটিকে কিছু একটা দেখাতেই সমীহ ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল তার চোখে। কেন? কি ছিল ওটা? ভুয়া কোন পরিচয়পত্র?

কিন্তু তার-ই বা প্রয়োজন কি ছিল? কিরভ পার্টির সদস্য, তার পরিচয় গোপন রাখার বা ভুয়া পরিচয়পত্র দেখানর কি কারণ থাকতে পারে? তাছাড়া, হুট্ করে কেন-ই বা ধরিয়ে দিতে গেল ওকে? রানা তাকে অনুসরণ করছিল বলে? সে-ই কি পরে টেলিফোনে গরস্কিকে ওর পরিচয় জানিয়ে দিয়েছিল? অসংখ্য প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর জানা নেই একটিরও। মাথার মধ্যে কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

'তোমার সেলে খুব সম্ভব কোন ফুটো আছে,' মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করল মাসুদ রানা। 'সে-ই হয়ত কিরভকে জানিয়ে দিয়েছে যে আমি তার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়েছি তোমার কাছে।'

'এই জন্যেই আরও বেশি করে ওকে চাই আমাদের, রানা। ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই আমার সেলে বিশ্বাসঘাতক কেউ আছে কি না। থেকে থাকলে সে কে!' কঠোর হয়ে উঠল টিলসনের চেহারা।

'হুঁম!' পুবদিকে তাকাল রানা।

খুব ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে আঁধার। ভোর হচ্ছে। হঠাৎ 'ধপাস্' শব্দে চমকে উঠল দুজনেই। একলাফে ঘুরে দাঁড়াল শব্দের উৎসের দিকে। কেঁপে গেছে কলজে। কয়েক মুহূর্ত সামনের দিকে চেয়ে থাকল ওরা, তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ঠোঁট টিপে। ওপাশের একটা গাছের ডালে জমে ওঠা বড়সড় তুষারের স্তূপ ঝরে পড়েছে ওজন সামলাতে না পেরে।

'আমার খোঁজ না পেয়ে ঢাকায় মেসেজ পাঠিয়ে দাওনি তো?'

'নাহ!' মাথা দোলাল টিলসন। 'দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম ঠিকই, তবে তোমার দেখা যে পাব, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না আমার। সে যাক, পার্কে এসেছ কতক্ষণ হল?'

'ঘন্টাখানেক হবে।' টিলসনকে ফোন করার পর আরও ছয়টা টেলিফোন করেছিল রানা। বিশেষ টেলিফোন। মস্কোর আশেপাশেই। অন্য প্রান্তে প্রার্থিত কণ্ঠটির সাড়া পেতে সাঙ্কেতিক ভাষায় অত্যন্ত দ্রুত বিশেষ একটা মেসেজ কেবল আউড়ে গেছে রানা প্রতিবার। তারপর সোজা চলে এসেছে পার্কে।

চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তেই ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। পাশাপাশি তিনটে ছায়ামূর্তির ওপর চোখ পড়ল। জমে গেল ও। এদিকেই আসছে লোকগুলো। কারা ওরা? ঝেড়ে দৌড় লাগাবে কি না ভাবছে। এমন সময় কথা বলে উঠল টিলসন।

'ভয়ের কিছু নেই। ওরা শত্রু নয়।'

'তোমার লোক?'

'হ্যাঁ।'

সের পাঁচেক ওজনের আরেকটা স্তূপ খসে পড়ল। এবার আর আশেপাশে নয়, সরাসরি মাসুদ রানার মাথায়। পড়েই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। থতমত খেয়ে গেল রানা। মাথায়, মাফলারের ফাঁক গলে গলায় ঘাড়ে আটকে গেছে খানিকটা তুষার। ব্যস্ত হয়ে ঝাড়তে লাগল ও। তাই দেখে হেসে উঠল হ্যারল্ড টিলসন।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও শোচনীয় অবস্থা হল তার। দ্বিগুণ ওজনের আরেক চাঙ তুষার আশ্রয়চ্যুত হল, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল তার মাথায়, কাঁধে। সেই সঙ্গে গলার মধ্যেও খানিকটা সেঁধিয়ে গেল হাঁ করা মুখ দিয়ে। দুই তরফা আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল টিলসন, খক্ খক্ করে কাশতে আরম্ভ করল। গলা কোনমতে পরিষ্কার করে নিয়েই তিড়িং তিড়িং তুর্কি নাচ জুড়ে দিল ফাঁক ফোকর গলে কাপড়ের ভেতরে ঢুকে পড়া তুষার ছাড়াবার জন্যে। বিপদ ভয় ভুলে নিচু গলায় হাসল একচোট দুই বন্ধু। তিন ছায়ামূর্তিও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। পুরো ঘটনাটা চোখে পড়েছে তাদের।

হাসি থামতে টিলসন বলল, 'চলো, কেটে পড়ি। ভোর হয়ে আসছে।'

অপেক্ষমাণ তিনজনকে নিয়ে পার্কের উত্তর প্রান্তের দিকে রওনা হল ওরা। কিছুক্ষণ নীরবে পা চালাবার পর ঘুরে টিলসনের দিকে তাকাল রানা। 'ওদের দুজনের ব্যাপারে জানা গেছে কিছু?'

'মোটামুটি। মস্কোয় ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভ আছে সতেরোজন। এর মধ্যে তিনজন পার্টির প্রাথমিক সদস্য, চারজন দ্বিতীয় সারির নেতা। অন্যরা সাধারণ খনি শ্রমিক, ডক ইয়ার্ড এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। দাড়ি আছে সাতজনের।'

'মুশকিলেই পড়া গেল!'

'কোন মুশকিল নেই। লোকটাকে আমি একবার দেখতে পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'আর এলিনা?'

'ক্রেমলিনে চাকরি করে, পারসোনেল ডিপার্টমেন্টের অনুবাদ সেলে। ভাল জায়গাতেই হাত দিয়েছিল জামান। আচ্ছা, এমন হতে পারে না যে এলিনাই তোমার কথা কিরভকে জানিয়ে দিয়েছে?'

'হতে পারে। না-ও হতে পারে।' আবার চিন্তায় পড়ে গেল রানা। কিরভ যদি জামানের বন্ধু-ই হবে, তাহলে ওকে কেজিবির হাতে ধরিয়ে দেয়ার কথা কল্পনাতেও ঠাঁই দিত না নিশ্চয়ই।

পার্কের শেষ প্রান্তে পৌঁছে থেমে দাঁড়াল ওরা। মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল আগন্তুক তিনজন। পার্কের কোমর সমান উঁচু কাঠের বেড়ার ওধারে চওড়া সড়ক, ভেজা। স্ট্রীট লাইটের আলোয় চিক চিক করছে। পেভমেন্ট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দুটো গাড়ি। একটা কালো মস্কভিচ, অন্যটা লাদা। নম্বর প্লেট দুটোরই ডিপ্লোম্যাটিক, তবে ব্রিটিশ নয়। একটি পুব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী দেশের।

চারদিকে সতর্ক নজর রেখে বেড়া টপকাল রানা ও টিলসন। মস্কভিচের পাশে পৌঁছে প্যাসেঞ্জারস ডোর মেলে ধরল টিলসন। মাথা ঝাঁকাল রানার

উদ্দেশে। 'উঠে পড়ো। ইমিডিয়েট মেডিকেল অ্যাটেনশন দরকার তোমার।'

'কোথায়?'

'আমার দু নম্বর সেফ হাউসে। ভাল এক লেডি ডাক্তার আছে ওখানে।'

উঠে বসল মাসুদ রানা। প্রায় নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করল দুটো গাড়ি।

কার্ল মার্কস উলিসার একটি সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। এটি যতটা উঁচু ঠিক ততটাই পাশে। প্রতি তলায় চার কক্ষের ছয়টি করে ফ্ল্যাট। আটতলার দক্ষিণ প্রান্তের ফ্ল্যাটের বেডরুম। অল্প ওয়াটের নীলচে আলোয় দীর্ঘদেহী পেটা শরীরের এক যুবককে দেখা যাচ্ছে, রুমের মাঝখানে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে গা এলিয়ে। পুরু গদিতে নিম্নাঙ্গ পিঠ কাঁধ প্রায় ডুবে গেছে তার। দেখে মনে হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আসলে তা নয়। সম্মোহিত করা হয়েছে যুবককে। যুবকের নাম জামান শেখ।

তার মুখোমুখি একটি উঁচু টুলে হালকা-পাতলা গড়নের এক প্রৌঢ় বসা। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। জুলফি এবং কানের দু পাশের চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো। বেশ অভিজাত চেহারা। এই ব্যক্তিটি ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হাসপাতালের সাইকিয়াট্রির প্রফেসর, চাইম হেরযোগ।

একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে কিছুদিন আগে লাইপজিগ এসেছিল প্রফেসর। সপ্তাহখানেক আগে শেষ হয়েছে সম্মেলন। এরপর দেশে ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও যায়নি সে। বরং ভুয়া কাগজপত্র নিয়ে মস্কো এসেছে 'বিশেষ' এক কাজে। ঝুঁকে সামনের যুবকের মুখের দিকে চেয়ে আছে সে, তার বুকের ওঠানামা লক্ষ করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

ঘরে আরও দুই ব্যক্তি রয়েছে। হেরযোগের কয়েক গজ পিছনে সোফায় বসে আছে পাশাপাশি। তাদের একজন ফিওদর বোরোডিনস্কি। চেহারা এবং স্বাস্থ্য দুটোই এর অবিকল গরিলার মত। সাড়ে ছ ফুট লম্বা বোরোডিনস্কি। টকটকে লাল দু চোখে খুনীর দৃষ্টি। মাথার ছোট করে ছাঁটা লালচে কোঁকড়া চুল ধুলোয় একাকার, দুই চোখের কোণ থেকে শুরু করে সারা গাল গলাজুড়ে দিন সাতেক ব্লেডের সঙ্গে সম্পর্কহীন আধা ইঞ্চি লম্বা খোঁচা খোঁচা দাড়ি লোমশ বুকের সঙ্গে মিলেমিশে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে চেহারা।

ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে পা টানটান করে বসে আছে বোরোডিনস্কি একটার ওপর অন্যটার গোড়ালি তুলে। দস্তানাহীন দুই হাতের তালু কোটের তলা দিয়ে দুই বগলে সেঁধিয়ে দিয়েছে। কাঁধ সরু করে লাল চোখে চেয়ে আছে সামনের শিথিল যুবকের দিকে। মস্কোর তিন তারকা বিশিষ্ট ইহুদী অ্যানার্কিস্টদের নেতা এ লোক।

পাশেরজন আনাতোলি গ্রেকভ। সব ব্যাপারেই আগেরজনের একেবারে উল্টো সে। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা গ্রেকভ। পোশাক আর চেহারায় নির্বিরোধী গোবেচারা মানুষ। মুখটা ছোটখাট গোল চাঁদের মত। নাকের নিচে বাঁকা তলোয়ারের মত সুন্দর ছাঁটের গোঁফ। ডানদিকে সিঁথি করে আঁচড়ানো চুল ভেজা ভেজা। মনে হয় এইমাত্র গোসল সেরে এসেছে। মুখ নিচু করে

আনমনে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মধ্যমার নখ খুঁটছে গ্রেকভ। বোরোডিনস্কির সহকারী সে। দুজনেই গম্ভীর, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

চিন্তার কারণ মাসুদ রানা। পলকভনিক আইভান গরস্কির হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে রানা, এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের রক্তচাপ উঠে গেছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। মাথায় উঠেছে খাওয়া-ঘুম। শুধু পালানো হলেও কথা ছিল, তিন তিনজন কেজিবি অফিসারকে হত্যা করে পালিয়েছে লোকটা। কতটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সে বোঝা যায় এ থেকেই।

এর ফলে তাদের পরিকল্পনার অর্ধেকটাই বানচাল হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেকের কি হবে, তাই নিয়ে রীতিমত শঙ্কিত এরা। কারণ বোরোডিনস্কি এবং গ্রেকভকে মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে তেল আবিবের কাছে এদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক কমে যাবে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্বও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে।

অন্যমনস্কের মত প্রফেসরের পিঠের দিকে চেয়ে আছে বোরোডিনস্কি। ঘন ঘন নিচের ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলার জোগাড় করেছে। জামান শেখকে একটু আগে নতুন করে সম্মোহিত করা হয়েছে। প্রয়োজন ছিল না, তবুও সতর্কতার জন্যে করা হয়েছে। মাসুদ রানা সম্পর্কে যে সব নির্দেশ ঢোকানো হয়েছিল তার মাথায়, সেগুলোই নতুন করে আরেকবার 'ফীড' করা হয়েছে। এ মুহূর্তে গভীর ঘুমের তলদেশ থেকে একটু একটু করে উঠে আসছে জামান শেখ। নড়ছে অল্প অল্প।

দীর্ঘ নীরবতার পর চাইম হেরযোগের ভারী কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল রুমের মধ্যে। 'মাসুদ রানার মুখটা মনে পড়ে আপনার?'

উত্তর দিল না জামান শেখ। চোখ বুজে পড়ে থাকল। চেয়ারের হাতলের ওপর দু হাতের আট আঙুল নড়াচড়া করছে। প্রশ্নটা আবারও করল প্রৌঢ় হেরযোগ। গম্ভীর তবে ফ্ল্যাট, একঘেয়ে কণ্ঠে।

'পড়ে,' অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল যুবক। চোখ মেলেনি।

'তার সঙ্গে আপনার কোন কোন বিষয়ে গুরুতর সংঘাত আছে, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি…,' আরও কয়েক ইঞ্চি সামনে ঝুঁকল প্রফেসর, '…পেশাগত, না…' থেমে গেল ইচ্ছেকৃতভাবে।

দু হাত বুকের ওপর ভাঁজ করল জামান শেখ। চোখ মেলে সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকল। 'আদর্শগত, নীতিগত, জাতিগত।' শেখানো বুলি আউড়ে গেল সে গড় গড় করে।

'এ সংঘাতের শেষ পরিণতি কি?'

আস্থার সুর ফুটল জামানের গলায়। 'মাসুদ রানার মৃত্যু।'

বেশ, বেশ, মনে মনে সন্তুষ্টির হাসি হাসল চাইম হেরযোগ। ঘাড় ফিরিয়ে বোরোডিনস্কি এবং গ্রেকভের দিকে তাকাল। ভেতরের উচ্ছ্বাসের খানিকটা ছাপ পড়েছে মুখে। আবার জামানের দিকে মনোযোগ দিল সে। 'মাসুদ রানার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে লোকটা

কেজিবি-র হাত থেকে। খুব সম্ভব এবার আপনার মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও বাধা দেবে সে। জানেনই তো, আপনার মত দেশপ্রেমিক ইহুদীদের সহ্য করতে পারে না লোকটা একেবারেই।'

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ জামান শেখ। তারপর চোখ বুজে গভীর দম টানল। বন্ধ পাতার নিচে চোখের মণি দ্রুত এদিক-ওদিক করতে শুরু করেছে। ঘন-ঘন ওঠানামা করছে ব্যায়ামপুষ্ট প্রশস্ত বুক, উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। 'আমিও সহ্য করতে পারি না মুসলমানদের, ইউ নো।' দু হাত মুঠো পাকাল জামান।

'অবশ্যই জানি। সে জন্যেই বলছি লোকটা যেন দ্বিতীয়বার কিছুতেই আর ধোঁকা দিতে না পারে, সে ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, বুঝলেন? প্রথম সুযোগেই কাজটা সেরে ফেলা দরকার। ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি বিদেয় করা যায়, ততই লাভ।'

জামান শেখকে ফাঁদে ফেলার আগেই মোসাড প্রধান নিশ্চিত ছিল যে মস্কো রহস্যের মীমাংসা করতে মাসুদ রানা আসবেই। তার ওপর ভিত্তি করে এক ঢিলে অনেক পাখি মারার ফন্দি এঁটেছিল সে। কিন্তু প্রথম ঢিলটা মিস হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। তাই এবার আরেক ঢিল ছোঁড়ার প্রস্তুতি চলছে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ঢিল।

'চিন্তা নেই,' বলল জামান শেখ। বন্ধ মুখের ভেতর জিভ নড়ছে তার। বাঁ মাড়ির বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা, মনে হয় একটা দাঁত পড়ে গেছে। কেন? কখন পড়ল? ভাবনা-চিন্তা পরিষ্কার নয়। তবুও বিষয়টি জামানকে ভাবাচ্ছে। কেমন করে পড়ল? নাকি আগে থেকেই অমনি ফাঁকা ছিল জায়গাটা? নাকি···কি জানি, মনে পড়ছে না। সায়ানাইড প্ল্যান্ট করা দাঁত ছিল ওটা, এরা বের করে নিয়েছে। 'কতবড় তালেবর মাসুদ রানা, দেখব আমি।'

'আপনি নিশ্চয়তা দিলে ভরসা পাই।'

দরজায় করাঘাতের আওয়াজ উঠল। প্রথমে দ্রুত তিনবার, পরেরবার থেমে থেমে তিনবার। চট্ করে আসন ছাড়ল ফিওদর বোরোডিনস্কি। ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা দোলাল আপনমনে। মেয়েটির সময়জ্ঞান দারুণ! অভ্যেসবশে দরজার মাঝামাঝি জায়গায় বসানো পীপহোলে ঝুঁকে চোখ রাখল সে। তারপর ছিটকিনি এবং সেফটি চেইন নামিয়ে মেলে ধরল দরজার পাল্লা।

মেয়ে নয় সামনের ওটা—যেন ডানা কাটা এক পরী। আঠারো-উনিশ হবে বয়স। চমৎকার এক টুকরো হাসি ঠোঁটে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পানপাতা আকৃতির মুখটা নিটোল ভরাট। সুগঠিত ঝকঝকে দাঁত। দীর্ঘ খাড়া নাক। বড় বড় দু চোখের পাপড়ি কুচকুচ কালো, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই লম্বা। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা শ্যাম্পু করা ইউ কাট্ চুলও তেমনি কালো মেয়েটির। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত সম্ভবত।

বোরোডিনস্কির চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে একটু হাসল মেয়েটি। ভেতরে ঢুকে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। নিচে দুধ সাদা স্কার্ট আর প্রিন্টের

ব্লাউজ পরে আছে সে কেবল। তার ক্ষীণ কটি আর উদ্ধত বুকের ওপর দিয়ে এক পলক ঘুরে এল বোরোডিনস্কির দৃষ্টি। অজান্তেই ঢোক গিলল সে।

'কোথায় আমার নাগর?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। আরও খানিকটা বিস্তৃত করল হাসি।

জিভ কাটল বোরোডিনস্কি। 'আস্তে! জেগে আছে ব্যাটা।'

সামনের সোফাটার ওপর কোট নামিয়ে রাখল মেয়েটি। তারপর পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দাঁড়াল গিয়ে প্রফেসরের পাশে। মুখ তুলে তাকাল প্রফেসর। হাসল দাঁত বের করে। জয়া মাসুরভ মেয়েটির নাম। সম্মোহিত জার্মান শেখের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এই মেয়েটি তার বাগদত্তা। খুব শিগগিরই বিয়ে হতে যাচ্ছে ওদের। গত কদিন থেকে নিয়মিত অভিসার চলছে ওদের দুজনের। জার্মানকে পুরোপুরি জড়িয়ে নিয়েছে জয়া তার রূপের জালে।

আসন ছাড়ল প্রফেসর। জয়ার উদ্দেশে একবার চোখ টিপল, তারপর অন্য দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। দরজা বন্ধ করে জার্মানের কাছে ফিরে গেল জয়া মাসুরভ। ঝুঁকে আলতো করে চুমু খেল তার ঠোঁটে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল জার্মানের দেহে। দেখতে দেখতে ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠল ও।

ইয়েভগেনি প্রলেকভের আবিষ্কৃত ইঞ্জেকশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এটি। প্রায় সারাক্ষণই বলতে গেলে যৌন ক্ষুধা লেগেই থাকে। আসলে এই জন্যেই জার্মানের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়া হয়েছে জয়াকে। মুখে চাপা হাসি ধরে রেখে জার্মানকে আসন থেকে টেনে তুলল সে। পায়ে পায়ে ঠেলে নিয়ে চলল বিছানার দিকে।

দুই

তানিয়া ফিওদরভা। বয়স সাতাশ-আটাশ। লম্বা প্রায় রানার ভুরু সমান। পরনে ঢোলা কালো রঙের সোয়েটার, টুইডের ট্রাউজার। লালচে চুল ঘাড়ের কাছে সুদৃশ্য ক্লিপ দিয়ে আঁটা। চামড়ার রঙ অনেকটা ফ্যাকাসে হাতীর দাঁতের মত। সাধারণ আর দশজনের মত নয় তানিয়া, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বেশ কঠোর একটা ভাব আছে চেহারায়।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল তানিয়া। দু কোমরে হাত রেখে একবার রানা আরেকবার টিলসনের দিকে তাকাতে লাগল। চাউনিটা যেন অন্তর্ভেদী, মনে হল রানার, এক পলকেই ওর ভেতরের সবটা দেখা হয়ে গেছে তার। প্রথমে শুধুই দেখল তানিয়া। তারপর ক্ষতগুলো রানাকে কতটা ভোগাচ্ছে অনুভব করতে আরম্ভ করল। সামান্য কুঁচকে উঠল তার দু গাল।

'ও কিছু নয়,' টিলসনের দিকে ফিরে বলল তানিয়া ফিওদরভা। 'মাত্র আধ

ঘণ্টার ব্যাপার।' রানার চোখে চোখ রাখল এবার। ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করল, 'কিসের সাথে ধাক্কা খেয়েছেন, ট্যাঙ্ক না মিজাইল?'

'হবে অমনি একটা কিছু।' সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল মাসুদ রানা।

'রসিকতা যতটা সম্ভব পরে কোরো, তানিয়া,' বলল টিলসন। 'আগে ড্রেসিং শেষ করো, প্লীজ।'

'ঘাবড়িয়ো না। শুরু করলেই শেষ হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। যা-তা ডাক্তার নই আমি।' দ্রুত পাশের রূমের উদ্দেশে পা বাড়াল তানিয়া।

হ্যারল্ড টিলসনের দু নম্বর সেফ হাউস এটি। বাড়িটি গরকোগো ইন্টারসেকশনের হোটেল পিকিঙের উল্টোদিকে, একটা গলির তিন-চার বাড়ি পর হাতের ডানে। উঁচু দেয়ালঘেরা মান্ধাতা আমলের বাড়ি। চারদিকে প্রাচীন বৃক্ষের ঘন বেষ্টনীর জন্য রাস্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একেবারে আদর্শ সেফ হাউস।

এক গামলা গরম পানি, তুলোর প্যাড আর ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে একটু পর ফিরে এল তানিয়া। রানাকে দেয়ালঘেঁষা একটি টেবিল দেখিয়ে বলল, 'ওখানে চলুন।'

নিচু কণ্ঠে আলাপ করছিল দুই বন্ধু। একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দুজনেই। 'আমি চলি এখন, তানিয়া,' বলল টিলসন। 'পরে টেলিফোন করব, কেমন?'

'ঠিক আছে।' হাতের জিনিসপত্র টেবিলের ওপর রেখে টিলসনের পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত গেল সে। দরজা বন্ধ করে ফিরে এল সঙ্গে সঙ্গে। টেবিলের ওপর একটা দামী টেবিল ল্যাম্প, ওটা জ্বেলে দিয়ে রানার গালের ব্যান্ডেজটা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাজটা শেষ হতে রক্তে চুপচুপে ভেজা তুলোর প্যাডটা রানার পায়ের কাছের একটা বাস্কেটে ফেলে দিল তানিয়া।

মুখটা রানার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ক্ষতটা পরখ করে দেখতে লাগল। দুটো স্টিচ ছিঁড়ে গেছে। দেখতে দেখতে আগের চেয়ে দ্বিগুণ কুঁচকে উঠল তানিয়ার গাল। অজান্তেই আরও খানিকটা ঝুঁকে এল সে। তার দেহের মিষ্টি সুবাস নাকে আসছে রানার। 'ভেতরে কিছু আছে নাকি? স্প্লিন্টার মেটাল বা আর কিছু?'

'কাঁচ থাকতে পারে।'

'দূষিত?'

'না, গাড়ির উইন্ডশীল্ডের।'

'ও, কার ক্র্যাশ করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

গরম পানিতে তুলো ভিজিয়ে ক্ষতটা আলতো করে কয়েকবার মুছে নিল তানিয়া। 'এই স্টিচ কার করা?' রাগ রাগ গলায় প্রশ্ন করল সে। 'ব্যাটা কি মানুষের ডাক্তার না পশুর?'

চুপ করে থাকল রানা। ঘুমে আপনাআপনি বুজে আসছে চোখ।

'সেলাইগুলো কেটে ফেলতে হবে, বুঝলেন? নতুন করে করতে হবে

আবার।'

আগেরবারের কথা স্মরণ করে ভয় পেয়ে গেল রানা। মিনমিনে গলায় বলল, 'কেন? না কাটলে চলে না?'

'না, চলে না। কারণ, সেলাই করার আগে ভেতরটা ভাল করে চেক করেনি সে ব্যাটা। খালি চোখেই অনেক কাঁচের টুকরো দেখতে পাচ্ছি আমি বাইরে থেকে।'

এরপর আর কথা চলে না। মনটাকে শক্ত করে নিল রানা। 'বেশ। যা ভাল বোঝেন, করুন।'

পরক্ষণেই জান উড়ে গেল ওর মেয়েটিকে একটা চিমটা আর কাঁচি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে। মনটাকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল তার সঙ্গে। 'কত বছর থেকে ডাক্তারী করছেন আপনি?'

'অনেক বছর। অবশ্য মস্কোর রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেয়া হয়েছে অনেকদিন আগেই।' রানার নাকের সঙ্গে প্রায় ঠেকে আছে তানিয়ার নাক। যদিও এদিকে একেবারেই খেয়াল নেই মেয়েটির। নিবিষ্ট মনে নিজের কাজে ব্যস্ত। দেহ স্থির। কেবল দু হাত নড়ছে। কুট্ কুট্ করে সেলাইগুলো কেটে ফেলল সে।

'সমলেনস্ক হাসপাতালে চাকরি করতাম,' বলে চলল তানিয়া ফিওদরভা। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি করা হয়েছিল ওটা। বিশাল, প্রায় দু হাজার সীট ক্যাপাসিটি। কয়েক মাস কাজ করার পরই হারালাম মোটা বেতনের চাকরিটা।'

'কেন? কি করেছিলেন?'

'কর্তৃপক্ষের ভাষায় "অমার্জনীয় অপরাধ"।'

'কিরকম?'

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না তানিয়া। পর পর অনেকগুলো কাঁচের টুকরো বের করল ক্ষত থেকে। খোঁচাখুঁচির ফলে আবার রক্ত গড়াতে শুরু করেছে ওখান থেকে।

'ক্যাপিটালিস্টদের তৈরি ওষুধ ব্যবহার করতে গিয়েছিলাম সোশ্যালিস্ট রোগীর ওপর,' বলেই হেসে ফেলল মেয়েটি। 'মানে আমেরিকান ওষুধ রোগীর ওপর ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। অ্যান্টিবায়োটিকস্। সে সময় হাসপাতালের স্টোরে অ্যানিমিয়ার প্রতিরোধক ছিল না কোন, অথচ সিরিয়াস রোগী ছিল বেশ কয়েকজন। অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে সে সময় সেরা ওষুধ ছিল রুমানিয়ার জি এইচ থ্রি। কিন্তু যেহেতু দেশটি তার 'কর্তা রাষ্ট্রের' প্রতি খুব একটা নমনীয় ছিল না, তাই ওটা আমদানি করা নিষিদ্ধ ছিল। আর কোন উপায় না পেয়ে আমেরিকান দূতাবাসে আমার এক পরিচিত ব্যক্তিকে ধরলাম। সে জোগাড় করে দিল। এবং সেগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। সে অনেকদিন হল, তেরো বছর।'

'আপীল করেননি এর বিরুদ্ধে?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'আপীল?'

'কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করেননি?'

'এদেশে ওসব করে লাভ হয়নি কোনদিন, হবেও না।'

প্রায় এক ঘণ্টা পর ওকে মুক্তি দিল তানিয়া ফিওদরভা। ঘর ভরে গেছে অ্যালকোহলের দুর্গন্ধে। টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট একটা আয়না বের করে দিল ওকে ডাক্তার। ওতে ভাল করে দেখল রানা নিজেকে। বেশ পরিচ্ছন্ন হয়েছে কাজটা। বার কয়েক মুখটা হাঁ করে, চোয়াল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা। খুব একটা ব্যথা লাগল না।

'আর ব্লীডিঙের চান্স নেই তো?' জানতে চাইল ও।

'না। তবে আবার যদি ওরকম ধাক্কা খান কিছুর সাথে, তাহলে গ্যারান্টি দিতে পারি না।' এবার রানার অন্যান্য ক্ষতগুলোর দিকে নজর দিল মেয়েটি। কোনটিই মারাত্মক নয়, কেবল কেটে-ছড়ে গেছে।

'আমার ব্যাপারে কি বলেছে আপনাকে টিলসন?'

'তেমনি কিছু না। আপনি ওর বন্ধু, নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন বলে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এইটুকুই।'

'আর কিছু না?' অনেকক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরাল রানা। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে একটু একটু করে ছাড়তে লাগল।

'আর···নাহ্!' কাঁধ ঝাঁকাল তানিয়া। 'হ্যাঁ, কারা নাকি খুঁজছে আপনাকে, এই আর কি।'

'আপনি জানেন, তারা কারা?' চোখ কুঁচকে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকল ও একভাবে।

'হ্যাঁ, জানি।'

'ওরা এখানে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যদি হানা দেয়?'

'কিছু করতে পারবে না। এ বাড়িটা অনেক পুরানো। এর স্টোর রুমের তলায় লম্বা একটা সুড়ঙ্গ আছে, উঠেছে গিয়ে প্রলেতারস্কায়া পার্কের মাঝখানে, প্রায় আধ কিলোমিটার উত্তরে। প্রয়োজনে ওই পথে সটকে পড়তে পারবেন।'

বাইরে সূর্য উঠি উঠি করছে। তানিয়ার তৈরি এক বাটি গরম মুরগির সুপ দিয়ে নাশতা সেরে নিজের জন্যে বরাদ্দ রুমে এসে ঢুকল রানা। পরিপাটি করে গোছানো রয়েছে বিছানা। ওটায় পিঠ লাগাতে না লাগাতেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। ডান হাত বালিশের নিচে, তর্জনী পেঁচিয়ে আছে ডাব্‌ল অ্যাকশন পয়েন্ট থ্রি এইট ওয়ালথারের ট্রিগারে।

ড্রাইভিং মিররে পিছনের স্পাসকি গেটের আলোকিত উঁচু খিলান দেখতে পাচ্ছে রানা পরিষ্কার। গত দশ মিনিটে ওই পথে অসংখ্য গাড়ি বেরিয়ে আসতে দেখেছে ও ক্রেমলিন থেকে, কিন্তু তার কোনটিই ওর প্রার্থিত মেটে রঙের সিরেনা নয়। তবে আসবে গাড়িটা, রানা নিশ্চিত। আর দু চার মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় আরেকবার ঘড়ি দেখল ও, তিন মিনিট বাকি আছে পাঁচটা বাজতে। এলিনার কথা সত্যি হলে আর পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যেই তার দেখা পাবে রানা।

গতরাতে আবার দেখা করে ও এলিনার সঙ্গে। 'আপনি আমার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন কাপিস্তা কিরভকে?'

এক পর্যায়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল মেয়েটি। 'কেন এত অবিশ্বাস আপনার! বলছি তো তার সাথে আমার দেখাই হয়নি এর মধ্যে। আর হলেই বা, কেন তাকে বলতে যাব আমি?'

'আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে।' নরম হল মাসুদ রানা। 'আমি ভেবেছিলাম হয়ত সত্য চেপে যাচ্ছেন আপনি।'

'কেন তা করব!' ঝট্ করে রানার দিকে দু'পা এগিয়ে এল সে। রাগে ফুঁসছে। 'বুঝতে পারছেন না, আমি মনেপ্রাণে আশা করছি ওকে খুঁজে বের করুন আপনি? ফিরে আসুক ও, এ রহস্যের শেষ হোক!'

চুপ করে থাকল রানা। কেঁদে কেঁদে শান্ত হল এক সময় এলিনা ইয়াকোভলেভনা। রুমাল দিয়ে মুছে নিল চোখের পানি।

একটা সিরেনা বেরিয়ে এল স্পাসকি গেটের তলা দিয়ে। না, মেটে নয়, ওটা লাল। সারা শহরে হাজার হাজার সিরেনা আছে। মেটে রঙেরও আছে নিশ্চয়ই অনেক। এখন যা মিলিয়ে দেখতে হবে, তা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর-ডি-টুয়েলভ-ওয়ান-ফর্টি ফাইভ। চারদিকের অজস্র টাওয়ার ক্লক একসঙ্গে ঘণ্টা পেটাতে আরম্ভ করল, পাঁচটা বেজে গেছে।

'কিরভের কাছে কেন বিনা প্রয়োজনে আপনার পরিচয় জানাতে যাব আমি?' দীর্ঘ নীরবতার পর আবার বলে উঠল এলিনা।

'হয়ত আপনি জানাননি, আর কেউ জানিয়েছে।'

রান্নার গলার স্বরে কেমন খটকা লাগল এলিনার। রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সিধে হল। রাস্তার অ্যাসিড লাইটের আলোয় চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। 'কেন, কি হয়েছে? কি করেছে কিরভ?'

'তেমন কিছু না। সে যাক্, করে কি লোকটা?'

'চাকরি।'

'কিসে?'

'ক্রেমলিনের ট্র্যান্সপোর্ট ডিভিশনে। পলিটব্যুরোর শোফার।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'নিশ্চই।' আরেকবার রুমালে চোখমুখ মুছল এলিনা।

'সেদিন কেন গোপন করে গিয়েছিলেন?'

'না, মানে, আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি সেদিন। তাই…'

'আজ পারছেন?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'পারছি।'

'কারণ?'

রেলিঙে হেলান দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল সে ঝিম্ মেরে। আশা এবং হতাশা দুটো মিলে কাবু করে ফেলেছে তাকে, টের পেতে অসুবিধে হল না রানার।

'কারণ আপনাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তাই।'

দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'কিরভকে আমার খুব দরকার। থাকে কোথায় সে, জানেন?'

'না, ওর বাসায় যাইনি কখনও। তবে প্রয়োজনে ঠিক কোথায় তার পোস্টিং, খুঁজে বের করতে পারব।'

আরেকটা মেটে সেরেনা বেরিয়ে এল। ইগনিশন কী-র উদ্দেশে হাত বাড়িয়েছিল রানা, কিন্তু থেমে গেল নম্বর প্লেটের দিকে তাকিয়ে। কিরভের নয় ওটা। একটা একটা করে থেমে পড়ছে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি। স্কোয়াড সহ প্রকাণ্ড দুটো যিল লিমুজিন গেট দিয়ে বেরিয়ে এল পর পর। রাজকীয় চালে ছুটল উত্তর দিকে। তাদের পথ দেয়ার জন্যে অন্যসব যানবাহন আগেই থেমে দাঁড়িয়েছে ট্রাফিক সঙ্কেতের নির্দেশে।

'আজ রাতের মধ্যে জানা সম্ভব? খুব জরুরী।'

'আজই?' দ্বিধায় পড়ে গেল এলিনা। 'না, অফিসে না গিয়ে সম্ভব নয়। ওর পার্সোন্যাল ফাইল দেখতে হবে। অফিসের চাবি নেই আমার কাছে।'

'তেমন পরিচিত কেউ নেই আপনার যার কাছে চাবি আছে? তাকে যদি বলেন খুব জরুরী কিছু ফাইল ওঅর্ক আছে, দেবে না সে চাবি?'

এক মুহূর্ত কি ভাবল এলিনা ইয়াকোভলেভনা। 'না, তেমন কেউ নেই। তবে সিকিউরিটি গার্ডকে বলে ঢোকার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'না। বিপদ আছে তাতে,' বলল রানা। 'শুনুন, কেজিবি আমাকে খুঁজছে, আমি খুঁজছি জামানকে। এক আজব প্রতিযোগিতা। যে ভাবেই হোক আমাকে জিততেই হবে এ প্রতিযোগিতায়। কেজিবি যদি জেতে, তাহলে আমি যেমন শেষ, সম্ভবত ও-ও···। সে যাক, কিরভ থেকে অন্তত আগামী দুদিন দূরে থাকুন। তবে ডেইলি রুটিন বদলাবার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক কাজকর্ম করবেন। আর ভুলেও কারও সামনে আমার প্রসঙ্গ তুলবেন না। তাতে আবার কোন বিপর্যয় ঘটতে পারে।'

'কি ঘটেছে বলেননি কিন্তু।'

'তা শুনে দরকার নেই আপনার। আর একটা কথা, সম্ভব হলে জামানকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। নইলে কোনদিন হয়ত···' থেমে গেল মাসুদ রানা মাঝপথে।

গালের পেশী তির তির করে কাঁপতে শুরু করল মেয়েটির। পলকে ভিজে উঠেছে দু চোখ। এখনই হয়ত কেঁদে উঠবে শব্দ করে। মায়া হল রানার। সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল এ জামানকে। ওর ধারণাই সত্যি হল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল এলিনা। বাধা দিল না রানা। অন্তরের দুঃখ বেদনা বেরিয়ে যাক খানিকটা পানি হয়ে।

ওই যে! এক ঝলক রক্ত ছলকে উঠল বুকের মধ্যে। ওই আসছে কিরভের ডি-টুয়েলভ-ওয়ান-ফর্টি ফাইভ। সিরেনাকে স্পাসকি গেট পেরোতে দেখে স্টার্ট দিল রানা, ওর পবেদা। ধীর গতিতে কাঁধ ছেড়ে ট্রাফিক সারিতে চলে এল রানা। কয়েকটি লেনে বিভক্ত প্রশস্ত রাস্তা। প্রাইভেট যানবাহন,ট্রাক, বাস সবার জন্যে আলাদা পথ।

মাঝারি গতিতে সিরেনার পিছু নিল ও। ওদের মাঝখানে চারটে কার এবং একটা ভ্যান। সোজা উত্তরে, রেজিনা উলিসার দিকে চলেছে কিরভ। রানার পিছনে একটা কার এবং একটা ট্যাক্সির পর দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড এক মার্সিডিজ টু টোয়েন্টি, একই সঙ্গে রওনা হয়েছে ওটাও। এতক্ষণ রানার শ খানেক গজ পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘাপটি মেরে।

রানার সতর্ক নজর সেঁটে রয়েছে সামনে। ও হাড়ে হাড়ে জানে কী পরিমাণ ধূর্ত কাপিস্তা কিরভ, কত তীক্ষ্ণ তার নজর। সেদিন প্রায় অনায়াসেই ওকে পিছনে সনাক্ত করতে পেরেছিল লোকটা। অবশ্য সেদিনের মত দিনের আলো নেই আজ। আরও ঘণ্টাখানেক আগেই রাত নেমেছে মস্কোয়। তাছাড়া এটি অন্য একটি পবেদা, এর ট্যাগ নম্বর কিরভের অপরিচিত। কিন্তু তারপরও ঝামেলা হতে পারে ধরে নিয়ে যে কোন ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে রানা।

একটানা দশ মিনিট অনুসরণ করার পর পেশীতে ঢিল দিল ও। অনর্থক স্নায়ুগুলোকে টেনশনে রাখার কোন মানে হয় না। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছে ও সিরেনার সঙ্গে। তাছাড়া এখন রাশ আওয়ার, অমন ডজন ডজন পবেদা রয়েছে রাস্তায়। তারচে' বরং লক্ষ রাখো, নিজেকে শোনাচ্ছে রানা, কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে কি না কিরভ। আবার কোন ফোন বুদে গিয়ে ঢোকে কি না। বাঁক নিয়ে রেজিনা উলিসায় পড়ল ওরা।

হঠাৎ অন্য এক চিন্তা খেলে গেল মাথায়। ওর গাড়িতে কোন ট্র্যান্সমিটার নেই তো, কনসিলড্ অ্যান্টেনার সঙ্গে যুক্ত? চট্ করে ড্রাইভিং মিররে চোখ গেল রানার। পিছনে তিনটে গাড়ির পরই রয়েছে মার্সিডিজটা। তার ঠিক পিছনেই প্রকাণ্ড এক ক্যারিয়ার। মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগল, ওটার আড়ালে কোন পেট্রল কার নেই তো?

পাঁচটা চোদ্দ মিনিটে প্রথম রিঙ রোড অতিক্রম করল ওরা। এর ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় পরেরটা। ওটা ছাড়িয়ে কাযাকভ উলিসায় পড়ল। এর মধ্যে সিরেনা আর পবেদার মাঝখানের দুটো গাড়ি খসে গেছে, অন্য পথ ধরেছে তারা।

পাঁচটা বাইশে ডানে বাঁক নিল সিরেনা। দু মিনিট পর রেডিও উলিসা ব্রিজে উঠে ওপারের উদ্দেশে ছুটল, শহরতলির দিকে। ওদের দুজনের মাঝে নতুন তিনটে ট্যাক্সি যোগ হওয়ায় ব্যবধান বেশ সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এখন। ওদিকে মার্সিডিজের সঙ্গে ব্যবধান কমে গেছে পবেদার, ওদের মাঝখানে একটিমাত্র প্রাইভেট কার।

রাস্তাটা বেশি চওড়া না হলেও সারফেস চমৎকার। অফিস ছুটি হওয়ার আগেই জমাট তুষারের ওপর বালি ছিটিয়ে দিয়ে গেছে কর্পোরেশনের স্যান্ড ক্যারিয়ার, ফলে গতি কমানোর প্রয়োজন পড়ছে না। প্রচণ্ড উত্তেজনায় গরম লেগে উঠল রানার। চট্ করে হিটার অফ করে দিল ও। এই সময় সিরেনার গতি কমতে আরম্ভ করল। পিছনের ডানদিকের ইন্ডিকেটর ফ্ল্যাশ করতে শুরু করেছে, ডানে ঘুরতে যাচ্ছে।

রানাও গতি কমাল। সামনে প্রকাণ্ড এক ফিলিং স্টেশন, স্ট্যান্ডে অনেকগুলো গাড়ি সার বেঁধে অপেক্ষা করছে ফুয়েল নেয়ার জন্যে। ওগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল সিরেনা। বাধ্য হয়ে স্টেশনের প্রাইভেট রাস্তায় উঠে এল রানা। বাঁয়ে ফিলিং স্টেশন, ডানে সার্ভিসিং লট। সেখানেও লম্বা সারি। উপায় না পেয়ে ওই সারিতে পবেদা সেঁধিয়ে দিল ও। সিরেনার সঙ্গে পবেদার ব্যবধান রইল গজ পঁচিশেক মত।

তবু ভাল। হাঁপ ছাড়ল মাসুদ রানা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটা বেশ অন্ধকার। এদিকে তাকালেও রানাকে দেখতে পাবে না কিরভ। এই সময় ওকে পাশ কাটাল মার্সিডিজ। নিঃশব্দে দাঁড়াল গিয়ে সিরেনার পিছনে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল কাপিস্তা কিরভ। সামনের সারির দিকে কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল।

তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অসহায় ভঙ্গি করে ঘুরে দাঁড়াল। মার্সিডিজটার ওপর চোখ পড়তে একটু থমকাল, যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গেল দৃষ্টি। মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে হাই তুলল লোকটা। তারপর পা বাড়াল। হাঁটার ছন্দে তার কালো ফার কোটের প্রান্ত দুলছে একটু একটু।

টারমাক পেরিয়ে স্টেশনের অন্য প্রান্তের একটি টেলিফোন বক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিরভ। আচরণে কোন ব্যস্ততা নেই তার। ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল সে। ওটা মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে ভাল করে মাড়িয়ে দিল, তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল বক্সে। তার বাঁ কাঁধ এবং মুখের এদিকটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে রানা ঘষা কাঁচের ওপাশে।

রিসিভার তুলেই নম্বর টিপতে আরম্ভ করল লোকটা। তার মানে পরিচিত নম্বর। ভুরু কোঁচকাল রানা। গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়বে কি না ভাবল। আশেপাশে কোথাও আড়াল নিয়ে দাঁড়ালে মন্দ হয় না। বলা যায় না ব্যাটা হয়ত আবার কোন বদ মতলব কার্যকর করতে যাচ্ছে। যদিও তার সম্ভাবনা কম, তবুও সাবধানের মার নেই।

নিঃশব্দে পবেদা ত্যাগ করল রানা। মার্সিডিজের দিকে তাকাল। আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরটা অন্ধকার। মাফলার দিয়ে ভাল করে মুখের নিচ পর্যন্ত পেঁচিয়ে নিয়ে পবেদার পিছন দিয়ে ঘুরে ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। এখানটা বেশ অন্ধকার। খানিকটা স্বস্তি বোধ করল রানা।

ফোন বক্সের দিকে চেয়ে থাকল একভাবে। ভেতরে কিরভের মাথার ওপর লম্বা স্ট্যাণ্ডের প্রান্তে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। বাইরের তুষারের গায়ে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিরভের আবছা কাঠামোটা দেখে মনে হল এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঝাড়া দু মিনিট কথা বলল। তারপর একবার সম্মতিসূচক মাথা দুলিয়ে ওয়াল মাউন্টেড ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার। বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়ির লাইনের দিকে তাকাল একবার। এখন খানিকটা কমেছে দৈর্ঘ্য। সামনেরগুলো এগিয়ে গেছে সিরেনাকে পিছনে রেখে।

গাড়িতে উঠে ফাঁকটা পূরণ করল কিরভ। আবার নেমে পড়ল। পায়ে পায়ে ওপাশের মেনস রূমে গিয়ে ঢুকল। কাজটা এখানেই সেরে ফেললে

কেমন হয়? ভাবল রানা, এবং বাতিলও করে দিল তা সঙ্গে সঙ্গে। অসম্ভব! কেবল ড্রাইভারদের হিসেব করলেও অন্তত জনা পঞ্চাশেক মানুষ আছে এখন স্টেশনে। কার কখন প্রকৃতির ডাক আসবে ঠিক নেই। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করাই ভাল।

বাঁ কানের ওপর থেকে মাফলার সরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে মনোযোগ দিল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের চড় খেল উষ্ণ গালে। পাত্তা দিল না ও। দাঁড়িয়ে থাকল কান খাড়া করে। নাহ্! কোন সাইরেনের আওয়াজ নেই পিছনে, বা রাস্তার সঙ্গে দ্রুত ধাবমান কোন স্নো চেইনের ঘর্ষণের আওয়াজও নেই। উত্তর এবং দক্ষিণমুখো ট্রাফিক নির্দিষ্ট একটা গতিতে ছুটছে যার-যার পথে। ওর মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে এক বা একাধিক ভলগা, অন্তত এখনই তা বোঝার উপায় নেই।

মিনিটখানেক পর গাড়িতে ফিরে এল কাপিস্তা কিরভ। কোনদিকে নজর নেই। সামনেটা এখন ফাঁকা। গাড়ি চালিয়ে সোজা পাম্পের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মার্সিডিজও এগোল। এর মধ্যে ওটার পিছনেও চার-পাঁচটা গাড়ি জুটে গেছে।

ঘুরে পবেদার এপাশে চলে এল রানা। শেষবারের মত কান খাড়া করে ট্রাফিকের আওয়াজ শুনল কয়েক সেকেন্ড। ঠিকই আছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুয়েলের দাম মেটাচ্ছে তখন কিরভ নগদ টাকায়। স্টেশনের এক অ্যাটেনডেন্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনে নিচ্ছে নোট। দ্রুত ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। স্টার্ট দিল।

ধীরগতিতে এক্সিটওয়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল সিরেনা, অপেক্ষা করতে লাগল। চলন্ত ট্রাফিকের মাঝে নাক ঢোকাবার মত ফাঁক চাই। গাড়ি পিছিয়ে নিল মাসুদ রানা। ফুয়েলের জন্যে অপেক্ষমাণ গাড়ির সারির পাশ ঘেঁষে কচ্ছপের মত এগোতে লাগল এক্সিটওয়ের দিকে। স্টেশনের অল্পবয়সী এক অ্যাটেনডেন্টকে বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখল রানা। চোখাচোখি হতেই হাত ইশারায় কিছু একটা বলল ছোকরা, সম্ভবত ফুয়েল না নিয়েই লাইন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কারণ জানতে চাইছে। সার্ভিস সেকশনের কেউ এসে না পড়লেই হয় এখন, ভাবল রানা। সে-ও একই প্রশ্ন করে বসতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে, এতক্ষণ অপেক্ষা করে সার্ভিসিং ছাড়াই কেন চলে যাচ্ছেন।

হাত নেড়ে রানাও ব্যস্ত ভঙ্গিতে তার উদ্দেশে কিছু একটা বলল, আসলে মুখ নাড়ল শুধু। কি বুঝল অ্যাটেনডেন্ট কে জানে, ঘুরে চলে গেল নিজের কাজে। ওদিকে ফাঁক একটা দেখতে পেয়েই এক্সিলারেটর চেপে ধরল কিরভ, সাঁ করে ঢুকে পড়ল গিয়ে ট্রাফিকের সারিতে।

প্রায় লাফিয়ে উঠে ছুটল রানার পবেদা, এক্সিটওয়ের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তুষার ছিটিয়ে। ব্যস্ত হয়ে আরেকটা গ্যাপ খুঁজছে ও গাড়ির স্রোতে। বেশি পিছিয়ে পড়লে বিপদ, সিরেনাকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা আছে। ভাগ্য ভাল, চার-পাঁচটা গাড়ির পরই পাওয়া গেল চওড়া এক গ্যাপ। ঢুকে পড়ল রানা

ওর মধ্যে। শিরদাঁড়া খাড়া। দৃষ্টি নেচে বেড়াচ্ছে ড্রাইভিং মিরর, সাইড রোড এবং সিরেনার ওপর।

বাঁক নিয়ে পুবদিকে চলেছে এখন কাপিস্তা কিরভ। সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা চোখে পড়ছে না। খালি চোখে যতটা সম্ভব চারদিকে সতর্ক নজর রেখে এগোচ্ছে রানা পিছন পিছন। কোন ভলগা নেই ওর আশপাশে, অন্তত দৃষ্টিসীমার মধ্যে। কোন ফ্ল্যাশলাইটের ঝলকও চোখে পড়ছে না। তার মানে পুলিসে নয়, আর কোথাও টেলিফোন করেছিল লোকটা।

কোথায়? কাকে? কাঁধ ঝাঁকাল রানা। হতে পারে স্ত্রীকে, বা কোন বন্ধুকে, অথবা কোন পেয়ারের মেয়েমানুষকে। হয়ত কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ফোনে জানিয়ে দিয়েছে আজ তা রক্ষা করা যাবে না, বা···বিরক্ত হয়ে চোখ রাঙাল রানা নিজেকে। এসব উল্টোপাল্টা ভাবনা-চিন্তার কোন অর্থ হয়? শুধু শুধু!

আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। কিছু ঘটার থাকলে এতক্ষণে ঘটে যেত। পেশীতে ঢিল পড়ল ওর। ড্রাইভিং মিররের দিকে নজর দিল। একটা ট্যাক্সির পরই লেপ্‌টে আছে মার্সিডিজ টু টোয়েন্টি। পাঁচটা সাতচল্লিশে গতি কমাল সিরেনা, ঢুকে পড়ল সাইড রোডে। একটা খুদে পার্কের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলল। রানাও গাড়ি ঘোরাল।

গজ বিশেক এগোবার পর আচমকা বাঁয়ে ঘুরে গেল সিরেনা, সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল একটা আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে। তার হেডলাইটের আলোয় মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল চওড়া প্রবেশপথ। একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের কার পার্ক ওটা।

রানা গতি কমাল না। একই গতিতে ব্লকটা পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল সামনে। খানিকটা গিয়ে গাড়ি ঘোরাল ও, গ্যারেজের প্রবেশপথের কাছে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে তাকাল রানা। এদিকে মুখ করে প্রায় একই দূরত্ব বজায় রেখে ব্লকের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মার্সিডিজ। ধারেকাছে মানুষজনের কোন সাড়া শব্দ নেই।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। তুষার মাড়িয়ে হন্ হন্ করে কার পার্কে এসে ঢুকল। চৌকো প্রবেশপথটা যেন কোন দানবের হাঁ করা মুখ। ডুবে আছে নিকষ কালো অন্ধকারে। নিজের সিলুয়েট আড়াল করার জন্যে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ভেতরে কোন আওয়াজ নেই, আগেই বন্ধ হয়ে গেছে সিরেনার এঞ্জিন।

হালকা পায়ে ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল এবার রানা। বন্ধ করে রেখেছে দম। অর্ধেক পথ পেরিয়ে এল ও, একটু একটু করে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে ততক্ষণে। পায়ের নিচে সমতল কংক্রিটের আভাস পেতে থেমে পড়ল রানা। রক্ত গরম হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে একটু একটু করে। দৃষ্টি যথাসম্ভব কেন্দ্রীভূত করে সামনে তাকাল রানা। প্রথমেই আবছাভাবে মোটা মোটা অসংখ্য কলাম চোখে পড়ল। সবচেয়ে কাছেরটা রয়েছে মাত্র দশ ফুট দূরে।

দেয়ালের আশ্রয় ছেড়ে ওটার দিকে পা বাড়াল রানা। উত্তেজনায় ছিলার মত টান টান হয়েছে দেহের প্রতিটি পেশী। মাঝপথ পর্যন্ত পৌঁছতেই একটা 'ঠক্' আওয়াজ কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল রানা। ওটা জুতোর শব্দ, কানে যাওয়ামাত্র টের পেয়ে গেছে মাসুদ রানা। পরক্ষণেই আবার 'ঠক্'। এদিকেই আসছে কেউ। কিরভ? বিশাল কার পার্কের চার দেয়ালে ঘা খেয়ে জোরাল প্রতিধ্বনি তুলছে পদশব্দ।

লাফ দিল রানা পিলারটার উদ্দেশে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা ফ্ল্যাশলাইট। সরাসরি মাসুদ রানার মুখের ওপর। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল আলোটা, মনে হল যেন আঁতকে উঠেছে ফ্ল্যাশলাইটধারী, ঝাঁকি খেয়ে গেছে হাত। জ্বলে উঠেই নিভে গেল আলো, পায়ের শব্দও থেমে গেছে। অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে, অতএব দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। নড়ছে না কাপিস্তা কিরভও। লুকোচুরি শেষ, ভাবল রানা। দেখে ফেলেছে ওকে লোকটা। এবার সামনাসামনি হওয়াই শ্রেয়।

চাপা স্বরে ডেকে উঠল রানা, 'কিরভ!'

গম গম করে উঠল ডাকটা। এ দেয়াল ও দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, '...ইরভ...ইরভ...ইরভ...ইরভ...।'

প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পিপিকে বেরিয়ে এসেছে রানার হাতে। বসে পড়ল ও ঝপ্ করে। বলা যায় না ও ব্যাটার কাছেও থাকতে পারে এ ধরনের কিছু, আতঙ্কিত হয়ে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে বসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য বিপদটা হবে কিরভেরই। অনুমানে গুলি ছুঁড়লে তার মিস করার চান্স আছে। কিন্তু রানা করবে না। লোকটা গুলি করামাত্র রানাও পাল্টা ট্রিগার টানবে তার গান মাজলের ফ্ল্যাশ সই করে এবং নিঃসন্দেহে গুলিবিদ্ধ হবে কিরভ।

স্থির হয়ে বসে আছে রানা। মুখ তুলে চেয়ে আছে সামনের অনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে। একটু আগে কিরভকে ঠিক যেখানটায় দেখা গেছে, সেদিকে তাক্ করে রেখেছে ডান কান। গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেরও যেমন বিশেষ জ্যোতি থাকে, ওর মাঝেও যেমন সামান্য হলেও কিছু না কিছু দেখা যায়, তেমনি নৈঃশব্দেরও আসলে শব্দ আছে। কান পাতলে ওর মধ্যে থেকেও কিছু না কিছু আওয়াজ কানে আসে।

সেরকম কিছু শোনার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা। ওর ডান কানের ছিদ্রপথ দিয়ে মস্তিষ্কের বাঁ গোলার্ধে পৌঁছুচ্ছে নানা রকম আওয়াজ, যেখানে প্রকৃতির নিয়মে এলোমেলো হাজারো শব্দের মধ্যে থেকে প্রার্থিত শব্দটি পরিশোধিত হয়, বাছাই হয়। হাজারো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেল দ্বারা গঠিত এই শ্রবণেন্দ্রিয় প্রথমে ফিল্টার করে আওয়াজ, তারপর বিশ্লেষণ শেষে কনফার্ম করে। সবশেষে কম্যান্ড সেল জানান দেয়–এটাই সেই আওয়াজ, যা শোনার প্রতীক্ষায় আছ তুমি!

ঝাড়া এক মিনিট বসে থাকল মাসুদ রানা। কিন্তু না, মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কোন শব্দ নেই। কার পার্কের প্রবেশ পথের সামনে দিয়ে সশব্দে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল একটা গাড়ি। ওটার মোটরের গুঞ্জন ভেতরের

অসংখ্য কংক্রিটের কলামের গায়ে আছড়ে পড়ে অদ্ভুত এক শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করল।

'কিরভ!' আবার হাঁক ছাড়ল রানা। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। 'তোমার সাথে কথা আছে আমার, কমরেড!'

নিজের গলা নিজের কানেই বিচ্ছিরি কর্কশ শোনাল। আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পা বাড়াল ও সময় নিয়ে। দীর্ঘ, বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে নিজের ডানদিকে সরে যেতে আরম্ভ করল। পায়ের বাইরের দিকের কিনারা দিয়ে মাটি স্পর্শ করছে রানা যাতে কংক্রিটের সঙ্গে জুতোর সোলের সরাসরি সংযোগ না ঘটে, আওয়াজ না হয়। কিরভের আনুমানিক অবস্থান ঘুরে তার পিছনদিকে যেতে চায় ও। তাতে প্রবেশপথের আবছা আলোয় কিরভের কাঠামোটা দেখা গেলেও যেতে পারে।

দশ কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আন্দাজ ওর পনেরো ফুটের মধ্যেই আছে এখন লোকটা। অবশ্য যদি জায়গা ছেড়ে সরে না গিয়ে থাকে। রানার কান বাঁচিয়ে কিছুটা হলেও সরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সে একটু আগে গাড়িটা যাওয়ার সময়। হয়ত সুযোগটা নেয়নি সে, হয়ত বা নিয়েছে। ব্যাপারটা নির্ভর করে লোকটা কতটা উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী তার ওপর। আবার ডান পা তুলল মাসুদ রানা, এই সময় মোটা কাপড়ের মৃদু 'খশ্' আওয়াজ কানে এল। খুব কাছেই।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল ও শব্দের উৎসের দিকে, ওয়ালথার ধরা ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে। কিন্তু ওই একবারই উঠল শব্দটা, তারপর আবার নীরবতা। চক্করটা দ্রুত শেষ করার তাগিদ অনুভব করল মাসুদ রানা। এভাবে অকাজে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হচ্ছে না। কিরভও সেই চেষ্টা করছে না তো? ভাবল ও, কি ধরনের ট্রেনিং নেয়া আছে তার? আচমকা প্রাণঘাতী আঘাত করার, বা···।

হঠাৎ করে খুলির পিছনদিকের চামড়া টান টান হয়ে গেল রানার, দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো খাটো চুলগুলো। মনে হল একেবারে কাছেই, ওর মাত্র কয়েক হাত তফাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কাপিস্তা কিরভ। দূর! আস্তে আস্তে মাথা ঝাড়া দিল মাসুদ রানা। এ আসলে দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোনকিছুর প্রতীক্ষার ফল।

ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলো। এক ডিগ্রি এক ডিগ্রি করে বিভ্রান্ত হতে আরম্ভ করেছে শ্রবণেন্দ্রিয়। লক্ষণটা সুবিধের নয়। যেদিকে আওয়াজ ওঠার কোন কারণ নেই সেদিক থেকেই আওয়াজ আসছে বলে মনে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে বাঁ দিক থেকে চাপা দম ফেলার আওয়াজ উঠল। সাঁৎ করে হাত বাড়াল রানা। কিন্তু নেই সে। শূন্যে পাক খেয়ে ঘুরে এল হাতটা, বাধল না কিছুতেই। ভুল শুনেছে, নিজেকে বোঝাল রানা। ও যেমন নিঃশ্বাসের শব্দ চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে, কিরভও তেমনি। অতএব প্রশ্নই আসে না আওয়াজ ওঠার।

আবার দু পা এগোল রানা। হাতে বাধল কর্কশ পিলারটা। খানিকটা

নিশ্চিত হওয়া গেল, ওটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও। গেল কোথায় কিরভ? আছে তো, না পালিয়েছে? ঘুরে কলামের ওপাশে যেতে চাইল রানা, দু পা এগোতেই ধাক্কা খেল নরম কিছুর সঙ্গে। চাপা 'হুঁক্' শব্দ কানে এল। কিরভের গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে ও। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

দ্রুত বাঁ হাত বাড়াল রানা। খপ্ করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল তার উলেন স্কার্ফ। হাত চালাল কিরভও, ফ্ল্যাশলাইটটা দিয়ে 'ঠাশ্' করে মেরে বসল ওর মাথার পাশে। মাথা ঘুরে উঠল, কিন্তু দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরে সহ্য করার চেষ্টা করল রানা, ছাড়ল না স্কার্ফ। আবার হাত তুলেছে লোকটা, বুঝতে পেরে ঝট্ করে মাথা নিচু করল ও। ঠিকই, ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটটা।

'আমার হাতে পিস্তল আছে, কিরভ!' দ্রুত বলে উঠল রানা। একই সঙ্গে পায়ের পিছনে পা বাধিয়ে দড়াম করে শানের ওপর আছড়ে ফেলল কিরভকে। কিন্তু কাজ হল না তাতে। খুব সম্ভব রানার সতর্কবাণী কানেই যায়নি তার। ফ্ল্যাশলাইট ফেলে দু হাতে রানার দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে নিচের দিকে আকর্ষণ করল ওকে। এবার তার ঘাড়ের পাশে মাঝারি একটা কারাতের কোপ বসিয়ে দিল রানা। বেশ কাজ হল ওতে। থেমে গেল কিরভের নড়াচড়া। পায়ের সঙ্গে কি যেন বাধল এইসময় রানার। কিরভের স্কার্ফ ছেড়ে চট্ করে জিনিসটা তুলে নিল রানা। ওরই ফ্ল্যাশলাইট।

ওটা তুলে নিয়েই সুইচ টিপে দিল। অত্যুজ্জ্বল আলোয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সামলে নিয়ে অস্ত্রটা আলোর সামনে নিয়ে এল রানা লোকটাকে দেখাবার জন্যে। 'নড়ো না, কিরভ,' কঠিন গলায় বলল ও, 'এবার সত্যিই গুলি করব আমি।'

চোখ কপালে উঠল কাপিস্তা কিরভের। আধশোয়া অবস্থায় জমে গেল লোকটা। মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওয়ালথারের ধাতব কালচে নলের দিকে। লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে ওটা, একচুল কাঁপছে না রানার হাত।

পিছনে মৃদু পায়ের শব্দ উঠল। রানার পাশে এসে দাঁড়াল হ্যারল্ড টিলসন। এক পলক কিরভের মুখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, 'হ্যাঁ। এই সেই। একেই সেদিন দেখেছি জামানের সাথে।'

তিন

লোকটাকে সামাল দেয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। বারবার ঝট্কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কয়েকবার বোঝাবার পরও যখন বাগে এল না, রানার কোন কথাই কানে নিল না, বিরক্ত হয়ে পড়ল রানা। বাঁ হাতের আঙুলগুলো ভাঁজ করে শক্ত গাঁট দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল তার মেডিয়াল

নার্ভের ওপর।

খুব একটা জোর ছিল না মারটায়। তারপরও যেটুকু ছিল, যে কাউকে অন্তত মিনিট দুয়েকের জন্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলার জন্যে যথেষ্ট। হলও তাই। লাফালাফি বন্ধ হয়ে গেল লোকটার। চোয়াল ঝুলে পড়ল, হাত-পা ছেড়ে ধপ্ করে বসে পড়ল সে মাটিতে। সম্ভবত এরপরই সত্যিকার বোধোদয় হল তার যে আসলেই বেকায়দায় পড়েছে সে।

একসময় ধীরে ধীরে কেটে যেতে আরম্ভ করল আঘাতের প্রতিক্রিয়া। ঘোলা দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এল কিরভের। ব্যথা পাওয়া স্থানে হাত বোলাতে লাগল মুখ বিকৃত করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার রানা আরেকবার টিলসনের দিকে তাকাচ্ছে।

'কারা আপনারা? আমার সঙ্গে কিসের কথা আপনাদের?' হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

নরম সুরে বলল রানা, 'কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার। তুমি তার উত্তর দেবে।' সার্চ করল লোকটাকে। কিছু নেই সঙ্গে। নিরস্ত্র।

'কিসের প্রশ্ন?'

'আমি কে, তুমি জানো?'

'না।'

'জানো না?'

'বললাম তো, না।'

'বেশ, মানলাম। সেদিন তাহলে আমার পিছনে কেজিবি লেলিয়ে দিয়েছিলে কেন?'

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অনুসরণ করছিলেন আপনি আমাকে। তাই ভয় পেয়ে গিয়ে...'

'মিথ্যে কথা! আবার বলো,' দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ভাবল, হদ্দ ত্যাঁদোড় তো হারামজাদা! একেকটা প্রশ্ন দুবার তিনবার করে করতে হচ্ছে! নতুন করে একবার রিমাইন্ডার দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হল ও।

'বললাম তো! বিশ্বাস...'

মারল রানা। সোলার প্লেক্সাসে। সোজা আঙুলের প্রচণ্ড আঘাতটা খেয়ে গুঙিয়ে উঠল কিরভ। বসা ছিল, ঝট্ করে দু ভাঁজ হয়ে গেল। শানের ওপর আছড়ে পড়ল দেহটা কাত হয়ে। কিন্তু সময় নষ্ট করার সময় দিল না রানা লোকটাকে। চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে বসাল, নাকের নিচে ঠেসে ধরল ওয়ালথারের ঠাণ্ডা মাজল্।

'ঠিক করে বলো, আমার ব্যাপারে কি বলেছিলে তুমি ওদের।'

'ফোন করেছিলাম আমি আমার স্ত্রীকে।'

'সে তো আজ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মাসুদ রানা। 'আমি বলছি গত বুধবারের কথা। প্লেভনা মেট্রো স্টেশনের কাছের এক ফোন বক্স থেকে কেজিবিকে ফোন করেছিলে তুমি, মনে পড়ে?'

চুপ করে বসে থাকল কিরভ। উত্তর দিল না।

'বলো!' ধমকে উঠল রানা।

'তেমন কিছুই বলিনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করছিলেন, কেবল এই কথাটাই বলেছি। এটা কোন অন্যায় নয়।'

সময় নষ্ট করছে লোকটা, বুঝতে পারল রানা। যে-কোন মুহূর্তে আর কোন গাড়ি এসে ঢুকতে পারে পার্কে, জটিল হয়ে উঠতে পারে পরিস্থিতি। সামাল দেয়া হয়ত কঠিন হয়ে পড়বে তখন রানার একার পক্ষে। মিনিট পাঁচেক আগে টিলসন ফিরে গেছে। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা তার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে। এমনিতেই ইংরেজদের দেখতে পারে না রাশানরা, কোনমতে সামান্যতম ছুতোও যদি আবিষ্কার করতে পারে ওর বিরুদ্ধে, লাথি মেরে বের করে দেবে দেশ থেকে। টিলসনের প্রয়োজন ছিল কাছ থেকে কিরভকে এক নজর দেখা এবং রানাকে তার ব্যাপারে নিশ্চিত করা। কাজটা সারা হতে আর দেরি করেনি সে।

'শুধু ওই কটা কথা বলতে মিনিটের পর মিনিট লাগে না, কিরভ। একবার যখন নাগাল পেয়েছি, তখন তোমার মুক্তি নেই আমার হাত থেকে। বলতেই হবে সব। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, এখনও সময় আছে, বলে ফেলো।'

আবার মুখে ছিপি আঁটল লোকটা।

'জীবনে কোনদিন আমাকে দেখোনি তুমি। স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে তোমার কোন শত্রুতা থাকার কথা নয়। অথচ সেদিন তুমি যা করেছ...'

'আমি করিনি,' রানাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল কিরভ।

'তার মানে?' একটু থমকাল ও। 'তুমি করোনি বলতে কি বোঝাতে চাইছ?'

'আমি...আমি কেবল,' একটা ঢোঁক গিলল কিরভ। 'আমি শুধু নির্দেশ পালন করেছি।'

'কার নির্দেশ, কিসের নির্দেশ!' বিস্মিত দৃষ্টিতে তার শ্মশ্রুমণ্ডিত নত মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা। উত্তর না পেয়ে খানিক বিরতি দিয়ে পরপর আরও দু বার করল একই প্রশ্ন। কিন্তু কাজ হল না। খেপে উঠল রানা। চট্ করে অস্ত্রটা হাত বদল করে নিয়েই ডান হাতের কিনারা দিয়ে কিরভের বাঁ বাহুর মাঝ বরাবর কারাতের এক শক্ত কোপ বসিয়ে দিল।

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল কিরভ। অন্যহাতে চোট পাওয়া জায়গাটা মুঠো করে ধরে সেজদার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে গেল আপনাআপনি। দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করতে লাগল সে। বিকট লাগছে চেহারাটা।

লোকটিকে খানিকটা সামলে ওঠার সময় দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা, 'কিরভ, আমি চাই বর্তমান পরিস্থিতি যে তোমার অনুকূলে নেই তা অনুধাবন করার চেষ্টা করবে তুমি। খালি হাতেই কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমাকে নরক দেখিয়ে আনতে পারি আমি, সে ট্রেনিং আমার আছে। একই উপায়ে আমি যা যা জানতে চাই তাও বের করে আনতে পারি তোমার পেটের ভেতর থেকে। কিন্তু তার ফলে জন্মের মত পঙ্গু হয়ে যেতে পারো তুমি। অতটা কঠোর আমি হতে চাই না।'

খানিকটা সিধে হয়েছে এখন কিরভের দেহটা। বাঁ হাত ঘন ঘন ঝাড়া দিয়ে অসাড় ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করছে। ডান হাতে আঘাত করাই স্বাভাবিক হত, কিন্তু রানা তা করেনি ইচ্ছে করেই। কিরভের 'নির্দেশদাতার' কাছে যাওয়ার ইচ্ছে আছে ওর। ঠিকানাটা বের করা গেলে ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে কিরভকে দিয়েই গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা করবে রানা। এবং সে জন্যে ডান হাতটা সুস্থ থাকার প্রয়োজন আছে।

'সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না আমি,' আবার বলল ও। 'খামোকা এভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো কেন?' আচমকা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। 'তোমার ছেলেমেয়ে আছে, কিরভ?'

'হ্যাঁ,' বিস্মিত হল লোকটা। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বুঝতে পারছে না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল।

'কয় ছেলেমেয়ে?' আগের চাইতে আরও মোলায়েম কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'দুই মেয়ে। এক ছেলে।'

'ভাল। তুমি কি চাও বাকি জীবনটা তোমার হুইল চেয়ারে কাটুক? ছেলেমেয়েরা ঠেলুক সে চেয়ার, বা মুখে তুলে খাইয়ে দিক তোমাকে তিন বেলা?'

আরেকটা গাড়ি চলে গেল কার পার্কের সামনে দিয়ে। হেডলাইটের আভায় মুহূর্তের জন্যে খানিকটা আলোকিত হয়ে উঠল ভেতরটা। আশ্বস্ত হল রানা এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে। ও চায় না হাতের কাজটা শেষ হওয়ার আগে কেউ এসে পড়ে।

'যদি না চাও তো বলে ফেলো। কে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিল আমাকে ধরিয়ে দিতে?'

শব্দ করে ঘন ঘন দম নিচ্ছে কিরভ, যা ওর মত বয়সী লোকের জন্যে অস্বাভাবিক। অবশ্য কিরভ বেশ মোটা, তাছাড়া এ মুহূর্তে ওর মধ্যে ভয় আতঙ্ক উত্তেজনা ইত্যাদি বিরাজ করছে। ফলে এটা স্বাভাবিক।

'বলো, কিরভ। এখনও প্রায় কিছুই করিনি আমি তোমার। এখনও তোমার মুখে বা কুঁচকিতে হাত লাগাইনি। কিন্তু পরেরবার ওই দুই জায়গার বারোটা বাজাব আমি। বলো কে নির্দেশ দিয়েছিল।'

বিড়বিড় করে একটা নাম উচ্চারণ করল লোকটা। খানিকটা কেঁপেও গেছে কণ্ঠ বলার সময়। বুঝতে পারল না মাসুদ রানা। 'কে? আবার বলো।'

'আলেকজান্ডার।'

'আলেকজান্ডার?'

'হ্যাঁ।' চাবি দেয়া পুতুলের মত অন্যমনস্কভাবে অনবরত মাথা দোলাতে লাগল লোকটা। আবার বলল, 'হ্যাঁ।'

আচমকা আলোকিত হয়ে উঠল পার্কের ভেতরটা। গাড়ি ঢুকছে ভেতরে। র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এল গাড়িটা, একটা কার। কিরভ সুযোগটা টের পাওয়ার আগেই লাফ দিয়েছে রানা, ঘুরে পিছনে চলে গেছে তার। বাঁ হাতে লোকটার

গলা পেঁচিয়ে ধরল ও আলতো করে, ওয়ালথার ঠেকাল মাথার পাশে। চাপা কণ্ঠে বলল, 'কোন শব্দ নয়। একদম চুপ!'

এদিকে এল না গাড়িটা। সোজা নেমে গিয়ে দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন এবং হেডলাইট। ক্যাঁচ কোঁচ বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল স্প্রিঙের, সামনের দুটো দরজাই খুলে গেল। চালক এপাশে, তার হাতে একটা খুদে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল। মাটিতে পা রেখে সিধে হল দুটো আবছা মূর্তি। 'ধাম্' 'ধাম্' বন্ধ হল দরজা।

'আজ যদি কিরভ আসে', বলে উঠল তাদের একজন। 'ব্যাটাকে খসাতেই হবে যে করে হোক। শালা রোজ জিতে যায়।'

'ওকে খসানো মুশকিল,' বলল অন্যজন। 'ওর কার্ড-ভাগ্য খুব ভাল।'

কোনদিকে তাকাল না লোক দুটো। গল্প করতে করতে পা বাড়াল উল্টোদিকে। ওদের আলোয় ভবনটির এক কোণে ছোট একটা সিঁড়ি দেখতে পেল মাসুদ রানা। ওরই পাশে একটা ফোন বক্সও দেখা গেল। ভালই, ভাবল রানা, ওটার প্রয়োজন পড়তে পারে। এতক্ষণ দেখেনি ও বক্সটা। সিঁড়িটা লোহার, ভারী জুতো দিয়ে ওটা মাড়িয়ে ঠং ঠং শব্দে উঠে গেল লোক দুটো।

'তোমার ওয়ালেট বের করো,' পিস্তল দিয়ে মৃদু চাপ দিল রানা কিরভের কপালের পাশে। তার এখানে আগমনের কারণ জানতে চাওয়ার আর দরকার হল না।

'কেন?'

'চোপ! যা বলছি করো!'

কোটের ভেতরের পকেটে হাত ভরে দিল লোকটা। টর্চটা সামান্য উঁচু করল রানা, যাতে ওটার কার্যকলাপ পরিষ্কার দেখা যায়। পেটমোটা চামড়ার ব্যাগটা বের করে মেঝেতে রাখল কিরভ, দু পা মুড়ে আসন করে বসল।

'কি কি আছে ভেতরে বের করো,' আবার নির্দেশ দিল রানা।

একটা পার্টি মেম্বারশিপ কার্ড এবং আইডেন্টিটি কার্ড বেরোল প্রথমে। পরেরটায়, তার নামের নিচে লেখা: অফিশিয়াল ড্রাইভার টু দ্য পলিটব্যুরো। এছাড়া চীফ কন্ট্রোলার অভ দ্য ভেহিকুলার মুভমেন্টস-এর অফিস থেকে তার নামে ইস্যু করা একটা স্পেশাল ট্রাফিক পাসও আছে। যাতে কিরভের ক্রেমলিন এবং মস্কোর বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়ার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। কিন্তু রানা যা আশা করছিল; কোন টেলিফোন ইনডেক্স বা অ্যাড্রেস বুক, কিছুই পাওয়া গেল না।

ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'আমরা এখন ওই ফোন বক্সে যাব।' অস্ত্র নাচিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল তাকে। 'আলেকজান্ডারকে ফোন করবে তুমি।' দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'তার ফোন নম্বর জানি না।' গোঁজ হয়ে বসে থাকল কিরভ।

'নিশ্চই জানো। জলদি ওঠো। নইলে এক লাথি মেরে মেরুদণ্ড ভেঙে দেব।'

এবার উঠল সে। মৃদু মৃদু দুলতে লাগল ভারী দেহটা, বাঁ বাহু চেপে ধরে

আছে এখনও।

'এগোও!' হাঁটু দিয়ে তার নিতম্বে মাঝারিগোছের একটা গুঁতো মারল মাসুদ রানা। 'আলেকজান্ডারকে বলবে তুমি তার সাথে দেখা করতে চাও।'

'কিন্তু···,'

'বলবে অত্যন্ত জরুরী। গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে।'

'তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে আগে সময় নির্ধারণ করে নিতে হয়। চাইলেই দেখা করা যায় না। নিষেধ আছে।'

'ওটাই করতে যাচ্ছো তুমি।' লোকটাকে সামনে নিয়ে বক্সের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজা মেলে ধরতে ভেতরে অল্প ওয়াটের ঘোলাটে একটা বাল্ব জ্বলে উঠল। দুই কোপেকের একটা মুদ্রা বের করল রানা পকেট হাতড়ে। ওটা স্লটে ফেলে রিসিভার তুলে বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। তারপর বলল, 'নাও, রিঙ করো। তবে কথা বলার সময় এই পিস্তল আর হুইলচেয়ারের কথা মনে রেখো। যথেষ্ট ঝামেলা করেছ এ পর্যন্ত, আর করতে যেয়ো না। সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দয়ামায়া দেখাব না আমি।'

রিসিভার নিল লোকটা। শূন্য দৃষ্টিতে টেলিফোনের পাশে ঝোলানো নির্দেশাবলী লেখা বোর্ডটার দিকে চেয়ে থাকল। যেন খুব মন দিয়ে পড়ছে। কি চিন্তা করছে ব্যাটা? ভাবল রানা, কি উপায়ে আলেকজান্ডারকে সতর্ক করে দেয়া যায়? অধৈর্যর মত মেঝেতে জুতো ঘষল ও, 'চুক্' করে বিরক্তিসূচক আওয়াজ তুলল মুখ দিয়ে। বোঝাতে চায় খেপে উঠছে।

সচকিত হল কিরভ। ঘাড় ঘুরিয়ে রানার মুখের দিকে তাকাল। সিলিঙের দিকে তাক করে ধরল রানা টর্চলাইটের ফোকাস যাতে ওর মুখটা ভাল করে দেখতে পায় সে। কি দেখল লোকটা রানার চেহারায় সে-ই জানে, তাড়াতাড়ি নম্বর টিপতে শুরু করল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকল রানা বাটন বোর্ডের দিকে। সাত সংখ্যার নম্বরটা মুখস্থ হয়ে গেল একবার দেখেই।

ও প্রান্তের সাড়া পেয়ে বলল কিরভ, 'জয়া? আমি কিরভ। তাকে বলো আমি দেখা করতে আসছি। খুব জরুরী।'

খানিকটা এগিয়ে দাঁড়াল রানা। মাউথপীসের ভেতর দিয়ে অল্পবয়সী এক মেয়ের কণ্ঠ ভেসে এল অল্প অল্প। কণ্ঠ শুনেই মেয়েটি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হয়ে গেল। জোরালো, কর্তৃত্বপূর্ণ গলা-নিশ্চয়ই কর্তা গোছের কেউ হবে।

'এখনই আসতে চাও?' প্রশ্ন করল সে।

চোখের কিনারা দিয়ে রানাকে দ্রুত 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়তে দেখল কিরভ। বলল, 'হ্যাঁ। এখনই।'

সন্দিহান হয়ে উঠল মেয়েটি। 'কি ব্যাপার, কোন গণ্ডগোল?'

'অ্যাঁ? না না, সেসব কিছু না।'

'আচ্ছা, বেশ। চলে এসো। আমি জানাচ্ছি তাকে।'

খেয়াল করেছে রানা, দুজনের একজনও নাম নিল না আলেকজান্ডারের। রিসিভার রেখে দিল লোকটা। এই শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পেল রানা।

ঠেলে গুঁতিয়ে সিরেনার পাশে নিয়ে এল ও তাকে। 'চলো। সফরটা তোমার গাড়ি নিয়েই সারা যাক।' কিরভকে ড্রাইভিং সীটে বসিয়ে রানা বসল তার পাশে। 'স্টার্ট দাও।' ওয়ালথারের নল দিয়ে ইগনিশন কী-হোল দেখাল ও। 'কুইক!'

মুখের ঘাম মুছে নিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করল কিরভ। স্টার্ট নিল সিরেনা। গিয়ার দিতে যাবে, এই সময় তার পাঁজরে অস্ত্রটা দিয়ে খোঁচা মারল রানা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। থমথমে গলায় বলল, 'কিরভ, পথে যদি কোনভাবে পুলিস বা মিলিশিয়ার দৃষ্টি আকষর্ণের চেষ্টা করেছ, সাথে সাথে তোমার প্রাণ কেড়ে নেবে এর একটা বুলেট। বোঝা গেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সে।

'গুড। গাড়ি ছাড়ো।'

কিরভের দিকে খানিকটা ঘুরে বসল রানা। গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠে এল কিরভ। রওনা হয়ে গেল। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের পবেদার দিকে তাকাল ও একবার। এর মধ্যেই প্রচুর তুষার জমে গেছে ওটার সারা দেহে। আরও জমুক, ভাবল রানা। পরে দেখা যাবে। ত্রিশ সেকেন্ড এগোতেই বড় রাস্তায় পড়ল সিরেনা, সোজা পশ্চিমে ছুটল।

একনাগাড়ে মিনিট দশেক চলার পর মুখ খুলল রানা। ততক্ষণে সেই ফিলিং স্টেশন পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। সামনে আলো ঝলমলে রেডিও উলিসা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। 'ছেলে-মেয়েদের নাম কি রেখেছ?'

'ম্যালেনকভ, মিশা আর তিশা।'

রাস্তা অনেক ফাঁকা এখন। গাড়ির চাপ কমে গেছে। মাঝারি গতির চাইতে কিছু জোরে চলছে সিরেনা। ব্রিজ পেরিয়ে কাযাকভ উলিসায় এসে পড়ল।

'প্যাভিলনে থাকে তোমাদের আলেকজাণ্ডার, তাই না?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল রানা। 'সেদিন যেখানে গিয়েছিলে তুমি?'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিরভ। আড়চোখে রানার দিকে তাকাল চকিতে। 'হ্যাঁ।'

সামনে লাল সঙ্কেত দেখে গাড়ি দাঁড় করাল ভ্যালেরি। দুতিন সেকেন্ড যেতে না যেতেই পাল্টে গেল আলোটা। কে এই আলেকজান্ডার? ভাবছে রানা, তাকে ধরতে পারলে কি জামান শেখের হদিস পাওয়া যাবে? গিয়ার দেয়ার শব্দে চমক ভাঙল ওর। পাশে তাকাল। ওর দিকেই চেয়ে ছিল এতক্ষণ কিরভ, মুখ ঘুরিয়ে নিল চোখাচোখি হতে।

'স্ত্রীর নাম কি তোমার।' জায়গামত পৌঁছার আগে ব্যাটার বিহিত করতে হবে, ভাবল ও।

ভুরু কুঁচকে উঠল লোকটার, মনে হল যেন এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করছে না। 'ভেলডা।'

'কি করে ভেলডা?'

'সিটি আর্টস সেন্টারের ব্যালে টীচার।'

'তোমার ছেলে-মেয়েরাও নাচ শেখে তার কাছে?'

'মেয়ে দুটো শেখে।' কোনদিকে গড়াচ্ছে আলোচনা অনুমান করতে পারছে না কিরভ। অস্বস্তিতে ভুগছে।

প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা জায়গামত। সামনের বাঁকটা ঘুরলেই চোখে পড়বে প্যাভিলন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস।

'বৌ-বাচ্চাদের আবার দেখার ইচ্ছে আছে নিশ্চই তোমার?' বেশ গম্ভীর এবার রানা।

দম বন্ধ হয়ে এল কিরভের। 'হ্যাঁ,' আবেগমাখা গলায় প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল সে, 'আছে, আছে।'

'ওটাই স্বাভাবিক,' দার্শনিকের মতো মাথা দোলাল রানা। 'গাড়ি রাখো।'

'কি?'

'গাড়ি থামাও রাস্তার পাশে।' চারদিক মোটামুটি নির্জন দেখে এখানেই কাজটা সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

বেশ অবাক হল কিরভ এ ধরনের নির্দেশে। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল সিরেনা।

'হেডলাইট অফ করে দাও। এঞ্জিন চালু থাকুক।'

তাই করল লোকটা। রানার দিকে তাকাল। 'এবার?'

'তোমার স্কার্ফ খোলো।'

দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় পড়ে গেল এবার কিরভ। গলা পর্যন্ত হাত তুলেও নামিয়ে আনল আবার। মিন মিন করে বলল, 'এই ঠাণ্ডায়…,'

'শাট্ আপ!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম, এর মধ্যে… ।' বলতে বলতে ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করল ও।

আওয়াজটা কানে যেতে কেঁপে উঠল কিরভ। খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে অন্তরাত্মা। কাঁপা হাতে দ্রুত স্কার্ফের প্যাঁচ খুলতে আরম্ভ করল সে। পুরোটা খোলা হতে ওটা রানার দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, মাথা নেড়ে তাকে নিরস্ত করল ও। স্কার্ফটার দৈর্ঘ্য বেশ সন্তোষজনক, কম করেও চার হাত। 'ওটা দিয়ে নিজের দুই পা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলো শক্ত করে,' বলল ও।

অর্থটা বোধগম্য হল না কিরভের। আহাম্মকের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল রানার দিকে। দ্বিতীয়বার একই নির্দেশ দিল ও। এইবার বুঝল কিরভ, লেগে পড়ল কাজে। রানার কথামত এক পায়ের ওপর অন্য পায়ের গোড়ালি তুলে দিয়ে ঝুঁকে বসে বাঁধতে শুরু করল। কাজ শেষ হতে বাঁধনটা টেনেটুনে পরখ করে দেখল রানা-ঠিকই আছে।

এবার তাকে ওর দিকে পিছন ফিরে বসতে বলল। ভয়ে ভয়ে পাশ ফিরল কিরভ। জানালার দিকে মুখ করে বসল। 'ভয় নেই,' তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল রানা। 'যতক্ষণ আমার কথামত চলবে, ততক্ষণ কোন ক্ষতি হবে না তোমার। নাও, এবার গ্রেটকোটের ওপরদিকের তিনটে বোতাম খুলে ফেলো।'

কাজটা সারা হতেই নতুন নির্দেশ। 'দুহাত পিছনে নিয়ে এসো।' তাই

করল কিরভ। এবার এক এক করে কোটের দুই হাতাই টেনে নামিয়ে দিল রানা। টান খেয়ে কোট ফাঁক হয়ে গেল বুকের কাছে, ল্যাপেল দুটো দুই কাঁধ বেয়ে গড়িয়ে নেমে এসে ঠেকল মাঝ বাহুতে। টেনে দেখল রানা, আর নামছে না, পেটের কাছে আটকে গেছে চতুর্থ বোতামে। ওদিকে কিরভের দু হাত কনুই পর্যন্ত ঢুকে গেছে হাতার ভেতরে। ঢিলা দুই হাতার প্রান্ত এক করে শক্ত একটা গিঁঠ দিয়ে ছেড়ে দিল মাসুদ রানা এবার। মামলা খতম। দড়ির বাঁধনের চাইতেও বেশি কার্যকর এ বাঁধন।

কিরভকে সিধে করে বসিয়ে দিল এবার রানা। তারপর নেমে দাঁড়াল রাস্তায়। কাঁধ ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল তাকে ওর জায়গায়। অনেকটা আধশোয়া অবস্থায় পড়ে থাকল লোকটা। সামনে দিয়ে ঘুরে ড্রাইভিং সীটে এসে বসল রানা। হিটার চালুই ছিল, ওটার লিভার টেনে শেষ প্রান্তে নিয়ে এল। ক্রমেই আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ভেতরের পরিবেশ। কিরভের যাতে ঠাণ্ডা লেগে না যায়, সে জন্যে এই ব্যবস্থা। সবশেষে রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলা হল তার মুখ।

হেডলাইট জ্বেলে দিল রানা সিরেনার। রওনা হয়ে গেল বাঁকটার উদ্দেশে। দু মিনিট লাগল প্যাভিলনের সামনে পৌঁছতে।

ঘুরে বিল্ডিঙটার পিছনে চলে এল রানা। কাছাকাছি আরও দু তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পার্কে। ওদের থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় সিরেনা দাঁড় করাল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে আলো নেভাতে যাবে, এই সময় থমকে গেল। বিল্ডিঙের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ একটা দেহ। চোখে পড়ামাত্রই চিনল রানা তাকে।

বিসিআইয়ের নিখোঁজ মস্কো এআইপি ও, জামান শেখ।

চার

এদিকেই আসছে জামান শেখ। হাঁ করে চেয়ে থাকল রানা তার দিকে। বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় লোপ পেয়ে গেছে বুদ্ধি। জামান শেখ···জামান এখানে কেন? কিরভ কি···। ঝট্ করে পাশ ফিরল রানা। থাবা দিয়ে খুলে ফেলল কিরভের মুখের বাঁধন। 'এই লোক···।' আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে থেমে গেল।

'আলেকজান্ডার,' বলল কিরভ।

শব্দটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিরশিরে একটা অনুভূতির সৃষ্টি হল রানার দেহে। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা কিছু একটা নেমে গেল নিচের দিকে। আলেকজান্ডার! ভাবছে রানা, জামান শেখ? ও-ই কিরভকে নির্দেশ দিয়েছিল রানাকে ধরিয়ে দিতে?

জামান তখন পৌঁছে গেছে সিরেনার পাঁচ গজের মধ্যে। হেডলাইট অফ

করা হয়নি। সে আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা জামানের মুখের হাসি। কিছু চিন্তা না করেই দরজা খুলে ফেলল ও, নেমে পড়ল আসন ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল জামান। অপলক কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল রানার দিকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কিছু একটা চিন্তা করছে।

'আপনি···?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রুশ বলে উঠল জামান। রানার মনে হল এখনও যেন পুরোপুরি চিনতে পারেনি সে ওকে। ব্যাপার কি? ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

'আমি রানা, জামান। মাসুদ রানা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা।

'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্-হো!' হেসে উঠল জামান। এবার পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'মাসুদ রানা, তাই না? আচ্ছা, আচ্ছা! দুঃখিত, অনেকদিন পর দেখা কি না! ঠিক চিনতে পারছিলাম না।'

অজান্তেই গলা চড়ে গেল রানার। 'এসব কী বলছ তুমি?'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' এখনও হাসছে আর আপনমনে মাথা দোলাচ্ছে জামান। যেন ভীষণ মজার ব্যাপার কিছু একটা ঘটে গেছে। 'আপনি তাহলে সত্যিই জায়গামত পৌঁছুতে পারলেন শেষ পর্যন্ত?' বলার ঢঙে পরিষ্কার টিটকিরির সুর, কান এড়াল না রানার। 'আমি অবশ্য জানতাম আপনি আসবেনই। আমার বস্‌ও একমত ছিলেন এ ব্যাপারে।'

'তোমার বস্?' এক পা এগোলো রানা জামানের দিকে।

উত্তর দিল না জামান এ প্রশ্নের। হঠাৎ করে কিরভের কথা খেয়াল হল। 'কাপিস্তা কিরভ কোথায়?' কঠিন গলায় রানাকে প্রশ্ন করল সে।

রানা মুখ খোলার কথা চিন্তা করার আগেই গাড়ির ভেতর থেকে বলে উঠল লোকটা, 'আমি এখানে, গাড়ির মধ্যে। হাত-পা বাঁধা, বের হতে পারছি না।'

'আলেক্স!' দূর থেকে একটা মেয়ে কণ্ঠের আদুরে ডাক ভেসে এল। 'কোথায় তুমি?' বলতে বলতে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

শোনামাত্র গলাটা সনাক্ত করতে সক্ষম হল মাসুদ রানা। এই মেয়ের সঙ্গেই টেলিফোনে কথা বলেছিল তখন কিরভ। জয়া। অদ্ভুত রূপসী মেয়ে। ঠিক যেন ডানা কাটা পরী।

'এই যে এখানে আমি,' বলল জামান।

'তোমার দেরি দেখে ভাবলাম···।' জামানের সামনে অপরিচিত একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল জয়া। 'ইনি কে?'

'আমার এক বন্ধু,' তাড়াতাড়ি বলল জামান। 'শোনো, কিরভ আছে গাড়িতে। ওকে একটু হেল্‌প্ করো তুমি, কেমন?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে রানার দিকে ফিরল সে। 'চলুন। তবে তার আগে,' কথার ফাঁকে সাঁৎ করে ডান হাত উঠে এল তার, রানার কিডনির ওপর ঠেসে ধরল একটা বেরেটা। চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাকে সার্চ করতে হবে? না আপনিই

দয়া করে বের করে দেবেন সঙ্গের অস্ত্র?' গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন মেয়েটি। তার উদ্দেশে চাপা কণ্ঠে বলল সে, 'জয়া! হেডলাইট অফ করো।'

মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। সামনের সিঁড়িরুমে টিমটিমে আলো আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত আসছে না। 'নিন্, জলদি করুন। কিন্তু সাবধান!' সাপের মত হিস হিস করে উঠল জামান।

যা ঘটছে তা কি স্বপ্ন না বাস্তব বুঝতে পারছে না মাসুদ রানা। ভোঁ ভোঁ করছে দুই কান। এ ধরনের ঘটনা জীবনে এই প্রথম। কি করবে, কি করা উচিত, মাথায় আসছে না ওর। ভাল করে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্যে কিছু বলতে গেল, কিন্তু চাবুকের মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবড়ি লাগাল জামান। 'শাটাপ্!' প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

ধাক্কাটা সামলে নিল রানা অনেক কষ্টে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে, খুব ধীরে পকেট থেকে বের করে আনল ওয়ালথার। জামান শেখ ওর নিজের হাতে গড়া অপারেটর। রানা ভালই জানে কি অবিশ্বাস্য দ্রুত ওর রিফ্লেক্স। অস্ত্রটা উল্টো করে সামনে এগিয়ে দিল রানা। থাবা দিয়ে ওটা নিল জামান শেখ। 'ঘুরে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ান।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশটা পালন করল রানা। এ ছাড়া আর পথ নেই, বুঝে গেছে ও। উল্টে গেছে পরিস্থিতি। ছাতের কিনারায় হাত রেখে দু পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল রানা। কিরভকে ততক্ষণে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছে মেয়েটি। ওপাশে দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে ওদের দুজনকে দেখছে সে। হয়ত ভাবছে এ কেমন বন্ধু। নিখুঁতভাবে সার্চ করল জামান রানাকে। আর কিছু না পেয়ে সন্তুষ্ট হল। পিছিয়ে গেল। 'এবার সোজা হতে পারেন।'

সিধে হল মাসুদ রানা। ঘুরে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল জামান শেখের অস্পষ্ট মুখের দিকে। ওর তরফ থেকে এমন অভাবিত আচরণ স্বপ্নেও আশা করেনি রানা, দাঁড়িয়ে থাকল আহাম্মকের মতো। মাথার ভেতরটা ওজন শূন্য, ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হল এখনই পড়ে যাবে মাথা ঘুরে।

'চলুন,' বেরেটা নাচিয়ে ওকে সিঁড়িরুমের দিকে এগোতে বলল জামান। 'ওপরে যাওয়া যাক। তবে সতর্ক থাকবেন, কোনরকম নায়কোচিত অ্যাকশন দেখাতে যাবেন না। সেক্ষেত্রে ওটাই হবে আপনার জীবনের শেষ মুভমেন্ট।' বাংলায় কথা বলছে সে, আর দু জন বুঝতে পারছে না একটি অক্ষরও। থেকে থেকে দৃষ্টি বিনিময় করছে তারা।

ব্যাপারটা নজর এড়াল না জামান শেখের। কিরভের দিকে তাকিয়ে খানিকটা শুকনো হাসি ফুটিয়ে রুশ ভাষায় প্রশ্ন করল, 'আমার এই বন্ধুটিকে কোথায় পেলে, কিরভ? মানে এ কিভাবে তোমার কাঁধে সওয়ার হল জানতে চাইছি।'

রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে ঘন ঘন হাত ঝাড়ছে কাপিস্তা কিরভ। উত্তরে বিড় বিড় করে কিছু বলল সে। কিন্তু এত নিচু গলায় যে কেউ কিছু বুঝল না। 'ঠিক আছে। ওপরে গিয়ে শুনব।' রানাকে সামনে নিয়ে পা বাড়াল জামান। তার পিছনে কিরভ এবং সবশেষে জয়া মাসুরভ।

ব্যাপার স্যাপার দেখে বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে মেয়েটির। বোরোডিনস্কির কথা ভাবছে সে। চুক্তিবদ্ধ করার সময় লোকটা তাকে বলেছিল জামান শেখ খুব নিরীহ মানুষ। এক বিমান দুর্ঘটনায় বাপ-মা, ভাই-বোন এবং বাগদত্তা স্ত্রী সবাই নিহত হয়েছে তার। ফলে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে সে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়, সেই জন্যেই নাকি তাকে সুস্থ করে তোলার গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে বোরোডিনস্কি।

জয়া মাসুরভকে চুক্তিবদ্ধ করেছে সে 'ডাক্তারের নির্দেশে'। কারণ তার চেহারা নাকি অবিকল জামানের নিহত বাগদত্তা স্ত্রীর মতো। ডাক্তার বলেছে, তাকে সুস্থ করে তোলার একমাত্র পথ তার মনোরঞ্জন করা। কাজটা যত নিখুঁত হবে, ততই দ্রুত সেরে উঠবে জামান শেখ। এজন্যে যতটা দরকার, করতে হবে জয়াকে। বেশি কিছু নয়, তার বাগদত্তার অভিনয় করা, প্রয়োজনে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিনিময়ে প্রচুর টাকা। এরই মধ্যে অর্ধেক অগ্রিম পেয়েও গেছে জয়া, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে। অঙ্কটা আশাতীত রকম বড়। পেশায় সে কলগার্ল। এ ধরনের চুক্তিভিত্তিক কাজে সন্তোষজনক পারিশ্রমিক পেলে তার রাজি না হওয়ার প্রশ্নই আসে না, কাজেই বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে যায় সে। এতদিন ভালই চলছিল, কিন্তু···।

জামান শেখের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কল্পনাই করেনি জয়া মাসুরভ। ওটা দেখে অন্তরাত্মা উড়ে গেছে তার। ভেবেই পাচ্ছে না আধা অপ্রকৃতিস্থ একজনের হাতে এল কি করে ওটা। আগন্তুক লোকটিই বা কে? তার কাছেও দেখা যাচ্ছে একই জিনিস ছিল, ব্যাপারটা কি? তাছাড়া এ মুহূর্তে জামানকেও কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। মাঝেমধ্যে ওটা কোন ভাষায় কথা বলছে সে?

গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু তুষার মাড়িয়ে সিঁড়িরুমের দিকে চলেছে মাসুদ রানা। দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে। শুকিয়ে গেছে মুখ। অবিশ্বাস্য লাগছে ওর। মনে হচ্ছে বর্তমানটা আসলে সত্যি নয়, দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এ কিছুতেই সত্যি হতে পারে না। জামান শেখ···অসম্ভব!

দোতলায় উঠে এল চারজন মিছিল করে। সারাক্ষণ রানার পিঠের সঙ্গে প্রায় সেঁটে থাকল জামান। সিঁড়ির মাথায় ডানদিকের বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে কিরভকে বলল সে, 'দরজা খোলো!'

টেনে ভিড়িয়ে রাখা ছিল, হাত দিয়ে চাপ দিল লোকটা, খুলে গেল পাল্লা দুটো। একটা পাল্লায় ফিট্ করা সোনালী প্লেটের ওপর কালো অক্ষরে ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা আছে দেখল রানা—পনেরো এ। আলো জ্বলছে ভেতরে। এটা ড্রইংরুম। মোটামুটি সাজানো গোছানো। পিঠে জামানের ঠেলা খেয়ে আবার পা বাড়াল মাসুদ রানা। পিছনে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে গেল।

দশ-বারো ফুট দীর্ঘ এক করিডর পেরিয়ে আরেক রুমে নিয়ে আসা হল ওকে। ষোলো বাই আঠারো হবে রুমটা। মোটেই গোছাল নয় এটার পরিবেশ,

বরং বেশ নোংরা। আসবাব বলতে আছে একটা ডিভান। ওপরের মোটা কভার দু তিন জায়গায় ছেঁড়া তার–বেরিয়ে আছে ভেতরের ফোম। ওটার পাশে দুটো খটখটে কাঠের চেয়ার। শেষ প্রান্তের এক কোণে একটা বইয়ের আলমারি এবং অন্য কোণে একটা মাঝারি টেবিল।

তার ওপর কিছু কাপ-পিরিচ, প্লেট-গ্লাস এবং বড় এক স্যামোভার। টেবিলের পায়ের কাছে একটা স্টোভ-জ্বলছে। কালো একটা ঢাকা দেয়া পাত্র বসানো রয়েছে তাতে। ফাঁক ফোকর গলে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভেতর থেকে। ঘরের বাতাসে কেমন বাঁধাকপি বাঁধাকপি গন্ধ। নিশ্চয়ই ক্যাবেজ স্টু, ভাবল রানা।

ডিভানের এক কোণে রানাকে বসতে বলল জামান। নিজে একটা কাঠের চেয়ার কাছে নিয়ে এসে বসল ওর মুখোমুখি। জয়া আর কিরভ পিছনে, প্রবেশ পথের দু পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের বেশি একচুলও নড়ছে না মেয়েটি। এসব কি ঘটছে বুঝতে পারছে না বলে সহজ হতে বাধছে। পিছন থেকে একভাবে জামানকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

'স্টোভে কি ওটা, ডার্লিং?' নরম গলায় পিছনদিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল জামান। চোখ রানার ওপর, বেরেটার নল স্থির ধরে রেখেছে ওর বুক সোজা। মুখের ভাবসাব বেশ পাল্টে গেছে তার। সহজ হয়ে এসেছে। মুখটা হাসি হাসি। আয়েস করে বসল সে।

'বাঁধাকপির স্টু,' তাড়াতাড়ি বলল জয়া মাসুরভ। 'হয়ে গেছে এতক্ষণে। দেবো তোমাকে খানিকটা, খাবে?'

'এখন না। ধন্যবাদ। পরে হবে।' রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল জামান এবার। 'বলুন, কি খাবেন।' রানা মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল। 'ব্র্যান্ডিই ভাল, কি বলেন? যা ঠাণ্ডা! ডার্লিং!' গলা চড়াল সে, 'ব্র্যান্ডি দাও বরং আমাদের।' যতই নরম গলায় বলুক, নির্দেশের মতো শোনাল কথাগুলো।

অস্বস্তিতে পড়ে গেছে মাসুদ রানা। ওর-ই সহকর্মী পিস্তল ধরে আছে ওর দিকে, অসহায়ের মতো বসে থাকতে বাধ্য করছে, চিন্তাটা প্রায় অসুস্থ করে তুলেছে ওকে। নিজেকে বোধশক্তিহীন এক হাবা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা পঙ্গু। কেন যেন মন বলছে লুবিয়াঙ্কার টর্চার চেম্বারের চাইতেও এই রুম ওর জন্যে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এর পরিবেশ আরও বহুগুণ বিপজ্জনক।

'নিন্।'

জামানের কথায় সচকিত হল রানা। অর্ধেক ব্র্যান্ডি ভর্তি একটা পেটমোটা খাটো গ্লাস ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে সে। নিল ওটা রানা। জামান ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছে, সত্যিই এ জিনিসের প্রয়োজন ছিল। জামানের পাশে আরেকটা গ্লাস ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, ওটা নিল সে। মুখের সামনে তুলে ধরে গ্লাস রিমের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিয়ার্স।'

হাতটা মৃদু কাঁপছে জামানের, নজর এড়াল না রানার। কেন? ভাবল ও, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কোন কারণে? নইলে ইস্পাতের মত দৃঢ় যার স্নায়ু, তার হাত অকারণে কাঁপবে কেন? ওর চোখের দিকে নজর দিল রানা।

দৃষ্টিটা অস্থির, চঞ্চল–থেমে থাকতে পারছে না, ঘন ঘন নড়ছে চোখের মণি। তাছাড়া সামান্য ভেজা ভেজাও মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড জ্বর হলে এরকম হয় মানুষের চোখ। কিন্তু···জামানের জ্বর হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না!

'চিয়ার্স,' বলল রানা। ছোট্ট করে একটা চুমুক দিল গ্লাসে। কি যেন একটা মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ পড়ছে না। ওর ডানদিকের একটা জানালা গলে চলন্ত গাড়ির আলো এসে ঢুকল ঘরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরে গেল আলোটা। এঞ্জিনের আওয়াজও অল্প অল্প কানে এল, মেইন রোড থেকে আসছে।

সেদিন নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পেয়েছিল জামান ওই জানালা দিয়ে, ভাবল মাসুদ রানা, যখন কিরভকে অনুসরণ করে এসে ওখানে অপেক্ষা করেছিল ও। এবং তখন-ই জামান লোকটাকে নির্দেশ দিয়েছিল ওকে ধরিয়ে দিতে। অবশ্য কিরভের কথা কতখানি সত্যি, কে জানে।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। চরম সত্যটা যা-ই হোক, এবার তার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ও, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে রক্ত পাম্প করছে এখন ওটা। দীর্ঘ দুই চুমুকে পানীয়টুকু শেষ করল মাসুদ রানা। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল পাশে। প্রয়োজন পড়তে পারে। 'সেদিন ওই লোকটাকে তুমি বলেছ আমাকে ধরিয়ে দিতে?'

খানিকটা যেন নিজের অজান্তেই সম্মতিসূচক মাথা দোলাল জামান শেখ। মুখের ভাব দেখে মনে হল এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতে ঘোর আপত্তি আছে। পরক্ষণেই তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, ঝাঁকির চোটে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি ছলকে পড়ল তার গায়ে, মেঝেতে। জামানের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। যেন চরম একটা কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্যে যুদ্ধ করছে সে।

'হ্যাঁ, বলেছি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল জামান শেখ। 'কিন্তু যদি জানতাম কেজিবির হাত গলে পালিয়ে আসবেন, তাহলে বলতাম না। আমি নিজেই গিয়ে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে আসতাম আপনার মাথায়।'

চোখ কপালে উঠল রানার। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থাকল ও ছেলেটির দিকে। 'কি সব আবোল তাবোল বকছ তুমি!' কড়া গলায় ধমকে উঠল ও, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? এদেশে এসেছি আমি তোমার নিরুদ্দেশের কারণ জানতে, কোন বিপদ-আপদ ঘটে থাকলে তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে। আর তুমি···'

'উদ্ধার?' ঠোঁট বেঁকে গেল জামানের। 'আমাকে? আগে নিজেকে উদ্ধার করুন, জনাব।'

'থামো!' রানার ধমকে মেয়েটি তো বটেই, কিরভ পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'পাগলামিরও সীমা আছে।'

'অবশ্যই আছে,' টিট্‌কিরির সুরে বলল জামান। 'তবে এখনও তা দেখেননি আপনি। দেখবেন কাল বিকেলে।'

'কি?'

'পাগলামির সীমা।' শব্দ করে হেসে উঠল জামান। 'সব গুছিয়ে এনেছি। আরেকটু অপেক্ষা করুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। পৃথিবীকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিতে যাচ্ছি আমি।' ডান হাত খানিকটা ওপরে উঠল, রানার দুই চোখের মাঝে তাক্ করল সে বেরেটা। 'উঁহুঁ! খবরদার! এক পা-ও এগোবেন না।'

অজান্তেই বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মাসুদ রানা। পা বাড়াতে যাচ্ছিল জামানের দিকে, কিন্তু ধমক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কিসের ঝাঁকি?'

'যাকে বলে রাম ঝাঁকি,' চোখ মটকাল জামান শেখ। 'বা রামধাক্কাও বলতে পারেন। অতি বাড় বেড়েছে ক্রেমলিনের। এবার তার খানিকটা খেসারত দেয়ার সময় হয়েছে।'

চোয়াল ঝুলে পড়েছে রানার বিস্ময়ে। 'কিসের খেসারত! এসব কী বলছ তুমি উল্টোপাল্টা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমার কি ক্ষতি করল ক্রেমলিন?'

'আমার একার নয়,' ধমকে উঠল যুবক চোখ লাল করে। 'আমাদের সবার ক্ষতি করেছে ওরা, এখনও করছে। এভাবে চলতে দেয়া যায় না আর।'

বিস্ময় আরও বাড়ল রানার। কি বলছে জামান মাথায় ঢুকছে না। 'তোমাদের ক্ষতি করছে মানে?'

উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল জামান শেখ। মানুষের গলা দিয়ে যে এমন অদ্ভুত হাসি বেরোতে পারে ধারণা ছিল না মাসুদ রানার। মৃদু সুরে বিলাপ করছে যেন সে, যেন ফাঁদে আটকা পড়া কোন আহত প্রাণী মুক্তির জন্যে করুণ আর্তি জানাচ্ছে। ব্যাপারটা চোখের সামনে না ঘটলে বিশ্বাস-ই হত না রানার।

জামান শেখের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছে ও, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। চেহারায় একটু একটু করে উদ্বেগ জমা হচ্ছে। টলমল করছে আস্থা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এই সেই জামান শেখ। প্রশ্নটা আবার করতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল জামান। পলকে উধাও হয়ে গেছে হাসি।

'আমাদের মানে আমাদের। ইহুদীদের।'

'কি!' পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল রানার। চমকে উঠল ও, আতঙ্কের তীব্র একটা ঢেউ বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বয়ে গেল দেহে। 'কি বললে?' বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকল যুবকের দিকে। 'তুমি···তুমি···।'

উত্তর দেয়ার গরজ দেখা গেল না তার মধ্যে। নজর রানার ওপরই, কিন্তু মন চলে গেছে আর কোথাও। গভীর চিন্তায় মগ্ন। সামনে দাঁড়ানো ওই যুবক সত্যিই জামান শেখ তো? ভাবছে রানা, নাকি···নাহ্! ওই তো দেখা যাচ্ছে ওর সেই ফেসিয়াল আইডেন্টিফিকেশন মার্কটা-ঠোঁটের ডান পাশে সরু, ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা কাটা দাগ। তাছাড়া বাঁ কানের লতির ছোট্ট কালো তিলটাও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। তাহলে?

'তুমি সুস্থ আছ তো, জামান?' প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও না করে পারল না রানা।

গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল যুবক। ওর চোখে চোখ রেখে গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। 'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমাকে কি অসুস্থ মনে হচ্ছে আপনার?'

'তাহলে এসব কি বলছ তুমি? তুমি বাংলাদেশের এক বাঙালী মুসলিম পরিবারের ছেলে, ইহুদী হতে যাবে কোন দুঃখে?'

মাথা দোলাল জামান। 'না।'

'কি না?'

'আমার বংশ পরিচয় আপনি যা জানেন তা ভুল, ঠিক নয়।'

'ঠিক নয়?' দুহাতের তালু ও কপাল গরম হয়ে উঠল রানার হঠাৎ করে। ডান চোখের কোণ তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে। দেহের ভার সইতে পারছে না ও, ইচ্ছে করছে বসে পড়তে। 'তুমি,' একটা ঢোক গিলল রানা। 'তুমি মুসলমান নও?'

'অফিশিয়ালি, হ্যাঁ,' বেরেটা ধরা হাতের উল্টোদিক দিয়ে ডান চোখের জমে ওঠা পানি মুছল যুবক। চুমুক দিল গ্লাসে। 'আনঅফিশিয়ালি, না। অবশ্য এতদিন আমিও জানতাম আমি মুসলমান। এখন সে ধারণা ভেঙেছে আমার। জীবনের বড় একটা সত্য এতদিনে জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি আমি মুসলমান নই, ইহুদী। আগের পরিচয় মিথ্যে, সত্যি নয়।'

নিজেকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত মনে হল রানার। কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'সত্যি নয়!' হঠাৎ করেই বিচ্ছিরি একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল ওর মনে।

পানীয়টুকু শেষ করল জামান শেখ। মাথা দোলাল এপাশ-ওপাশ। 'তবে আর বলছি কি!'

পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে নিজেকে তৈরি করতে সময় লাগল রানার। জবাব কি আসতে পারে ভেবে ভেতরে ভেতরে রীতিমত ঘেমে উঠল। 'কি করে জানলে এতবড় সত্যটা? কার কাছ থেকে?'

'কার কাছ থেকে জেনেছি তা মুখ্য নয়। সত্যটাই আসল।' শূন্য গ্লাস ধরা হাতটা দেহের পিছনে ধরে রেখেছে সে। চাইছে জয়া বা কিরভ এসে ওটা নিয়ে যাক। মেয়েটি এগিয়ে এসে ভারমুক্ত করল ওকে।

'তুমি মুসলমান নও!' অবর্ণনীয় চেহারা হয়েছে রানার। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি সারা জীবনের সঞ্চয় এক লহমায় খুইয়ে পথে বসেছে ও। বুকের ভেতর কেমন চাপা হাহাকার।

'না। ইহুদী। সজ্ঞানে আপনার কাছেই শিখেছি ইনফিলট্রেশন কি, কাকে বলে। অথচ কি আশ্চর্য! তারও অনেক অনেক আগে থেকে নিজেই আমি ইনফিলট্রেটেড হয়ে আছি বিসিআইয়ে, কল্পনা করতে পারেন? ওদের ডীপ কভার এজেন্ট ছিলাম আমি।' 'ডীপ' শব্দটির ওপর খুব জোর দিল যুবক।

'কি ছিলে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। কপাল কুঁচকে উঠেছে, গলা অজান্তেই চড়ে গেছে।

খেয়াল করেনি জামান শেখ। আপনমনে বলে চলেছে, 'আরও মজা কি

জানেন? ট্রেনিঙের সময় আপনার কাছ থেকে যা যা শিখেছি, এখন বুঝতে পারছি তার প্রায় সবই আরও আগেই শেখা ছিল আমার। কিন্তু অতীত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে জানতাম না। অনির্দিষ্টকালের জন্যে মন থেকে অতীত সাময়িকভাবে মুছে দিয়েছিল ওরা আমার। বিশেষ প্রয়োজনে এখন আবার তা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় স্থবির হয়ে গেছে মাসুদ রানা। কাঁপছে একটু একটু। কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'কা-কাদের ডীপ কভার এজেন্ট তুমি!'

অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল জামান। 'এখনও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

ঠোঁটের ফাঁক গলে শব্দটা ফসকে বেরিয়ে গেল রানার। 'মোসাদ!' ঢোক গিলল ও।

অভিযোগের সুর ফুটল যুবকের কণ্ঠে। 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। ইহুদী বলার পরও···।' থেমে গেল সে।

সেকেন্ডের মধ্যে হাজারো এলোমেলো চিন্তা বয়ে গেল রানার মস্তিষ্কে। প্রথমে মনে হল বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে ও। মাথার সব কটা স্ক্রু নড়ে গিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছে। পরক্ষণেই ভাবল, না, আমি নই, আমার সামনে দাঁড়ানো অস্ত্রধারী ওই যুবক, ও পাগল হয়ে গেছে। নয়ত অভিনয় করছে। খুব সম্ভব নিজেদের নোংরা, হীন কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে জামানকে বিশাল অঙ্কের উৎকোচ ধরিয়ে দিয়েছে মোসাড, যে কারণে ওর মতো নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্বস্ত এক এজেন্ট··· নাকি, সত্যি সত্যিই সম্মোহিত করা হয়েছে ওকে?

কোন ভাবনাই স্থির হচ্ছে না। মস্তিষ্কের বিশেষ সেল স্পর্শ করেই ফাস্ট মোশন ছায়াছবির মতো দ্রুত অপসৃত হতে লাগল একটার পর একটা, বিরতিহীন।

চাউনি সরু হয়ে এল ওর। 'কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে তোমার বিস্মৃত অতীত ফিরিয়ে আনা হল জানতে পারি?'

উত্তর দেয়ার আগে সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল জামানকে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'এদেশের অন্ধ পলিসি মেকারদের সামান্য শিক্ষা দেয়ার জন্যে।'

'কিভাবে?'

এবারও মূল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল সে। 'আমাদের ওপর এদের বহুমুখী অত্যাচার বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হিটলারও ঘৃণা করত ইহুদীদের, লাখ লাখ ইহুদী হত্যা করেছে সে। কিন্তু তার কাজে রাখ-ঢাক ছিল না, কোন ভণিতা ছিল না। যা করার সরাসরি, পৃথিবীকে জানান দিয়ে করেছে হিটলার। কিন্তু এই হারামীর বাচ্চাদের চরিত্র আরও জঘন্য। এরা আমাদের মারছে তিলে তিলে, রসিয়ে রসিয়ে। এ দেশে যে সব ইহুদী টাকা-পয়সা, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত প্রভাব বা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নাস্তিকদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের সবাইকেই কৌশলে ধ্বংস করেছে এরা, এখনও করছে। কিন্তু এ অবস্থা আর বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না। অনেক হয়েছে। আর সহ্য করতে রাজি নই আমরা। ঢিল ছুঁড়লে যে পাটকেল খেতে

হবে, এবার হাড়ে হাড়ে ওদের বোঝাব আমরা।'

অবাক হয়ে জামানের মুখের দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। বলতে বলতে চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে তার প্রচণ্ড ঘৃণায়। হাতের কাঁপুনি বেড়ে গেছে, লাল দুচোখের মণিও কাঁপতে শুরু করেছে। সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হচ্ছে না। ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক।

সূর্য পশ্চিমে ওঠে না যেমন সত্যি, ভাবছে রানা, জামান শেখের বর্তমান আচরণ অভিনয় নয়, সে-ও তেমনি সত্যি। অন্তরের চরম ঘৃণা-ই গল গল করে বেরিয়ে আসছে ওর প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে। তাহলে? দ্রুত মস্তিষ্ক চলছে রানার, জামানকে কি সম্মোহিত করা হয়েছে? কিন্তু তা-ই বা কি করে সম্ভব? বিসিআইয়ের প্রতিটি অপারেটরকে এমনভাবে পোস্ট অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হয়ে থাকে যাতে আর কেউ কোনমতেই তাকে সম্মোহিত করতে না পারে।

যেমন ওকেই একবার সম্মোহিত করতে গিয়ে চরম ঠক্ খেয়েছিল মোসাদ। বাংলাদেশের এক কৃতি মেডিসিনের প্রফেসরের উদ্ভাবিত এই পোস্ট অ্যান্টি হিপনোটিক প্রক্রিয়া সেবার ওকে সাহায্য করেছিল দ্রুত নিজেকে ফিরে পেতে। সময় নিয়ে, ধীরেসুস্থে এগোও, নিজেকে শোনাল রানা। তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। ব্যাপারটা আরও ভালমত বোঝার চেষ্টা করো।

'বুঝলাম,' বলল ও। 'কিন্তু হঠাৎ পাটকেল ছোঁড়ার মতি হল কেন মোসাদের? কি এমন ঘটল?'

চুপ করে থাকল জামান। পায়চারি করতে শুরু করল হঠাৎ করে। হাঁটতে হাঁটতে রানার পিছনে চলে এল সে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না এখন ও। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরাল রানা। কি করছে জামান দেখতে না পেলে স্বস্তি পাচ্ছে না। পিছনের দেয়ালের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেয়ালে হেলান দিয়ে অপলক চেয়ে থাকল জয়ার দিকে। ওর মাথার ওপরে দেয়ালে ঝুলছে একটা দাদার আমলের ঘড়ি। জগৎ-সংসার সম্পর্কে উদাসীন ওটার সোনালী পেণ্ডুলাম সিকি চক্রাকারে দুলছে তো দুলছেই। সেই সঙ্গে ভেতর থেকে ছন্দময় আওয়াজ উঠছে, টিক্ টক্, টিক্ টক্, টিক্ টক্…

বার দুয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে বলল জামান, 'জয়া, একটা সিগারেট দেবে, ডার্লিং?' অজান্তে বাংলাতেই বলে ফেলেছে ও কথাটা। কিন্তু তাতে বুঝতে অসুবিধে হল না মেয়েটির। আর কিছু না হোক, নিজের নাম এবং সিগারেট, শব্দ দুটো ঠিকই বুঝেছে। স্যামোভারের পাশে রাখা একটা লাল-সাদা প্যাকেট তুলে নিল সে। তা থেকে বের করে নিজেই ধরাল একটা সিগারেট। কাছে এসে ওটা তুলে দিল জামানের হাতে।

'ধন্যবাদ।'

আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে দাঁড়াল জয়া মাসুরভ। একই সঙ্গে উপস্থিত সবার নাকে এসেছে কেমন একটা পোড়া গন্ধ। অন্যদের মত রানাও এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। জয়ার চোখেই প্রথম ধরা পড়ল ব্যাপারটা। জিভ বের করে আফসোস ধ্বনি করে উঠল সে। ছুটে গিয়ে

স্টোভে চড়ানো পাত্রের ঢাকনা আলগা করে ভেতরে নজর দিল। সঙ্গে সঙ্গে নাক কুঁচকে উঠল আরও, জিভ কাটল সে। পুড়ে গেছে স্টু। 'এই যাহ্!' লজ্জা পাওয়া চোখে জামানের দিকে তাকাল মেয়েটি।

হাসল জামান। 'দুঃখ করে লাভ নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। নিভিয়ে দাও স্টোভ। আজ বাইরে খাব আমরা, কোন হোটেলে।'

'কিন্তু বাইরে যাওয়া বারণ আছে তোমার। প্রফেসর সাহেব বারবার করে···।'

'বাইরে যাওয়া আমার নিষেধ ছিল এই বন্ধুটির দেখে ফেলার চান্স ছিল বলে। এখন সে ভয় আর নেই, দেখা হয়ে গেছে। এর একটা বিহিত করতে পারলেই ইচ্ছেমত যখন খুশি বাইরে আসা-যাওয়া করতে পারব তুমি আর আমি। রেখে দাও ওসব।'

স্টোভ নিভিয়ে একটু ইতস্তত করল মেয়েটি। তারপর উঠে চলে গেল আগের জায়গায়। সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দিল জামান শেখ। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। রানার মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে। ওকে যখন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে জামান, তাহলে এদেশের আর সব বিসিআই এআইপি-দের নামও নিশ্চয়ই ফাঁস করে দিয়েছে। এতক্ষণে হয়ত ধরাও পড়ে গেছে তারা প্রত্যেকে।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে অবশ্যই খবর পেত ও, ভাবল রানা। তাদের সবাই টিলসনের নেটওঅর্কের কড়া নজরে আছে। তেমন কিছু ঘটলে জানাত তাকে টিলসন। তাছাড়া ও নিজেও কথা বলেছে কাল ছয়জনের সঙ্গে। কোনরকম বিপদের আভাস দেয়নি তাদের কেউ। সেক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে নিরাপদেই আছে পুরো সেল। এ-ও কম চিন্তার বিষয় নয়। শুধু ওর কথাই জানানো হল কেজিবি-কে, অন্যদের কথা বাদ্ থাকল কেন? জয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হল রানার। ওর দিকেই চেয়ে আছে সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে। হয়ত বাইরে না যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জামানের ব্যাখ্যাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছে।

'তুমি বরং এবার আমাকে খানিকটা চা খাওয়াও, সুইটহার্ট,' বলল জামান শেখ। মাত্র কয়েক টানে শেষ করে এনেছে সে সিগারেট। 'পারবে না?' মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল আগুনটা।

'স্যামোভারে তৈরি চা আছে।'

'ভেরি গুড। তাড়াতাড়ি দাও। সঙ্গে আরেকটা সিগারেট।'

গম্ভীর সুরে বলল মাসুদ রানা, 'আমি এদেশে একটা বিশেষ মিশন নিয়ে এসেছি, জামান, আগেই বলেছি।'

লক্ষই করল না সে। জুতোর সামনের অংশ দিয়ে মেঝেতে তাল ঠুকছে।

'তুমি বুঝতে পারছ না, ওরা তোমাকে হিপনোটাইজ করেছে, জামান। আমার দিকে তাকাও, ভাল করে দেখো। ওরা তোমাকে যা যা শিখিয়েছে তা মিথ্যে, জঘন্য মিথ্যে। তোমাকে দিয়ে অত্যন্ত বাজে একটা কাজ করিয়ে নিতে চাইছে ওরা। তাতে এদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক চিরকালের জন্যে নষ্ট

হয়ে যাবে, জামান। তুমি ইহুদী নও, তুমি মুসলমান, বাংলাদেশী। তোমার বাবা আজমল শেখ, নড়াইল সরকারী গালর্স হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক। তোমার মা রূপগঞ্জের...'

'চুপ করুন! কি আবোল-তাবোল বকছেন! কে শুনতে চেয়েছে এসব আপনার কাছে?'

'তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, জামান। সোহেলের কাছে খবর এসেছে। ও তোমাকে জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই তুমি নিখোঁজ হয়ে যাও। এখন বুঝতে পারছি, ওরা ধরে নিয়ে হিপনোটাইজ করেছে তোমাকে।' উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা বলতে বলতে।

কিন্তু আমলই দিল না এবার জামান শেখ। মন নেই তার এদিকে। হাসি মুখে জয়ার দিকে চেয়ে আছে। এক কাপ চা এনে ওর হাতে তুলে দিল জয়া। সে-ও হাসছে, তবে জামানের মতো সহজ হতে পারছে না। আড়ষ্ট একটা ভাব রয়েছে হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গিতে।

আবার বলল রানা, 'জামান, এখনও সময় আছে, দেশে ফিরে গেলে এখনও হয়ত একনজর দেখতে পাবে মাকে।' ব্যগ্র হয়ে উঠছে ও ক্রমেই। কোন কথাই কানে তুলছে না ছেলেটা, এক মনে ব্যস্ত নিজের কাজে। এখন ওকে আক্রমণ করা ছাড়া বশে আনার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু কি ভাবে? দ্রুত ভাবছে রানা, শূন্য গ্লাসটা আছে এখনও জায়গামতই।

বসা থাকলে ওটা তুলে নেয়া সমস্যা হত না। কিন্তু আরও আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ও, এক পা এগিয়ে গেছে ডিভানের কাছ থেকে। এখন যদি পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করে, সতর্ক হয়ে যাবে জামান শেখ। ভুলে গেলে চলবে না, ঘরে আরও দুজন আছে।

কি করা যায়!

টিক্, টক্।

সঙ্গে এমন ভারি কিছু আছে, যা আচমকা নাকেমুখে ছুঁড়ে মেরে কাহিল করা যায় জামানকে?

টিক্, টক্।

নাহ্! হতাশ হল রানা, তেমন কিছুই নেই।

টিক্, টক্।

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা খেয়াল হল। যদিও কাজ হবে বলে ভরসা পেল না, তবু বলল রানা, 'এলিনা তোমার অপেক্ষায় আছে, জামান।' চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, জয়া আগ্রহী হয়ে উঠেছে নামটা কানে যেতে। ওর দিকেই চেয়ে আছে সে আরও কিছু শোনার আশায়। কিন্তু যার উদ্দেশে বলা, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না।

'মেয়েটি তোমাকে ভালবাসে, জামান।'

টিক্ টক্।

লম্বা চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করল জামান। 'কেজিবি এতক্ষণে আপনার খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। যা তা কথা! তিন তিনজন অফিসার হত্যা করেছেন

আপনি ওদের। আপনাকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারলে ভারমুক্ত হওয়া যেত। আমিও অপ্রীতিকর কিছু করার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। শত হোক···।'

টিক্, টক্, ঢং ঢং, ঢং ঢং। গম্ভীর, চড়া পর্দায় ঘন্টা পেটাতে লাগল দাদার আমলের ঘড়ি-রাত দশটা।

পাঁচ

ঘণ্টাধ্বনির কাঁপা কাঁপা রেশ মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

শুধু পেণ্ডুলামের টিক্ টক্ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই ঘরে। নীরবতার মাঝে শব্দটা কানের সঙ্গে স্নায়ুতেও আঘাত করছে। বাধা পাওয়া বাক্যটা শেষ করার আগ্রহ দেখা গেল না জামান শেখের। ঘাড় সামান্য কাৎ করে মন দিয়ে শুনছে সে ঘড়ির গান।

নির্দিষ্ট সময়ের বিরতি দিয়ে একনাগাড়ে আওয়াজ তোলে এমন যে কোন জিনিস সহজেই মনোযোগ কাড়তে পারে জামানের, ব্যাপারটা রানার জানা আছে। সে ঘড়ি-ই হোক, মোটরের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ হোক বা রেলের সঙ্গে চলন্ত ট্রেনের লোহার চাকার ঘর্ষণ, সবই ওর পছন্দ। জামান শেখ ডেমোলিশন এক্সপার্ট, নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে থেকে কাজ করতে হয় তাকে। সবসময়।

ডিলেড ডেটোনেশন ডিভাইস তৈরি করতে বসে সতর্ক নজর রাখতে হয় তাকে সময়ের দিকে, যাতে প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণে একচুল এদিক-ওদিক না হয়ে যায়। টাইম রিলিজড ইউনিটের ক্ষেত্রে বা ফিউজের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও সেই একই ব্যাপার-সময়। হাতের কাজ শেষ করার পর ফলাফলের প্রতীক্ষা, সেখানেও সময়। এই থেকেই হয়ত পছন্দের পর্যায়ে গড়িয়েছে ব্যাপারটা ক্রমে।

হাতের সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুব মন দিয়ে শুনল ও আওয়াজটা। ঘন ঘন দীর্ঘ টানে ধোঁয়া গিলছে, যেন সিগারেট-ই জীবনের সব। ওদিকে জয়া আর কিরভ ওদের কার ব্যক্তিত্ব কত জোরালো, মনে মনে ওজন করছে হয়ত। পালা করে ঘুরছে তাদের দৃষ্টি এর-ওর মুখের ওপর। রানার মনে হল ওদের ভাষা বুঝতে না পারার জন্যে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে বিশেষ করে কিরভ।

'কেন দিচ্ছ না তাহলে?' নীরবতা ভাঙল মাসুদ রানা। 'ওদের একটা টেলিফোন করে দিলেই তো চুকে যায় ল্যাঠা।' কি ধরনের হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হয়েছে ওকে? ভাবল রানা। কিন্তু যে ধরনেরই হোক, বিসিআইয়ের গুরুত্বপূর্ণ এজেন্টদের প্রত্যেককে পোস্ট অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন দেয়া আছে। গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টিকে এমন এক আশ্চর্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এক বাঙালী গবেষক, প্রফেসর জিলানী, যে এই সাজেশন কার্যকর থাকা অবস্থায়ও যে কেউ ইচ্ছে করলেই তাদের আবার সম্মোহিত করতে

পারে। তারা সম্মোহিত হবেও।

কিন্তু তাই বলে ওই অবস্থার সুযোগ নিতে পারবে না সম্মোহনকারী। তাদের পেট থেকে মূল্যবান কোন তথ্য হাজার চেষ্টা করলেও বের করতে পারবে না। তাছাড়া ওই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী-ও হবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই বেরিয়ে আসতে পারবে তারা সম্মোহনের বেড়াজাল কেটে। এই পোস্ট অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন একেকজনকে একেকটি মিষ্টি পদ্যের প্রথম দুতিন লাইনের সাহায্যে দেয়া হয়ে থাকে। যেমন রানাকে দেয়া হয়েছে, "পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল…" ইত্যাদির সাহায্যে।

কাকে কোন পদ্যে সাজেশন দেয়া হয়েছে জানেন কেবল বিসিআইয়ের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান এবং সেই প্রতিভাবান বাঙালী গবেষক, প্রফেসর জিলানী। ভদ্রলোক বুড়োর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইশ্‌শ্‌! আফসোস হল রানার, জামানের পদ্যটা যদি জানা থাকত! পরক্ষণেই বিদ্যুৎচমকের মত অন্য একটা ভাবনা খেলে গেল মাথায়।

সম্মোহন কাটছে না কেন জামানের? সম্মোহন যদি করেই থাকে ওকে মোসাড, তাহলেও তো অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রভাব কেটে যাওয়ার কথা, যাচ্ছে না কেন? নাকি ইসরায়েলিরা ওর চাইতেও উন্নত কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে, যার কাছে মার খেয়ে যাচ্ছে প্রফেসর জিলানীর পদ্ধতি? কি হতে পারে সেটা? পদ্ধতিটি কি জামানকে তার নিজের গণ্ডিতে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে?

আরও চমক অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। কেন যেন আচমকা রুশ প্রফেসর অভ মেডিসিন ইয়েভগেনি প্রলেকভের নামটা ঢুকে পড়ল ওর ভাবনার স্রোতে। আঁতকে উঠল মাসুদ রানা, সর্বনাশ! তবে কি জামানকে তাঁর সেই যুগান্তকারী ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে? কিন্তু ও জিনিস মোসাড পাবে কোথায়? চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবল রানা। কিছুদিন আগে ইয়েভগেনির এই ইঞ্জেকশন আবিষ্কারের বিষয়টি গোপনসূত্রে জানতে পারে বিসিআই। রানা শুনেছে রাহাত খানের কাছে।

বারো ঘণ্টা পর পর এই ইঞ্জেকশন পুশ করলে নাকি দারুণ ফল পাওয়া যায়। সম্মোহনও করতে হয় ভিক্টিমকে একইসঙ্গে। নিয়ম যতদিন বহাল রাখা হবে, ভিকটিমের সাধ্য নেই সম্মোহনের বেড়া জাল থেকে বেরিয়ে আসার। তবে একনাগাড়ে বিশটির বেশি ইঞ্জেকশন পুশ করলে নাকি মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ভিক্টিমের। চিরদিনের জন্যে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে সে। নতুন করে জামান শেখের দিকে নজর দিল রানা। হ্যাঁ, একদম মিলে যাচ্ছে সব। ইঞ্জেকশনের প্রতিটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ফুটে আছে পরিষ্কার। প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্তের মত ছলোছলো চোখ, অস্থির মণি, হাত কাঁপা।

ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা যাক, ভাবল মাসুদ রানা। উপস্থিত অন্য দুজনের দিকে তাকাল। কাপিস্তা কিরভ হয়ত সহজে ফাঁদে পা দেবে না। তবে মেয়েটি দিতে পারে। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে পরিষ্কার রুশ ভাষায় বলে উঠল ও, 'আলেকজান্ডার, তোমার বোধহয় ইঞ্জেকশন নেয়ার সময় হয়ে গেছে। যদি

বলো, তোমার ডাক্তারকে কল করি।'

রানার ধারণাই সত্যি হল। 'না, এখনই না,' তাড়াতাড়ি বলল জয়া মাসুরভ। 'বারোটায় ইঞ্জেকশন দেয়ার টাইম ওর, বারো ঘণ্টা পর পর। প্রফেসর সাহেব নিজে এসে দিয়ে যান, ডাক্তার দরকার নেই।'

জামানের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। প্রায় ফিল্টারে এসে ঠেকা সিগারেটটা পায়ে পিষে সিধে হল ও, আগের মতই অস্ত্রটা রানার বুক-সোজা ধরা। কিন্তু কিরভের প্রতিক্রিয়াটা হল দেখার মতো। এমনভাবে চমকে উঠল যেন হাজার ভোল্টের শক্ খেয়েছে। ঝট্ করে জয়া মাসুরভের দিকে ফিরল সে, চোখ লাল করে কটমট করে চেয়ে থাকল। পারলে কাঁচা চিবিয়ে খায়। কুঁকড়ে গেল জয়া সে দৃষ্টির সামনে। মুখ কাঁচুমাচু করে এমন এক ভঙ্গি করল, যেন বলতে চাইছে, বা-রে! আমার কি দোষ? ওই লোকটা বলল বলেই না···।

'কই, করলে না টেলিফোন, জামান?' বলল রানা। বুঝে ফেলেছে যা বোঝার।

উত্তর দিল না জামান।

'আমি ধরা পড়লে যে তোমার ব্যাপারটিও ফাঁস হয়ে যাবে, তা বোঝো তো?'

'পরিষ্কার। এইমাত্র চিন্তাটা মাথায় এসেছে। তাই আপনার ব্যাপারে নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'সেটা কার্যকর করার সময় না-ও তো পেতে পারো তুমি,' নিরীহ গলায় বলল রানা। 'মস্কোর সিকিউরিটি এ মুহূর্তে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় আছে, কারণ তাদের এক বন্ধু-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কাল সকালে মস্কো পৌঁছুচ্ছেন। শিকারী কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করছে তারা। বলা যায় না, এখানে এসেও হাজির হতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। আমার মনে হয় আমার মত তোমাকেও খুঁজছে ওরা। কারণ বেশ ক দিন ধরে কর্মস্থল থেকে তুমি উধাও, পাত্তা নেই তোমার। নিশ্চয়ই পরিবর্তনটা কেজিবি-র চোখে ধরা পড়েছে। চলো,' নিচু কণ্ঠে বলল ও, 'আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

'চুপ করুন!' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জামান। প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'বন্ধ করুন আপনার পচা ভাষণ!' আবার পায়চারি আরম্ভ করল সে, এবার দ্রুত। কিন্তু এর মধ্যেও একটা চোখ রানার ওপরই থাকল তার। বিড় বিড় করে বলছে কী সব।

'তুমি মারাত্মক ভুল করছ, জামান।'

'আর একটি কথাও নয়,' হুমকি দিল যুবক। দাঁড়িয়ে পড়েছে রুমের মাঝখানে। রেগে লাল হয়ে গেছে। দম ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে। ভয়ে ভয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল জয়া মাসুরভ। চাপা কণ্ঠে বলল, 'উত্তেজিত হয়ো না, ডার্লিং।'

'লোকটা···লোকটা পাগল করে দিতে চায় আমাকে। ওকে কেজিবি-র হাতে ধরিয়ে দেয়াই উচিত।'

'আগেই বলেছি তাতে তুমিও বিপদে পড়বে,' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'ওরা যদি আবার আমার নাগাল পায়, অবশ্যই তাদের তোমার কথা জানিয়ে দেব আমি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে কেজিবি।'

'স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে। কিন্তু পাবে না কাউকে। আমি ততক্ষণে হাওয়া হয়ে যাব।'

'যতক্ষণ আমি মুক্ত আছি, আমার কথামত চললে তুমিও মুক্ত থাকবে। কিন্তু এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করে আমরা নিজেদেরই বিপদ বাড়িয়ে তুলছি, জামান। এটা কোন সেফহাউস নয়, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি চিন্তা করো।'

'এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।'

'এত জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না।' পরিস্থিতি বুঝে যে-কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে রানার। যদি একে কোনমতেই পথে আনা সম্ভব না হয়, তাহলে···জামান শেখ ওকে এ-ঘর থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে দেবে না, এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত রানা। কারণ বাস্তব জীবনে ও যতই জামানের শ্রদ্ধেয় বা প্রিয় হোক না কেন, এ মুহূর্তে প্রাণের শত্রু।

জামান শেখ নিরুদ্দেশ হলে মাসুদ রানা ছুটে আসবে, এ মোসাড ভালই জানে। অতএব সম্মোহন করার সময় ওর মাথায় রানা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে চরম একটা সিদ্ধান্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা। অনুমান করতে পারছে রানা কি হতে পারে তা। ওকে হত্যা করার হুকুম আছে জামানের ওপর, এ ব্যাপারে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বাজি ধরতে পারে রানা।

এ-ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে হলে হয় কোনভাবে জামানকে অজ্ঞান করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে দেহটা, নয়ত হত্যা করে রেখে যেতে হবে। কিন্তু দুটোর কোনটিই করার উপায় নেই এ মুহূর্তে। একটু বেচাল দেখলেই গুলি করে বসবে জামান, বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে রানাকে।

টিক্, টক্।

কেমন যেন খটকা লাগল কানে। 'টক্' আওয়াজটা এবার নির্ধারিত সময়ের চাইতে সামান্য একটু দেরিতে উঠেছে। অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাল কেটে গেছে নিয়মিত ছন্দের। রানার মতো জামান শেখও লক্ষ করেছে। ওই একবারই, তারপর আবার আগের মতো চলতে লাগল। ওটার পেণ্ডুলামে খানিকটা দোষ আছে, ভাবল রানা। এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের এক ভাগ সমান পুরু একটা কাগজের প্যাড তৈরি করে জায়গামত বসিয়ে দিলে থাকবে না গোলমাল। দোলটা দু দিকেই সমান হবে, কোনদিকে কম বেশি হবে না।

বর্তমান নিয়ে ভাবতে লাগল মাসুদ রানা। কি আছে কপালের লিখন? রানার হাতে জামানের মৃত্যু, না জামানের হাতে রানার মৃত্যু? পুরো ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না রানা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে জামানের ওপর এখন আর নিয়ন্ত্রণ নেই ওর বা বিসিআইয়ের। অন্যের ইচ্ছেয় চলছে সে এখন, তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে।

'অবস্থা বুঝে যে-কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়া হল

তোমাকে'—বসের কথাগুলো কানে ভাসছে রানার। কিন্তু কি পদক্ষেপ নেবে? কি করার আছে ওর? অস্ত্রের বিরুদ্ধে খালি হাতে কি করার আছে? বিশেষ করে জামান যখন তার নিজ হাতে গড়া···

'আমাকে আরেকটা সিগারেট দাও, সুইটহার্ট।'

রানার বাঁ চোখের পাতা হঠাৎ করেই তড়াক তড়াক লাফাতে আরম্ভ করল। অজান্তেই শ্বাস-প্রঃশ্বাস গভীর হয়ে উঠল। এইমাত্র চোখে পড়েছে একটা সুযোগ। ওর চার হাত দূর দিয়ে টেবিলের দিকে চলে গেল জয়া মাসুরভ। এখনই ফিরে আসবে সিগারেট ধরিয়ে। কেমন হয় নাগালে আসামাত্র একলাফে পিছন থেকে ওর গলাটা পেঁচিয়ে ধরলে? ওকে বেরেটার বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলে?

ঠিক ওর মনের কথাটিই কি ভাবে যেন পড়ে ফেলল জামান শেখ। বলে উঠল, 'লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকো, জয়া। হাতের কাছে পেলে জিম্মি করতে পারে ও তোমাকে। তুমিও দূরে দূরে থেকো, কিরভ।'

আহাম্মক হয়ে গেল মাসুদ রানা। যা-ও বা ভেবে-চিন্তে একটা সুযোগ বের করা গিয়েছিল, গেল হারিয়ে।

'সময়টা মন্দ কাটল না, কি বলেন, মাসুদ ভাই?' রাগ, উত্তেজনার চিহ্নও নেই এখন জামানের চেহারায়। হাসিমুখে বলল, 'আপনার সাথে এত দীর্ঘ সময় আলোচনার সুযোগ আমার হয়নি কোনদিন। বেশ ভালই লাগল। না কি?'

অনেক দূর দিয়ে ঘুরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জয়া, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ওটা জামানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে রানার দিকে তাকাল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'ঘরের মধ্যে গোলাগুলি হবে না তো?'

'ওহ্, নো, ডার্লিং,' তার পিঠে আদর করে হাত বোলাতে লাগল জামান। 'কোন গোলাগুলি হবে না। ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই।'

'শিওর?'

'অফকোর্স শিওর।' রানার দিকে ফিরল জামান। 'আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি।'

কপাল কুঁচকে উঠল রানার। সতর্ক নজর বোলাল ও যুবকের মুখে। ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। 'কিসের চুক্তি?'

'আপনি আগ্রহী?'

'পুরোটা না শুনে মন্তব্য করতে চাই না।'

'খুব সহজ। যদি কথা দেন আমার পিছনে লাগবেন না, ছেড়ে দেয়া হবে আপনাকে।'

'ব্যস্? আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, আর কিছু নয়।' জামান গম্ভীর।

'আমার মুখের কথা বিশ্বাস করবে তুমি?' এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে বলল মাসুদ রানা।

'করব।'

'এত আস্থা আমার ওপর?' খানিকটা অবাক হল ও।

'বেশি কথা বলেন আপনি!' বিরক্তি প্রকাশ করল যুবক।'

'কিন্তু তাতেও ঝুঁকি আছে। এখান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ধরা পড়তে পারি আমি কেজিবি-র হাতে।'

দ্রুত বলল জামান, 'সে ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করবেন আপনি।'

'কি?'

'আত্মহত্যা করতে হবে আপনাকে,' অধৈর্য হয়ে উঠল সে।

ওর চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। কিন্তু হতাশ হল। নাহ্, ইঞ্জেকশনের সময়সীমা শেষ হয়ে এলেও তেমন কোন আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন চোখে পড়ছে না।

'চুক্তির অন্যতম শর্ত ওটা। পছন্দ না হলে বলুন।'

উত্তর দিল না রানা। মুখের রক্ত সরে গেছে জামানের, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। বেরেটার ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরা আঙুলটার দিকে চেয়ে থাকল ও সতর্ক দৃষ্টিতে, যাতে প্রয়োজন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সামনে থেকে সরে যেতে পারে।

'সময় নষ্ট করছেন আপনি, মাসুদ ভাই,' খানিকটা কঠিন গলায় বলল জামান শেখ। 'অন্য কোন কুচিন্তা মাথায় থাকলে বের করে দিন, ওতে বরং মৃত্যুটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক হবে আপনার।'

'ক্রেমলিনকে শায়েস্তা করার যে পরিকল্পনা নিয়েছ, যদিও জানি না সেটা কি, তবে যা-ই হোক, তা নতুন করে আরেকবার ভেবে দেখো, জামান,' প্রায় অনুনয়ের সুর ফুটল রানার গলায়। 'চেষ্টা করলে কাজটা করতে পারবে তুমি, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তারপর? কেজিবিকে আন্ডার-এস্টিমেট কোরো না, প্লীজ। যদি পালিয়ে যেতে সক্ষমও হও ওদের হাত থেকে, মোসাড ছাড়বে না তোমাকে। ওদের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে। তুমি জানো না, একবার আমাকেও এই একই নোংরা ফাঁদে ফেলেছিল মোসাড। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। আজ তোমাকে...'

'নিজের চিন্তা করুন।' চট্ করে ঘড়ি দেখল সে। 'আমার হাতে একেবারেই সময় নেই, টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে। সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে এক মিনিট সময় দেয়া হল আপনাকে। ষাট সেকেন্ড। এর মধ্যে ঠিক করুন কি করবেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মাসুদ রানা। আর কি করার আছে ওর? আছে, তিক্ত হাসি হাসল রানা। আছে। দুটো কাজ করার আছে। হয় জামানের শর্ত মেনে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, নয়ত এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজের সমাধিস্তম্ভে কি লেখা হবে তার খসড়া তৈরি করা।

সামনে তাকাল রানা। বেরেটার কালচে নলটা সরাসরি ওর মাঝকপালে তাক্ করা। ওটার একটু পিছনে, খানিকটা নিচে, তর্জনীর ওপরের গাঁট ভাঁজ করে ট্রিগার ধরে আছে জামান শেখ। এখন আর কাঁপছে না হাত। স্থির, নিষ্কম্প। শূটিঙে ঠিক রানার মতই চৌকস সে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেখানেই আছড়ে ফেলতে পারবে সে ওর লাশটা। ব্যথা টের পাওয়ার আগেই

মৃত্যু হবে মাসুদ রানার।

টিক্···টক্।

ষাট সেকেন্ড, ভাবল ও, অনেক সময়। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। অজান্তেই উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ। প্রচণ্ড ঝড়ের আগে যেমন থম্ মেরে যায় বাতাস, ঠিক তেমনি। ওদিকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভ এবং জয়া মাসুরভ। ভাষা না বুঝুক, ওদের দুজনের আচরণের যে সার্বজনীন বক্তব্য রয়েছে একমাত্র অন্ধ ছাড়া প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারবে।

টিক্···টক্।

চিন্তাটা হঠাৎ করেই মাথায় এল রানার। একাগ্রচিত্তে অস্ত্রটার নলের দিকে চেয়ে থাকলে একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে হয়ত ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা প্রাণ সংহারী ধাতব টুকরোটা দেখতে পাবে ও মৃত্যুর মাইক্রোসেকেন্ড আগে–কিছুদিন আগে নমপেনে আমেরিকান এক মিশনারী যেমন দেখেছিল। খোলা রাস্তার ওপর এক কাফেতে বসে কফি পান করার সময় থুত্‌নি লক্ষ্য করে ছুটে আসা বুলেটটিকে সে ভেবেছিল মৌমাছি।

টিক্···টক্।

সে তো প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কোনমতে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিল তার সে–অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু রানা? বিন্দুমাত্র চান্স নেই, কাউকে বলে যাওয়ার সুযোগ পাবে না ও আজকের এই অভিজ্ঞতার কথা।

টিক্···টক্।

আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জামান, সেই সঙ্গে একটু একটু করে যেন চোখের ভাষাও বদলে যাচ্ছে। চাউনি অন্তঃসারশূন্য, প্রাণহীন হয়ে উঠছে। রানার মনে হল যেন শেষ সময় কোন বড়রকম দ্বিধার প্রাচীরের সামনে পড়ে গেছে ও, ওটা পেরিয়ে এপাশে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। যেন কথা শোনাতে পারছে না ব্রেনকে, নির্দেশ মানছে না ওর মোটর নার্ভস। ধারণাটা ওর আরও দৃঢ় হল জামানকে চোখ পিট্ পিট্ করতে দেখে।

টিক্···টক্।

অমন করছে কেন ও? চোখে কিছু পড়েছে? কতক্ষণ যেন সময় দিয়েছিল জামান? ও হ্যাঁ, এক মিনিট। ষাট সেকেন্ড। গুলি করার আগে কি শেষবারের মত কোন সঙ্কেত দেবে সে ওকে? দেবে হয়ত। কারণ কখন থেকে সময় গুনতে শুরু করেছে জামান, বা কখন শেষ হবে সীমা, রানা জানে না। ওরও সেকেন্ড গোণা উচিত ছিল, ভাবল রানা, বোকার মত হয়ে গেছে কাজটা। ভুল হয়ে গেছে–জীবনের শেষ ভুল।

টিক্···টক্।

আবার লাফাতে আরম্ভ করেছে। বাঁ চোখের পাতা। চুলের গোড়া বুক পিঠ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে, কোমরের কাছে এসে আটকে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডের নিচের দিকে ভেজা কাপড়ের স্পর্শ পাচ্ছে মাসুদ রানা। গালের

ক্ষতটা দপ্ দপ্ করছে। ঘেমে উঠেছে হাতের তালু। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে আরম্ভ করেছে।

টিক্…

দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা, ছোট্ট গোল একটা ছুঁচোলো ধাতব টুকরো ওর কপাল এবং নলের মাঝখানের দূরত্বটুকু পাড়ি দিতে শুরু করে দিয়েছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ। তামার তৈরি চোখা অগ্রভাগ, শেষ মুহূর্তে…।

টক্।

সশব্দে দম ছাড়ল জামান শেখ। 'সময় শেষ। বলুন, হ্যাঁ, কি না।'

'না।'

দু চোখ সামান্য স্ফীত হল তার। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে খানিকটা, 'না! কেন!'

'সে তোমার জানার প্রয়োজন নেই। আমার জবাব তুমি পেয়েছ, এবার যা করার করে ফেলো।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে দু তিন সেকেন্ড লাগল জামানের। খেপাটে গলায় বলে উঠল, 'আমাকে এমন একটা কাজ করতে বাধ্য করবেন আপনি, কল্পনাই করিনি।'

'কে তোমাকে বাধ্য করেছে?' নরম সুরে শুরু করেছিল ও, কিন্তু থেমে পড়তে হল।

জোরে ধমকে উঠল জামান, 'থামুন! আর একটিও নীতিকথা শুনতে চাই না। এই শেষ সুযোগ। ভেবে বলুন আমার শর্তে রাজি আছেন কি না।'

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী জামানকে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে দেখে অবাক হল রানা। 'একবারই বলেছি।'

'বেশ!' কেঁপে গেল তার গলা। ডান হাতের অবিচল ভাবটাও নষ্ট হয়ে গেছে। কনুইয়ের কাছটা টান টান হয়ে উঠেছে ঝাঁকি সামাল দেয়ার জন্যে। এখন আর সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকিয়ে নেই সে। দু ইঞ্চি ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার চোখ বাঁচিয়ে দেহের ভর আগেই ডান পায়ের ওপর নিয়ে এসেছিল রানা, এখন পুরোপুরি প্রস্তুত লাফ দেয়ার জন্যে। গুলির শব্দ কি করে চাপা দেবে ছেলেটা? ভাবল ও।

কিন্তু কোন গুলি হল না। অস্ত্র ধরা হাতটার কাঁপুনি আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সে ওটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড যুদ্ধ করল সে হাতটার সঙ্গে, ট্রিগারের সঙ্গে। তারপর হাল ছেড়ে দিল। মুহূর্তে শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল দুকাঁধ। হাঁপাতে লাগল জামান শেখ।

দু গালের পেশী কাঁপছে তার। নিজের অক্ষমতায় নিজের ওপরই রেগে উঠতে শুরু করেছে। কপালে চিক্ চিক্ করছে ঘাম। দাঁতে দাঁত চেপে কিছু একটা সহ্য করার চেষ্টা করছে মরীয়া হয়ে। নীরবে ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করছে রানা। এর মধ্যে একবারও ওর চোখের দিকে তাকায়নি সে।

নিজেকে সামলে নিল জামান। 'ঘুরে দাঁড়ান,' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ উঠল তার কণ্ঠে।

'সাহস হারিয়ে ফেলেছ?' বলল রানা। 'বিবেকের বাধা আসছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে গুলি করতে?'

'ঘুরে দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে উঠল জামান শেখ। ঝাঁকি খেয়ে চুলের ডগায় জমে থাকা কয়েক ফোঁটা ঘাম ছিটকে পড়ল। দেয়ালের কাছ থেকে সরে গেল সে. রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অস্ত্র নাচিয়ে ওকে ইশারা করল তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে। খানিকটা ইতস্তত করল রানা। ভেবে দেখল একে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না, পরেরবার হয়ত ট্রিগার টানতে ব্যর্থ হবে না সে। ঘুরে দাঁড়াল ও।

এবার পিছিয়ে যেতে শুরু করল জামান টেবিলটার দিকে। কাছে গিয়ে বাঁ হাত পিছনে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে একটা ড্রয়ার খুলল. নজর সেঁটে আছে রানার ওপর। ড্রয়ারের মধ্যে আবার কয়েক সেকেন্ড হাতড়াল সে. পেয়ে গেল প্রার্থিত জিনিসটি। একটা সাইলেন্সার। দ্রুত ওটা বেরেটার নলে পেঁচিয়ে নিল জামান।

ঘাড় ফিরিয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা, কিন্তু কিছু করার সুযোগ পেল না। রুমের দু মাথায় রয়েছে দুজন, মাঝখানের ব্যবধান প্রায় চোদ্দ ফুট। তার ওপর মাঝখানে বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিভানটা। হাজার চেষ্টা করলেও জামানের কাছে পৌঁছুতে পারত না ও মাঝখানের এই দুই, বড়জোর তিন সেকেন্ড সময়ের মধ্যে। কাজ শেষ হতে ডাকল সে, 'কিরভ!'

দুপা এগোল কিরভ দরজা ছেড়ে।

'এটা নাও,' বেরেটা এগিয়ে দিল সে লোকটির দিকে। চোস্ত রুশ ভাষায় বলল, 'একে নিয়ে যাও বাইরে। কিন্তু সতর্ক থেকো, নইলে আবার বেকায়দায় পড়তে হবে।' একটু থামল জামান, মনে মনে গুছিয়ে নিল বক্তব্য। 'এ লোক চরম বিপজ্জনক, ইচ্ছে করলে তোমার মতো দশজনকে ফাঁকি দিতে পারবে। তার খানিকটা প্রমাণ নিশ্চই পেয়েছ। অতএব মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রেখো। তোমার গাড়িতে নিয়ে তুলবে প্রথমে, তারপর গুলি করবে, সরাসরি মাথায়। কাজ শেষ হলে নদীর তীর ধরে গাড়ি চালিয়ে লাশটা বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর ফেলে দেবে পানিতে। লক্ষ রাখবে লাশটা যেন দুই এক মাইলের মধ্যে পাওয়া না যায়। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।' কিরভের গলার স্বরও পাল্টে গেছে। শব্দ দুটো বেশ জোরালো, গভীর শোনাল।

'আবারও বলছি, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যে-কোন ধরনের ঝুঁকি নিয়ে বসতে পারে এ লোক। কাজেই গাড়ির কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত হাজার গুণ সতর্ক থাকতে হবে।'

'বুঝতে পেরেছি।' বাঁ হাতে রানাকে করিডরের দরজাটা দেখাল কিরভ। 'চলুন।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড জামানের দিকে চেয়ে থাকল রানা অপলক। সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না যুবক, মুখ ঘুরিয়ে নিল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল

রানা, তারপর পা বাড়াল। দরজার কাছে গিয়ে থেমে দাঁড়াল, ঘুরে শেষবারের মত মুখোমুখি হল জামান শেখের। 'নিজে কেন করলে না কাজটা?' মৃদু গলায় অনেকটা সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করল ও।

কিছু বলার চেষ্টা করল জামান, কিন্তু দুতিন বার মুখ খুলেও বুজে ফেলল বাধ্য হয়ে, স্বর ফুটল না কণ্ঠে। গালের পেশী তির তির করে কাঁপছে, ভেতরের আবেগ চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। জামানের অবস্থা দেখে বুকের ভেতরটা বেদনায় মুচড়ে উঠল রানার। তারপর প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল সারা শরীর।

কতদিন থেকে ইঞ্জেকশন পুশ করছে ওকে মোসাড কে জানে। তিলে তিলে ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে ওরা ছেলেটিকে। এখনও যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়নি ও, এ-ই বেশি। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ টিকতে পারবে জামান? হয়ত এবারকার ডোজ, বা তার পরের ডোজ-ই শেষ করে দেবে ওকে, জন্মের মত স্মৃতিভ্রষ্ট করে দেবে।

আমি আবার আসব, জামান মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিল মাসুদ রানা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, যে ভাবে হোক তোমাকে এ থেকে উদ্ধার করবই। ঘুরে দাঁড়াল ও। এই সময় পিছন থেকে জামানের কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ কানে এল।

'বিদায়, মাসুদ ভাই,' অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল সে।

ছয়

করিডর পেরিয়ে সামনের রুমে চলে এল মাসুদ রানা। পিছনে কিরভের পায়ের শব্দ। অনুমান ওর ছয় ফুট পিছনে আছে লোকটা। নিরাপদ দূরত্বে। শেষ পর্যন্ত এ দূরত্ব বজায় থাকলে রানার পক্ষে কিছু করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। ড্রইংরুম পেরিয়ে বন্ধ দরজার সামনে থেমে পড়ল ও।

'দরজা খুলুন!' কঠিন কণ্ঠে বলল কাপিস্তা কিরভ। সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। রানার হাতে হেনস্তা হওয়ার কথা ভোলার নয়। সে-কথা মনে পড়লে এখনও গায়ের মধ্যে চিড়বিড় করে উঠছে। রানাও ব্যাপারটা ভালই বুঝতে পারছে। তাই গোবেচারার মতো পালন করে চলেছে লোকটির হুকুম। আরও কিছুক্ষণ সহ্য করতে হবে কাপিস্তা কিরভকে, অন্তত কারপার্ক পর্যন্ত। প্ল্যাটফর্মে পা রেখে ইতস্তত করল রানা এক মুহূর্ত, তারপর নামতে শুরু করল।

সিঁড়ির শেষ ধাপ মাড়িয়ে ফ্লোরে পা রাখল রানা। এই সময় মাঝ-বয়সী এক লোক এসে ঢুকল সিঁড়িরুমে, বাইরে থেকে আসছে। রানার পিছনে কিরভকে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে। 'গুড ইভনিং, কমরেড ভ্যালেরি।'

লোকটিকে দেখামাত্র অস্ত্র ধরা ডান হাত ওভারকোটের পকেটে সেঁধিয়ে দিয়েছিল কিরভ। পাল্টা দাঁত দেখাল সে আগন্তুককে। 'গুড ইভনিং।'

'আবার বেরোচ্ছেন?' বলল লোকটা। 'যে কোন সময় প্রবল তুষার ঝড় শুরু হয়ে যেতে পারে, ওয়েদার ফোরকাস্ট শোনেননি?'

'উপায় নেই, ভাই। পলিটব্যুরোর চাকরি করি, যেতেই হবে। কর্তার হুকুম,' চোখ ইশারায় রানাকে দেখাল কিরভ। 'দেখছেন না, পেয়াদা হাজির তলব নিয়ে?'

'ও, হ্যাঁ। আপনাদের তো ঝামেলা আছে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আসছেন নাকি কাল?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে, পরে দেখা হবে।' ওদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল লোকটা।

চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েও ইচ্ছে করেই নিল না মাসুদ রানা। আগন্তুককে জাপটে ধরে ওদের দুজনের মাঝখানে বাধা হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারত ও সহজেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকেও হত্যা করত কিরভ। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে, কেউ কিছু টের পেত না। নিজেকে রানা সেই ফাঁকে রক্ষা করতে পারত ঠিকই, কিন্তু মধ্যে থেকে অনর্থক একটা প্রাণহানী ঘটত। 'চলুন!' ধমকে উঠল কিরভ।

আবার পা বাড়াল ও। অস্ত্র হাতে পেয়ে পুরো বদলে গেছে ব্যাটার আওয়াজ। অথচ ঘণ্টাখানেক আগেও মিনমিনে সুরে কথা বলেছে সে ওর সঙ্গে। পোর্চ পেরিয়ে বরফমোড়া খোলা প্রাঙ্গণে পা রাখল মাসুদ রানা। চট করে নজর বুলিয়ে নিল পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপর। কিরভের সিরেনাসহ সর্ব মোট বারোটা গাড়ি। রাস্তার ফ্যাকাসে নীলচে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে ওগুলোর চকচকে গায়ে লেগে।

আরও একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। এইমাত্র চোখে পড়েছে রানার। পার্কের এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। ওটা একটা পিক্‌আপ ভ্যান। মোট তেরোটা। কভার হিসেবে দারুণ। যদি ব্যবহার করার সুযোগ করে নেয়া যায়। কিন্তু যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে মাঝখানে। সবচেয়ে কাছেরটা একটা মস্কভিচ, কম করেও বিশ ফুট দূরে আছে রানার। অজান্তেই হাঁটার গতি খানিকটা পড়ে এসেছিল ওর, তাই আবার ধমক খেতে হল।

'পা চালান!'

গুনে গুনে পাঁচ পা এগোল মাসুদ রানা। তারপর কথা বলে উঠল। 'কিরভ, তুমি জানো আলেকজান্ডারের সাথে কি বিষয়ে আলাপ হয়েছে আমার এতক্ষণ?'

'না।' বিন্দুমাত্র আগ্রহের সুর প্রকাশ পেল না লোকটার কণ্ঠে।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। 'ও আমাকে একটা অফার দিয়েছিল, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি। এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি। অফারটা গ্রহণ করা উচিত ছিল।'

'এদিকে তাকাবেন না।'

'অফারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছি আমি।'

'সোজা হাঁটতে থাকুন সিরেনার দিকে।'

সময় নষ্ট করার জন্যে তর্ক জুড়ে দিল রানা, 'কিন্তু আলেকজান্ডারকে জানানো দরকার ব্যাপারটা, বুঝতে পারছ না তুমি।'

'বোঝা হয়ে গেছে। এগোন, সোজা সিরেনার দিকে।' কিরভ খুব গম্ভীর।

'তুমি জানো নিশ্চই আলেক্স আর আমি একসঙ্গে কাজ করি? ও বলেনি তোমাকে?'

সোজা সাপ্টা উত্তর দিল লোকটা। 'না।'

একটা ঢোক গিলল রানা। আর পনেরো ফুট দূরে আছে সিরেনা। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে পথটুকু। 'আমরা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিরভ। অফার ফিরিয়ে দিয়ে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি আমি। তাই আরেকবার দেখা করতে চাই আলেক্সের সঙ্গে।'

কিরভ উত্তর দিল না।

দশ ফুট।

গলায় সামান্য রাগ রাগ ভাব ফোটাল এবার মাসুদ রানা। 'তুমি আমাকে আলেক্সের সাথে দেখা করতে বাধা দিচ্ছ, ব্যাপারটা যদি ওর কানে যায় কখনও, কি হবে ভেবে দেখেছ?'

উত্তর নেই।

পাঁচ ফুট।

ড্রাইভারের দরজার দিকে এগোচ্ছিল রানা। পিছন থেকে বাধা দিল কিরভ। 'উঁহুঁ, এদিকে নয়, ওদিকে।'

ঘুরে সামনের প্যাসেঞ্জারস ডোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'দরজা খুলুন।'

খুলল রানা। ফুটবোর্ডে একটা পা তুলে দিয়ে ঘুরে তাকাল। ভীষণ ঠাণ্ডা। গাছপালার ভেতর দিয়ে অনেক দূরে একটা গির্জার আলোকিত গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। গম্বুজের শীর্ষে দণ্ডের সঙ্গে ফিট করা আছে একটা ইলিউমিনেটেড লাল নক্ষত্র। জ্বল জ্বল করছে। ওটার পাশেই কিরভের মুখের অবয়ব, মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারাটা পরিষ্কার নয়।

'ঢুকে পড়ুন!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল কিরভ। একটা গাড়ির আওয়াজ কানে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভয় পাচ্ছে এদিকেই না এসে পড়ে ওটা।

উপায় নেই। এখনও ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রেখেছে কিরভ। কিছু করার জো নেই দেখে নির্দেশ পালন করল রানা বাধ্য হয়ে। কিন্তু দরজা বন্ধ করল না, খোলাই রেখে দিল। বেরেটা ধরা হাতটা পকেট থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছে কিরভের। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল সে, 'জানালার কাঁচ নামান! জলদি!'

বাঁ হাত বাড়াল রানা দরজার সঙ্গে ফিট করা সস্তা অ্যালুমিনিয়ামের কাঁচ ওঠানো-নামানোর হাতলটার দিকে। ওটার কর্মকাণ্ডের ওপর সেঁটে আছে এখন কিরভের নজর। প্রয়োজনের বেশি সময় নিয়ে হাতল ঘোরাচ্ছে রানা, ওদিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কী পয়েন্টে ঝুলে থাকা চাবির গোছাটার দিকে। ওখানেই গোছাটা ছেড়ে গিয়েছিল রানা তখন।

মুঠ করে চেপে ধরে ওটা খুলে আনল রানা কী পয়েন্ট থেকে। বেশ ভারী গোছাটা, অনেকগুলো চাবি রয়েছে। অন্যদিকে ঝাঁকি খেতে খেতে একটু একটু করে নামছে জানালার কাঁচটা, থেকে থেকে আটকে যাচ্ছে রাবার ফ্ল্যাঞ্জে, আবার নামছে। রানার কারণে নয়, গাড়ির বডিওয়র্কের দোষে। এক সময় শেষ হল কাজটা।

'দরজা বন্ধ করুন,' ব্যস্ত গলায় নির্দেশ দিল কাপিস্তা কিরভ। খোলা থাকলে লাশ গড়িয়ে বাইরে এসে পড়তে পারে। সে-ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। রানার দেরি দেখে আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় ভারী কিছু একটা উড়ে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়ল নাকে-চোখে। টলে উঠল কিরভ। বাঁ হাতে 'থ্যাপ্' শব্দে চেপে ধরল বাঁ চোখ—আঘাত লেগেছে। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল সে।

এর পরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত, প্রায় চোখের পলকে ঘটে গেল। চাবির গোছা ছুঁড়ে মেরেই ওপাশের ড্রাইভারের দরজা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল মাসুদ রানা। কেঁপে উঠল খুদে সিরেনা, ক্যাঁচ-কোঁচ মহা আর্তনাদ জুড়ে দিল তার জঙ ধরা স্প্রিংগুলো। বিস্ফোরিত হল ড্রাইভারের দরজা, সাঁৎ করে দেহের ওপরের অংশ প্রায় পুরোটাই বাইরে গলিয়ে দিয়েছে রানা। একই সঙ্গে 'ভ্যাঁ-অ্যাঁ' করে সশব্দে বেজে উঠল সিরেনার হর্ন। লোকটিকে ফিজিক্যাল শকের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাউন্ড শক দেয়ার জন্যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় চট্ করে হর্ন চেপে দিয়েছে মাসুদ রানা।

চোখের দুঃখ আপাতত জোর করে ভুলে থাকতে চাইল কিরভ, দ্রুত সামলে নিয়ে বেরেটা তুলেছিল রানার ছায়া লক্ষ্য করে, তখনও ওর পা জোড়া ভেতরেই রয়েছে। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার আগমুহূর্তে আচমকা গগনবিদারী হর্নের আওয়াজে চমকে উঠল সে ভীষণভাবে, ফলে নিশানা কেঁপে গেল। কোটের হাতায় এক হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রানা, পরক্ষণেই বরফে কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়ল ও।

ওর মধ্যেও সাইলেন্সারের মৃদু 'ফুট্' আওয়াজ ওর কানে এসেছে। এক গড়ান দিয়েই পিছনের দরজার আড়ালে বসে পড়ল রানা। একটাই ভাবনা এখন ওর মাথায়, ব্যাটাকে দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়াতে হবে, চেম্বার শূন্য করে ফেলাতে হবে বেরেটার। ঝুঁকে পড়ে সিরেনার তলা দিয়ে ওপাশে তাকাল রানা। প্রথমেই একজোড়া পায়ের ওপর চোখ পড়ল, নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে গাড়ির সামনের দিকে। ঘুরে এপাশে আসতে চায়।

একটু একটু করে জানালা পর্যন্ত মাথা ওঠাল রানা, তারপর কিরভকে কাঁধ এবং পিঠের খানিকটা অংশ দেখিয়েই আবার ঝপ্ করে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল, 'ফুট্'। নাহ্, এতে বিপদ আছে। ভাবল মাসুদ রানা, ও যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ দ্রুত রিঅ্যাক্ট করেছে লোকটা। এতটা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হয়নি, মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারত এখনই। পা টিপে টিপে পিছিয়ে যেতে শুরু করল ও। সিরেনার পিছনেই একটা পবেদা, ওটার আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আরেকবার উঁকি দিল রানা সিরেনার পেটের তলা দিয়ে। থেমে নেই কাপিস্তা কিরভ, ধীরপায়ে এগোচ্ছে। প্রায় পৌঁছে গেছে গাড়ির নাকের কাছে। পিছু হটার গতি দ্রুত করল রানা। আরেকবার পা দুটোর শেষ অবস্থান দেখে নিয়েই ঘুরে দৌড় দিল পিছনের গাড়ির আড়াল নেয়ার জন্যে। কিন্তু উত্তেজনায় বরফের কথা বেমালুম ভুলে বসেছিল ও, দু পা যেতেই পিছলে গেল ডান পা-টা, আছড়ে পড়ল রানা উপুড় হয়ে।

'ফুট্'।

ওর মাথার চুল দু ভাগ করে বেরিয়ে গেল তপ্ত মৃত্যু, ঝন্ ঝন্ শব্দে চুরমার হয়ে গেল পবেদার একটা হেডলাইট। একটুও বিরতি না দিয়েই আবার গুলি করল কিরভ। হ্যাঁচকা টান খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা, গ্রেটকোটের কাঁধের কোথাও সেঁধিয়ে গেছে বুলেটটা। অল্পের জন্যে মিস্ করেছে কাঁধের পেশী। ওই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে পবেদার সামনের একটা টায়ার ধরে গায়ের জোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল রানা।

পতনের ফলে এমনিতেই পিছলে এগিয়ে যাচ্ছিল রানা পবেদার দিকে, এবার রকেটের গতি পেল তা। সড় সড় করে চোখের পলকে পিছনের টায়ারের কাছে পৌঁছে গেল রানা, মুহূর্তে একটা পাক খেয়ে চলে গেল পবেদার আড়ালে। কিন্তু তার আগেই গুলি খেল ও। আগুনে পোড়ানো গনগনে গরম শিকের ছোঁয়া লাগল যেন ঘাড়ের পিছনে, 'ছাঁৎ' করে জ্বলে উঠল সর্বাঙ্গ।

বাঁ হাতে স্থানটা চেপে ধরল রানা, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। দ্রুত উঠে বসল ও। এক খাবলা চামড়া হাওয়া হয়ে গেছে ওখানকার। দরদর করে রক্ত ঝরছে, নিমেষে শার্ট-কোটের কলার ভিজে উঠল। কিন্তু এ মুহূর্তে তা নিয়ে সময় নষ্ট করা চলবে না। কটা গুলি ছুঁড়েছে হারামজাদা? দাঁতে দাঁত চেপে হিসেব কষে ফেলল রানা, চারটা? নাকি পাঁচটা? পাঁচটাই হবে। আর তাহলে মাত্র একটা বুলেট আছে অবশিষ্ট। যদিও তাতে খুশি হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। হয়ত ওটাই রানার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

কিরভকে হারিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, কোথাও দেখতে পাচ্ছে না তাকে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক! কে জানে অন্ধকারে কোথাও বসে ওর কলজে সই করছে কি না। ও কি হিসেব রেখেছে কটা গুলি করা হয়েছে? রেখে থাকলে নিশ্চয়ই আবার ট্রিগার টানার আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নেবে যে গুলিটা ওকে বিঁধবেই।

হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করল রানা। বরফ-ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি গিয়ে আঘাত করছে ওর ফুসফুসে। এরই মধ্যে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে ঘাড়ের রক্ত। ভেজা কলারের সঙ্গে জায়গাটার স্পর্শ ভীষণ রকম অস্বস্তিকর। হঠাৎ জমে গেল ও। কাছেই কেউ সশব্দে আছড়ে পড়েছে বরফের ওপর।

কিরভ!

এক মুহূর্ত পরই আবার পিছু হটতে লাগল রানা, এবার অনেক দ্রুত। লোকটা সামলে ওঠার আগেই কোণের পিকআপ ভ্যানটার আড়ালে পৌঁছুতে

চায়। প্রায় পৌঁছে গেছে রানা জায়গামত, এই সময় পিছনে কোথাও পায়ের আওয়াজ উঠল। কিন্তু এখন আর অতটা ভয় নেই, এখানটা বেশ অন্ধকার। কাজেই চলা অব্যাহত রাখল ও।

দুই কি তিনবার কিরভের পা ফেলার মৃদু আওয়াজ পেল রানা, তারপরই আবার সড়াৎ, ধুম! পিকআপের পিছনে গিয়ে বসে পড়ল ও এদিকে ফিরে। আর কোন আওয়াজ নেই। নিজের ফেলে আসা পথ এবং প্রাঙ্গণের চারদিকে চোখ বোলাল রানা, কোথাও নেই কাপিস্তা কিরভ। নাকি আছে? ট্রাকটার ওপাশেই, ওর কয়েক গজ তফাতে?

যেভাবে ছিল সেভাবেই বসে থাকল মাসুদ রানা কান খাড়া করে। কিন্তু কোথাও কোন আওয়াজ নেই। চারদিকে কবরের নিস্তব্ধতা। কিরভও কি বসে আছে ওর তরফ থেকে কোন শব্দ ওঠার আশায়? কোথায় লোকটা? একটা ছুরি চাকুও যদি সঙ্গে থাকত, আফসোসের সঙ্গে ভাবল রানা, মনে জোর পাওয়া যেত।

ভাবতে ভাবতেই চিন্তাটা মাথায় এল। এক খাবলা বরফ তুলে নিয়ে দুই হাতের তালু দিয়ে টেনিস বলের চেয়ে কিছুটা বড় একটা বল বানিয়ে ফেলল ও। তারপর চাপতে শুরু করল বলটা। চারদিক থেকে চাপ খেতে খেতে একসময় ভেতরের ছোটখাট ফাঁকগুলো ভরাট হয়ে গেল, লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল স্নো বলটা। হাতের তালুতে নাচিয়ে বলের ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। কম করেও ছয়শ গ্রাম হবে। যথেষ্ট। ঠিকমত আঘাত লাগলে এতেই নাক মুখ সমান হয়ে যাবে কাপিস্তা কিরভের।

অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করতে লাগল ও। ভাবল, নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। থেমে পড়ল ও, আবার আওয়াজটা উঠেছে–বরফে ভারী বুটের হালকা চাপের মৃদু মুড়-মুড় শব্দ। এক দুই করে নয়বার উঠল পা ফেলার আওয়াজ, তারপর আবার সব নীরব। না; আবার শোনা গেল।

তবে এবার বেশ অদ্ভুত লাগল আওয়াজটা। মনে হল যেন একসঙ্গে দুই পা বরফে পড়ছে কিরভের। ব্যাপার কি! ভুরু কোঁচকাল রানা। উবু হয়ে ট্রাকের তলা দিয়ে সামনেটা দেখার চেষ্টা করল, এবং আঁতকে উঠল ভীষণভাবে। ওর মাত্র তিন হাত তফাতে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে একই কাজ করছিল কিরভ, উঁকি মেরে তলা দিয়ে রানাকে দেখা যায় কি না দেখছিল।

দেখা হয়ে গেল। চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের। ঝট্ করে বেরেটা তুলল কিরভ, কিন্তু গুলি করল না সঙ্গে সঙ্গেই। ওটা নাচিয়ে রানাকে উঠে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল সে নীরবে। সেই সঙ্গে দাঁত খিঁচাল হায়েনার মত। দুহাত মাথার ওপর তুলে উঠে দাঁড়াল রানা ধীরে ধীরে। স্নো বল ধরা ডানহাতের তালু ঘুরিয়ে রেখেছে পিছনদিকে, যাতে জিনিসটা তার চোখে না পড়ে। মুহূর্তের ব্যবধানে ওর সামনে এসে দাঁড়াল কিরভ। মুখে বিজয় এবং বিদ্রূপের হাসি। হাসিটা বজায় থাকতে থাকতেই মারল রানা।

সর্বশক্তি দিয়ে ছোঁড়া বলটা 'ধপ্' শব্দে আছড়ে পড়ল তার নাকের ওপর। দেশী ভাষায় অস্ফুটে 'বাবারে···এ···এ!' করে উঠল কিরভ। নাক চেপে ধরল

সে। হাঁটু ভেঙে যাচ্ছিল, বহুকষ্টে সামাল দিল। আছড়ে পড়েই চুরমার হয়ে গেল বরফের বল, পলকে সাদা হয়ে গেল কিরভের সারামুখ-দাড়ি-গোঁফ। অন্ধ আক্রোশে তীব্র যন্ত্রণায় উন্মাদ বনে গেল কিরভ। রানার বুক সই করে টেনে দিল ট্রিগার।

ওদিকে বলটা ছুঁড়ে দিয়েই বসে পড়েছিল রানা ঝপ্ করে। কিরভকে ল্যাঙ মারার জন্যে রাঁ পায়ের পাতা আঁকশির মত বাঁকা করে তার হাঁটুর পিছনে পা বাধিয়ে সামনের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল কিরভকে। রানার পাশেই আছড়ে পড়ল কিরভ মুখ থুবড়ে। কিন্তু তার আগেই গুলি খেয়েছে রানা। বাঁ কাঁধের মাংসল পেশীতে সেঁধিয়ে গেছে বেরেটার শেষ বুলেটটা। চাপা আর্তনাদ করে উঠল মাসুদ রানা।

ক্ষতটা চেপে ধরে বরফের ওপর দ্রুত দেহটা মুচড়ে নিজেকে ঘুরিয়ে নিল ও, তারপর দুই পা জড়ো করে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল লোকটার কানের পাশে। গুঙিয়ে উঠল কিরভ, সড় সড় করে পিছলে সরে গেল দেহটা তিন-চার ফুট। ধড়মড় করে উঠে বসল সে, অস্ত্রটা এখনও হাতে ধরা আছে। নাকটা আগেই ভেঙেছে, লাথির চোটে কানের কাছে আরও একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দুটো থেকেই সমানে রক্ত গড়াচ্ছে।

রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে লোকটা। গুলিয়ে ফেলেছে হিসেব। পিস্তল তুলেই আবার ট্রিগার টানল সে। 'ক্লিক!' চমকে উঠল কিরভ। আবার টানল ট্রিগার। পিস্তল নীরব। এইবার ভয় পেল সে। চট্ করে দু পা পিছিয়ে গেল। রানা ততক্ষণে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসেছে। প্রথমে মনে সামান্য ভয় ছিল, কিন্তু বেরেটার বুলেটশূন্য খালি চেম্বারে 'ক্লিক' আওয়াজ উঠতে বুঝেছে ওর হিসেব ঠিকই ছিল।

যন্ত্রণায় চোখমুখ বিকৃত করে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। এই সময় কারপার্কের ও প্রান্তে দড়াম দড়াম করে দুবার গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল এঞ্জিন, দ্রুত লট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়িটা। তুমুল বেগে ছুটে চলল বড় রাস্তার দিকে।

মুহূর্তখানেকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মাসুদ রানা। সুযোগটা লুফে নিল কাপিস্তা কিরভ। বেরেটা ফেলে দিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটতে লাগল। পালাচ্ছে প্রাণ ভয়ে। একদৌড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল সে। দেখতে দেখতে গায়েব হয়ে গেল অন্ধকারে। লোকটাকে ধাওয়া করার ইচ্ছে থাকলেও দু তিন পা-র বেশি এগোতে পারল না, ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা হাঁটু ভেঙে।

ঝিম্ মেরে বসে থাকল কয়েক সেকেন্ড। তর্জনী দিয়ে খুঁজছে বুলেটটা কোথায় বিদ্ধ হল। পাওয়া গেল গর্তটা। ওটা স্পর্শ করা মাত্র বুঝল ও, ভালমতই বিঁধেছে বুলেট। বের করতে ছোটখাট অপারেশন প্রয়োজন হবে। ব্যথায় আঁধার হয়ে আসছে দৃষ্টি, ঘন ঘন গরম হয়ে উঠছে মাথা। অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে ঘটছে ব্যাপারটা।

প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে নিজেকে দাঁড় করাল মাসুদ রানা। এখানে পড়ে থাকলে রক্তক্ষরণেই মারা পড়তে হবে। কিরভের ফেলে যাওয়া অস্ত্রটা

তুলে নিল ও, যথাসম্ভব দ্রুত পা বাড়াল সিঁড়িরুমের দিকে। জামান শেখকে চাই ওর। কেমন এক ঘোরের মাথায় উঠে এল ওপরে। ওর কাছে অস্ত্র থাকতে পারে, বা নিজের এই অবস্থায় ছেলেটির সঙ্গে লড়তে গেলে মৃত্যুও হতে পারে, সে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না রানা। ভাবছে বেরেটা দেখালেই ঠাণ্ডা মেরে যাবে জামান শেখ। তারপর কৌশলে তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেবে নিজের ওয়ালথার পিপিকে। এবং···।

পনেরো এ-র বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে রানা। নড়াচড়া করতে মোটেই মন চাইছে না। শুয়ে পড়তে পারলে ভাল লাগত। জোর করে পূর্ণ চোখ মেলল ও, ঝাঁকি দিয়ে মাথার জড়তা দূর করার চেষ্টা করল। ভেতর থেকে বন্ধ কি না দেখার জন্যে আলতো করে হাত রাখল দরজায়। খুলে গেল পাল্লা দুটো। ভেতরে নিকষ কালো অন্ধকার।

নেই ওরা। কেউ নেই ভেতরে। আর সব যেখানে যেমনটি ছিল তেমনি পড়ে আছে। ডিভানের ওপর ওয়ালথারটা পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল মাসুদ রানা। একটু আগের গাড়ির আওয়াজের কথা মনে পড়ল। জামান শেখ আর জয়া মাসুরভ ছিল নিশ্চয়ই ওরা। বাইরে কোথাও গেছে? নাকি সরে পড়েছে প্যাভিলন ছেড়ে?

পলকে দুর্বলতা কেটে গেছে মাসুদ রানার। ভুলে গেছে ব্যথার কথা। প্রায় দৌড়ে সামনের রুমে চলে এল ও, বেরিয়ে যাবে। এই সময় একটা টেলিফোন সেটের ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। এক কোণে নিচু একটা টেবিলের ওপর রাখা আছে সেটটা। কিছু একটা ভাবল ও, পায়ে পায়ে সেটটার কাছে এসে দাঁড়াল। রিসিভার কানে তুলতে পরিষ্কার ডায়াল টোন পাওয়া গেল।

দ্রুত একটা নম্বর ঘোরাল রানা। দু বার রিঙ হওয়ার পর সাড়া দিল ওপ্রান্ত। দৃঢ়, চাপা গলায় কথা বলতে শুরু করল রানা।

সাত

রাত বারোটা। এলোমেলো জোরাল বাতাস বইছে বাইরে। আগের থেকে অনেক ঘন ও পুরু হয়েছে তুষার। বাতাসের ধাক্কায় একবার এদিক একবার ওদিক করছে শূন্যে। দমকা বাতাসে থেকে থেকে জানালার কাঁচের ফ্রেমে ঝনঝন আওয়াজ তুলছে। শুরু হয়ে গেছে তুষার ঝড়।

ঘরের মধ্যিখানে একটা সিঙ্গল খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মাসুদ রানা। অজ্ঞান। ওর পিঠের নিচে বড়সড় একটা অয়েলক্লথ বিছানো, রক্তে থৈ-থৈ করছে। মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে একমনে কাজ করছে তানিয়া ফিওদরভা, কাঁধের বুলেটটা বের করার চেষ্টা করছে রানার। হ্যারল্ড টিলসন তার পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ।

'ভাগ্য ভাল কোন আর্টারিতে আঘাত লাগেনি।' ছোট চোখা মাথার একটা

চিমটা দিয়ে ধরে টান মেরে বুলেটটা বের করে আনল তানিয়া। অন্যহাতে ক্ষতমুখটা চেপে ধরল তুলো দিয়ে। 'ভদ্রলোকের সাংঘাতিক জীবনীশক্তি। কি করে এই অবস্থায় এত পথ গাড়ি চালিয়ে এলেন তাই ভাবছি।' মুখ তুলল সে। 'প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে। রক্ত দিতে হতে পারে।'

'তাই নাকি?' মুখ শুকিয়ে গেল টিলসনের। 'এখন উপায়? ওর রক্তের গ্রুপও তো জানি না। আন্দাজে···'

'ওটা কোন ব্যাপার নয়। আগে ব্যান্ডেজ দুটো শেষ করি, তারপর গ্রুপ টেস্ট করে দেখব।'

'দেখো দেখো, তাড়াতাড়ি করো।' রানার ঘাড়ের কাছের অয়েলক্লথের নিচে তাকিয়ে আপনাআপনি দুগাল কুঁচকে উঠল টিলসনের। রক্ত জমে ছোটখাট একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে ওখানটায়। 'ইশ্‌শ্‌!'

রুমটাকে পুরোপুরি হাসপাতালের ওয়ার্ড বানিয়ে ফেলেছে তানিয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে। ঘুমিয়ে পড়েছিল, বারোটার দিকে ডোরবেলের আওয়াজে ঘুম ভাঙে তার। পীপহোলে চোখ রেখে রানাকে কাঁধ চেপে ধরে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিল। দ্রুত ভেতরে নিয়ে আসে ওকে। বিছানায় শুইয়ে প্রথমেই একটা ব্যথা কমাবার ওষুধ ইনজেক্ট করে সে, এবং তারপর টেলিফোন করে টিলসনের বিশেষ নম্বরে।

পাশের রুম থেকে একটা টেবিল টেনে আনা হয়েছে খাটের কাছে। তার ওপর মাঝারি সাইজের দুটো প্লাস্টিকের গামলা। একটায় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে রক্তে ভেজা তুলো, অন্যটিতে পরিষ্কার পানি। পাশে একটা ট্রে, তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ছুরি কাঁচি চিমটা সিরিঞ্জ ইত্যাদি। আর আছে দুটো সাদা তোয়ালে, গজ-ব্যান্ডেজ এবং নানারকম ক্যাপসুল ট্যাবলেট ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল। বিচিত্র গন্ধে ভরে আছে ঘর।

নতুন ক্ষত দুটো ব্যান্ডেজ করতে প্রচুর সময় লাগল তানিয়ার। ঘাড়েরটা মারাত্মক কিছু নয়, সামান্য চামড়া তুলে নিয়ে গেছে শুধু বুলেট। এরপর গালেরটা নিয়ে পড়ল। ওটা খুলে ভেতরে নজর বোলাল মেয়েটি, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল। 'ঠিকই আছে এটা। টান ধরেছে, শুকোতে আরম্ভ করেছে।' নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দিল সে ওখানে। সবশেষে রক্তের গ্রুপ বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কাজের ফাঁকে মুখ চলছে তানিয়া ফিওদরভার। 'একেকজনের দেহে রক্তের পরিমাণ একেক রকম। এঁরটার পরিমাণ যা-ই হোক, কম করেও এক তৃতীয়াংশ বেরিয়ে গেছে।' মিনিটখানেক মুখ বুজে কাজ করল সে, তারপর ঘোষণা করল, 'ও পজিটিভ। মুশকিল, এটা রেয়ার গ্রুপ।'

'কখন পুশ করতে হবে?' প্রশ্ন করল টিলসন।

'পেলে এখনই শুরু করে দিতাম। তবে খেয়াল রাখবেন, কেবল গ্রুপ মিললেই চলবে না, সব ধরনের জীবাণুমুক্ত হতে হবে অবশ্যই। নইলে পুশিং শুরু করার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খিঁচুনি আরম্ভ হয়ে যেতে পারে।'

'আচ্ছা, দেখি,' পাশের রুমের দিকে পা বাড়াল টিলসন। আনরেজিস্টার্ড

টেলিফোন সেটটা আছে ও ঘরে। 'অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

রুমটা ছোট, অন্ধকার। ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘরের এক কোণে গিয়ে বসল টিলসন। পুরানো একটা কাঠের বাক্স সরিয়ে খালি করল জায়গাটা। তারপর পাশের দেয়ালের এক জায়গায় বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল। মৃদু গুঞ্জন উঠল, এক ফুট বাই এক ফুট পরিমাণ মেঝে সামান্য নিচু হয়ে ঢুকে গেল ভেতরদিকে। ফাঁকটা গলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে এল টেলিফোন সেটটা। দেখতে সাধারণ সেটের মতই, তবে তার নেই কোন। প্রয়োজন পড়ে না।

এটির শক্তির উৎস রিমোটলি কন্ট্রোলড্ এক অত্যন্ত শক্তিশালী ইলেক্ট্রোনিক ডিভাইস। রেঞ্জ দশ কিলোমিটার। এখানে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা হলেও কল এলে সহজেই টের পায় এ বাড়ির একমাত্র অধিবাসী, তানিয়া ফিওদরভা। তার হাতঘড়ি মৃদু কির কির আওয়াজ তুলে জানান দেয় ডাকা হচ্ছে তাকে।

ফোনে দুমিনিট কথা বলল হ্যারল্ড টিলসন। তারপর সব আগের মত করে রেখে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। চেহারা দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট মনে হল তাকে। কিন্তু পাশের রুমে পা রাখতেই চোখ কপালে উঠল তার সামনের দৃশ্য দেখে। বিছানার সঙ্গে মাসুদ রানাকে চেপে ধরে রেখেছে তানিয়া। অনুনয়ের সুরে বলছে, 'প্লীজ, কথা শুনুন, আপনার অবস্থা ভাল না···'

ওঠার জন্যে জোরাজুরি করেও খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না রানা দুর্বলতার কারণে। 'কি হয়েছে?' একলাফে খাটের অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়াল টিলসন। 'অমন করছে কেন?'

'আহ্!' চরম বিরক্তিতে পা ছুঁড়ল রানা। লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল পানির গামলা। 'বললাম তো আমি সুস্থ আছি। ছেড়ে দিন, ছাড়ুন!'

'ঠিক আছে, শান্ত হও।' গলাটা চেনা চেনা লাগল রানার। 'তানিয়া, ছাড়ো ওকে।'

টিলসনের সাহায্যে উঠে বসল মাসুদ রানা। বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে আছে, একটা আঙুলও নাড়ানো যাচ্ছে না। চারদিক তাকিয়ে অবাক হল ও। 'আমি এখানে কেন?' বলতে বলতে দু পা নামিয়ে দিল বিছানা থেকে, টিলসনের হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরটা দুলে উঠল ভীষণভাবে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল ও জ্ঞান হারিয়ে। তৈরি ছিল টিলসন, মাথাটা মেঝেতে আঘাত করার আগেই ধরে ফেলল দেহটা।

আড়াইটার দিকে জ্ঞান ফিরল রানার। চোখ মেলতেই মাথার কাছে চেয়ারে বসা টিলসনকে দেখতে পেল আবছাভাবে। তানিয়া ওর পায়ের দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওকে চোখ মেলতে দেখে সিধে হল সে। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসতে সরু পাইপটার ওপর নজর পড়ল রানার, ওপরে ঝোলানো একটা ব্লাড ব্যাগ থেকে নেমে এসেছে। প্রান্তভাগের লম্বা সূচটা বিঁধে আছে ওরই ডান কব্জির সামান্য ওপরে। বোকার মত ব্যাগটার দিকে চেয়ে থাকল রানা।

'কেমন বোধ করছ?' আলতো করে ওর কপালে হাত রাখল টিলসন।

'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি?' বিচ্ছিরি কর্কশ স্বর বেরোল রানার গলা দিয়ে।

'প্রায় দেড় ঘণ্টা।'

'সর্বনাশ!' সূচ খোলার জন্যে হাত বাড়াল ও, সঙ্গে সঙ্গে হাতটা চেপে ধরল টিলসন।

'করছ কি, পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

তেতো এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ফ্যাকাসে মুখে। শুকনো জিভ দিয়ে তারচেয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'ওটাই কেবল বাকি আছে। হতে পারলে বেঁচে যেতাম।'

'কি হয়েছে?'

'পানি।'

তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে এল তানিয়া ফিওদরভা। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে গ্লাস খালি করে ফেলল ও।

'টেক ইট ইজি, ম্যান। খুলে বলো, কি ঘটেছিল। কিন্তু ব্যাগ খালি না হওয়া পর্যন্ত ওঠা চলবে না। শরীরে একদম রক্ত নেই তোমার।'

শুনেও শুনল না রানা। 'কটা বাজে?'

'পৌনে তিনটে।'

'এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না,' রাগ-রাগ গলায় বাধা দিল তানিয়া। 'রেস্ট করুন। আলাপ পরে করলেও চলবে।'

'সময় নেই,' এক কথায় মেয়েটিকে থামিয়ে দিল রানা। টিলসনের দিকে ফিরল। 'শোনো, এক্ষুণি বেরোতে হবে আমাকে। এখানে পড়ে থাকলে কেয়ামত হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এ অবস্থায় কি করে বের হবে? হাঁটতেই তো পারবে না।'

'পারব।' কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল রানা। 'এখন আগের থেকে অনেক সুস্থ বোধ করছি। শুধু একটু প্রোটিনের অভাব...'

ছুটে এল তানিয়া রানাকে সার্জিক্যাল টেপসহ সুঁইটা একটানে চড় চড় করে টেনে তুলতে দেখে। 'আরে...আরে, কি করছেন!'

'দাঁড়াও।' মেয়েটিকে বাধা দিল টিলসন হাত তুলে। চোখ রানার ওপর। 'হয়েছে কি? সন্ধে থেকে এত রাত অব্দি কোথায় ছিলে, গুলি করেছিল কে? কাপিস্তা কিরভ?'

'এখন অত কথা বলার সময় নেই। ফিরে এসে বলব,' বলে তানিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ কিছু নেই, ডক্টর। সত্যি বলছি অনেকটা সুস্থ আমি এখন। আয়নাটা কোথায়?'

'কি?' বিস্মিত হল মেডিক।

'আয়না।'

বোকার মত টিলসনের দিকে তাকাল সে। চোখ টিপল টিলসন, যা চায় নিয়ে আসতে বলছে। বেরিয়ে গেল তানিয়া, একটু পর ফিরে এল ছোট একটা

আয়না নিয়ে। 'এই নিন।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের চেহারাটা দেখল রানা। গালের ব্যান্ডেজ বেশ ছোট করে বেঁধেছে এবার তানিয়া। এলোমেলো চুল বা চেহারা কোন সমস্যা নয়, সমস্যা ছিল ব্যান্ডেজটা। আকার ছোট হয়ে যাওয়ায় এখন স্কার্ফ দিয়ে সহজেই ঢেকে রাখা যাবে।

'রানা!' ডাকল টিলসন।

'বলো,' জিনিসটা তানিয়াকে ফিরিয়ে দিল রানা ধন্যবাদ দিয়ে।

'জরুরী মেসেজ আছে তোমার জন্যে।'

'কি মেসেজ?' বিস্মিত হল মাসুদ রানা।

'তোমার বস্ এসেছেন।'

'কে!' অজান্তেই গলা চড়ে গেল রানার, সোজা হয়ে গেল শিরদাঁড়া।

'মেজর জেনারেল।'

হাঁ হয়ে গেল রানা। 'মানে?'

'গত সন্ধেয় মস্কো পৌঁছেছেন তিনি, আমরা যখন শহরময় পিছু লেগে বেড়াচ্ছি কিরভের।'

'কিভাবে!'

'কূটনীতিক পরিচয়ে। তোমাদের এখানকার ট্রেড অ্যাটাশে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে এসেছেন মেজর জেনারেল।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টি টিলসনের চোখে।

'তোমাকে খবর দিল কে?'

'বার্লিনের হামিদুল্লাহ। দূতাবাসে ফিরেই তার কোডেড মেসেজ পাই। পরে, রাত নটার দিকে আমি যোগাযোগ করি তোমার বসের সাথে। আজ সকাল এগারোটায় চেরেমেতেভো ল্যান্ড করবেন তোমাদের প্রেসিডেন্ট, অথচ এখনও পর্যন্ত জামানের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হল না, ভীষণ টেনশনে আছেন ভদ্রলোক। অপেক্ষা করো, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন। এখানে আসার আগে খবর দিয়ে এসেছি তাঁকে।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না মাসুদ রানার। বিশ্বাস-ই করতে পারছে না সত্যি সত্যি কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মস্কো পর্যন্ত ছুটে এসেছেন বৃদ্ধ। এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম রানার, আগে কখনও এমন কাণ্ড করেননি রাহাত খান। কেন? শুধুই জামানের ব্যাপারে কোন অগ্রগতির খবর ঢাকায় পৌঁছায়নি বলে? নাকি অন্য কোন সূত্র থেকে এমন কোন ভয়াবহ সংবাদ পেয়েছেন যা শুনে স্থির রাখতে পারেননি নিজেকে? কি হতে পারে, যেজন্যে তাঁর মত ব্যক্তিত্ব পরিচয় ভাঁড়িয়ে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছেন? কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে ভাবতেই বুকটা শুকিয়ে উঠল রানার।

'আরেক গ্লাস পানি।'

অর্ধেক পানি খেয়ে গ্লাসটা তানিয়াকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল ও, এই সময় বেজে উঠল ডোর বেল। 'এসে পড়েছেন,' বলে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়ল হ্যারল্ড টিলসন। বেরিয়ে গেল রুম ছেড়ে। আধ মিনিট পর ঘরে এসে ঢুকলেন

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। পরনে ভারী ওভারকোট, উলের স্কার্ফ এবং মাথায় ফার ক্যাপ। দুই এক জায়গায় তুষার আটকে আছে ক্যাপের।

দরজার কাছেই থমকে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। নাক কুঁচকে উঠেছে ভেতরের তীব্র ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধে। কুঞ্চিত চোখে চেয়ে থাকলেন রানার দিকে। বৃদ্ধের চেহারা দেখে অবাক হল মাসুদ রানা। অসম্ভবরকম শুকিয়ে গেছেন।

এমনিতেই ছিপছিপে গড়নের মানুষ রাহাত খান, মুখটা সামান্য লম্বাটে। আরও লম্বা হয়ে গেছে তা এই কদিনে। লাল লাল দুচোখের নিচের চামড়ায় গাঢ় কালির পোচ পড়েছে। ক রাত ঘুম হয় না কে জানে। রানার ওপর থেকে সরে খাটের কাছে ঝোলানো ব্লাড ব্যাগটার ওপর পড়ল তাঁর দৃষ্টি। সরু পাইপ বেয়ে নেমে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকাল স্থানচ্যুত সূচটার ওপর।

পলকে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল। সমান হয়ে গেল চওড়া কাঁচাপাকা ভুরু, পরিষ্কার উদ্বেগ ফুটে উঠল চেহারায়। রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন রাহাত খান। 'কি ঘটেছিল?' গম গম করে উঠল ঘর।

নিয়মমাফিক সংক্ষেপে প্রাথমিক রিপোর্ট করল মাসুদ রানা। বৃদ্ধকে দেখামাত্রই সমস্ত দুর্বলতা কেটে গেছে ওর। নিজেকে তরতাজা লাগছে বেশ। যদিও বাঁ হাতটা প্রায় অকেজো হয়ে আছে এখনও, আঙুল নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না ওটা দিয়ে। এ তবু মন্দের ভাল। একটু আগে পর্যন্ত তো তা-ও সম্ভব হচ্ছিল না।

'জামান শেখ কোথায়?' রানা থামতেই দ্বিতীয় প্রশ্ন ছুঁড়লেন তিনি। 'খোঁজ পেয়েছ?'

'পেয়েছিলাম। কিন্তু···কিন্তু···'

'হুঁম্!' বিড়বিড় করে বললেন বৃদ্ধ, 'যা অনুমান করেছিলাম!' ভুরুর কুঞ্চন দেখা দিল ফের।

পরের কথাগুলো শুনতে পায়নি রানা। 'স্যার?'

'ওকে ট্রেস করার ব্যাপারে কি করবে ঠিক করেছ?' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন বৃদ্ধ সময় নষ্ট না করে।

'কাছাকাছি ছয়টা এস্টাবলিশমেন্ট থেকে আমাদের ছয়জনকে ডেকে এনেছি।'

'কোথায় ওরা?'

'জামানের শেষ অবস্থানের ওপর নজর রাখছে দুজন। দুজন নজর রাখছে আমাকে যে গুলি করেছে, তার বাসার ওপর। অন্যদের একজন মোবাইল, অন্যজন সিগন্যাল লিয়াজোঁ রক্ষা করছে।' এসেই পুলিসী জেরা আরম্ভ করে দিল কেন বুড়ো? ভাবল মাসুদ রানা।

এতক্ষণে বিব্রত অবস্থায় পাশেই দাঁড়ানো হ্যারল্ড টিলসনের কথা খেয়াল হল রাহাত খানের। সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়ে গেলেন বাংলা কথোপকথন বুঝতে পারছে না বলে অমন করছে সে। লজ্জা পেয়ে গেলেন তিনি। 'ওহ্, আয়্যাম রিয়েলি সরি। আই টোটালি ফরগট।'

বিনয়ে বিগলিত হল টিলসন। 'দ্যাটস অলরাইট, স্যার।'

এরপর ইংরেজিতে আরম্ভ করলেন বৃদ্ধ। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার অবস্থা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'কোন অসুবিধে নেই আমার, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। চট্ করে উঠে দাঁড়াল। আগের মত মাথা ঘুরে উঠল না দেখে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'দু তিনদিন খাওয়ার সুযোগ হয়নি নিয়মিত। যেজন্যে খানিকটা পুষ্টির অভাব দেখা দিয়েছে। আর সব ঠিকই আছে।'

'বাজে কথা!' বাধা দিল মাঝখানে তানিয়া ফিওদরভা। 'আধ গ্যালনের মত রক্ত ঝরে গেছে দেহের। শরীরে একদম বল নেই ওঁর।'

ঘুরে মেয়েটির দিকে তাকালেন রাহাত খান। চোস্ত রাশানে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। কাঁধ থেকে একটা বুলেট বেরিয়েছে। আরও একটা বুলেটের ক্ষত আছে ঘাড়ে, স্লিপ করেছিল। আর গালেরটা কাঁচের সৃষ্ট ক্ষত। একটু আগে পর্যন্ত জ্ঞান ছিল না ওঁর। ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করেছিলাম,' চোখ ইশারায় খোলা সূচটা দেখাল তানিয়া। 'ওই দেখুন তার অবস্থা।'

আচ্ছা ত্যাঁদড় মেয়ে তো! বিরক্ত হল মাসুদ রানা। জোর গলায় বলল, 'বললাম তো, কোন অসুবিধে নেই। পুরো সুস্থ আমি এখন। খানিকটা প্রোটিন পেটে গেলেই...'

'আপনার কি মনে হয়?' মোলায়েম কণ্ঠে তানিয়াকে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'ও যা বলছে তাতে কোন লাভ সত্যিই হবে?'

'হ্যাঁ, তা হবে,' একটু ইতস্তত করে বলল মেয়েটি। 'কিন্তু ঝুঁকি আছে তাতে। ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে এ অবস্থায় চলাফেরা করতে গেলে।'

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল রানা, 'হবে না।' সামনে বৃদ্ধ না থাকলে হয়ত ধমক-ই মেরে বসত।

'তেমন কোন তৈরি খাবার আছে?' টিলসন প্রশ্ন করল এবার।

'চিকেন সুপ আছে।'

'নিয়ে এসো, প্লীজ।'

মেয়েটি বেরিয়ে যেতে টিলসনের দিকে ফিরলেন রাহাত খান। 'এই বাড়ি কতটা নিরাপদ?'

'যতটা হওয়া সম্ভব, স্যার।'

ওদের দুজনকে বসতে বলে নিজেও বসলেন তিনি ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে। খুক খুক করে কাশলেন দুবার। 'রানা, জামান সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট করো।'

কি কি বলতে হবে শুরুতে, গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল মাসুদ রানা। মস্কোয় পা রাখার পর থেকে কিরভের গুলি খাওয়া এবং জামান শেখের ঘাঁটি থেকে সরে পড়া ইত্যাদি কোথাও বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ খুলে বলল। 'জামানের ধারণা, ও একজন জন্ম ইহুদী। বিসিআইয়ে ইনফিলট্রেট করানো হয়েছিল ওকে,' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। হাঁপাতে লাগল শব্দ করে, দম ফুরিয়ে

গেছে।

'ব্যস্ত হয়ো না। আস্তে আস্তে বলো।'

খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কিন্তু আপনি মস্কোয় কেন, স্যার? কি এমন ঘটল যে কোন মেসেজ না দিয়েই...'

'পরে বলছি। জামানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরেছ কিছু?'

'হ্যাঁ, স্যার,' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। 'সাংঘাতিক কোন প্ল্যান এঁটেছে। কিন্তু কি করতে যাচ্ছে তা আমাকে বলেনি। খুব সম্ভব এখানকার ইহুদী উগ্রপন্থীরা সাহায্য করছে ওকে। হিপনোটিজম তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে রুশ মেডিসিনের প্রফেসর ইয়েভগেনি প্রলেকভের আবিষ্কৃত পোস্ট অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন রিমুভাল ইঞ্জেকশনও পুশ করা হচ্ছে জামানকে।'

রাহাত খানের মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার চিহ্নও দেখা গেল না। 'তোমার কি মনে হয়, প্ল্যানটা কার্যকর করতে পারবে জামান?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'বলা শক্ত, স্যার। তবে ও যদি মরিয়া হয়ে লাগে, তাহলে পারবে। কোন সন্দেহ নেই।'

বড় এক বাটি সুপ নিয়ে ভেতরে ঢুকল তানিয়া। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুঃখিত। গরম করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

'ও কিছু না।' বাটিটা এক হাতে ধরে চুমুক দিল ও হালকা গরম সুপে। 'ধন্যবাদ।' স্বাদ লাগল মধুর মত। চার-পাঁচটা চোঁ-চোঁ চুমুকে শেষ করে ফেলল পুরোটা সুপ। তারপর বাটি রেখে টিলসনের দিকে ফিরল রানা। 'জামান তোমার এই সেফ হাউসের ঠিকানা জানে?'

'না।'

আশ্বস্ত হল ও। জানলে হয়ত কেজিবিকে আরেকবার ফোন করার কাজ সেরে ফেলত সে এতক্ষণে। এরমধ্যে নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে তার যে মাসুদ রানা ফাঁকি দিয়েছে কিরভকেও। একটা প্রশ্ন জাগল মনে, জামান ভালই জানে এ-দেশে বিসিআইয়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে বিএসএস-বিএসএস-এর টিলসন থেকে নিয়ে আর যারা আছে, তাদের সবার নাম জানে ও। তাহলে তাদের সম্পর্কে এখনও কেজিবি-কে কিছু জানায়নি কেন সে? উত্তরটাও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ইয়েভগেনি প্রলেকভের ইঞ্জেকশনের আরেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এটি। অতীতের কিছুই মনে থাকে না ভিকটিমের। কেবল পরিচিত কারও সামনে পড়ে গেলেই যা এক-আধটু স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

ছোট একটা ক্যান ধরিয়ে দিল তানিয়া রানার হাতে। 'এটাও খেয়ে ফেলুন।'

ক্যানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ও। সেলফ হিটিং সুপ। মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। এ জিনিস কোথায় পেল মেয়েটি? অবাক হল রানা। কিন্তু বলল না কিছু। মুখ খুলে চুমুক দিল ক্যানে। আরেকটা প্রশ্ন, জামান প্ল্যান কার্যকর করতে পারবে কিনা, জানতে চাইল বুড়ো। কিন্তু প্ল্যানটা কি তা জিজ্ঞেস করল না কেন? তার মানে বুড়ো জানে সেটা কি।

'আপনি অনেক উপকার করেছেন, ডক্টর,' রুশ ভাষায় তানিয়াকে বললেন রাহাত খান। 'চমৎকার আপনার হাতের কাজ, আরও আগেই ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল। ব্যাপারটা আমার মনে থাকবে।'

'না না,' লজ্জা পেয়ে গেল তানিয়া ফিওদরভা। 'এ আর এমন কি! অনেক দিন পর পুরানো বিদ্যে ঝালাই করার সুযোগ পেয়ে আমিই বরং লাভবান হয়েছি। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি খানিকটা।'

মৃদু বো করলেন বৃদ্ধ। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের কিছু জরুরী আলাপ আছে।'

'বুঝতে পেরেছি।' বাটি এবং ক্যানটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। টেনে লাগিয়ে দিল দরজা।

রানার দিকে তাকালেন এবার তিনি। 'রানা, জামান শেখ সম্পর্কে খুব পরিষ্কার একটা ছবি চাই আমি। হিপনোটাইজ করে ওকে ঠিক কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে মোসাড। ও কি নিজেকে সত্যি সত্যি প্রতিশোধপরায়ণ এক ইহুদী মনে করে? না কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে? আগের সেই জামান শেখ কি আছে তার মধ্যে, ডেমোলিশন এক্সপার্ট? ভেবেচিন্তে উত্তর দাও। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

জামানের সঙ্গে আলাপের সময়টুকুর স্মৃতি, তার প্রতিটি কথা রাগ এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ সবকিছু খুব সতর্কভাবে নেড়েচেড়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানর চেষ্টা করল মাসুদ রানা। যখন নিজেকে ওর প্রস্তুত মনে হল, মুখ খুলল। 'সাধারণ সেন্সে আমার মনে হয় না ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। তাহলে কিরভের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজ হাতে খুন করত জামান আমাকে। আমার ধারণা, ওর সামনে বিশেষ একটা লক্ষ্য আছে। শুধু সেই কাজটি-ই করিয়ে নেয়ার জন্যে মোসাড ঘষেমেজে প্রস্তুত করেছে ওকে। নিশ্চিতভাবে ভেতরে ভেতরে ও আমাদের জামান শেখ-ই আছে, খোলসটা শুধু মোসাডের। যে কারণে স্বভাবতই প্রতিশোধপরায়ণ মনে হয়েছে আমার তাকে।'

ঝাড়া দু মিনিট মুখ নিচু করে চিন্তা করলেন মেজর জেনারেল। পেটের ওপর এক হাত আড়াআড়ি করে রেখে সেটার তালুতে অন্য হাতের কনুই চাপিয়ে থুতনি ধরে বসে থাকলেন। এক সময় সিধে হলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমি নিজস্ব সূত্র থেকে জামান সম্পর্কে যে-সব তথ্য পেয়েছি, তার সঙ্গে তোমার মতামত মিলিয়ে দেখলাম, কোন ভুল হয়নি তোমার। সত্যিই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তাকে প্রস্তুত করেছে মোসাড। সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। এখন শুধু আঘাত হানা বাকি। সুপ্রীম সোভিয়েত প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান, লিওনিদ ব্রেজনেভকে হত্যা করতে যাচ্ছে ও কাল। সেই সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্টকেও।'

হাঁ করে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে মাসুদ রানা আর হ্যারল্ড টিলসন। কয়েক মুহূর্ত পর সচকিত হল রানা। উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল টিলসন, ফিরিয়ে দিল হাতটা। 'দরকার নেই। আমি ঠিক আছি।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল রানা। টের

পাচ্ছে দুর্বলতা কেটে যাচ্ছে দ্রুত। বাঁ হাতের অসাড় ভাব আরও খানিকটা দূর হয়েছে, কনুই পর্যন্ত মোটামুটি বল পাওয়া যাচ্ছে।

'হতে পারে, স্যার। হতে পারে।' থেমে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বলল মাসুদ রানা, যেন ওটাকেই শোনাচ্ছে। 'আলাপের সময় দু তিনবার ও বিশেষ একটা বাক্য উল্লেখ করেছে, "সব গুছিয়ে এনেছি। আরেকটু অপেক্ষা করুন। পৃথিবীকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিতে যাচ্ছি আমি।" ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'রুশ প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ওর, স্যার।'

অভ্যেসবশে পিঠ টান করে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন মেজর জেনারেল। কপালের রগ লাফাচ্ছে তড়াক-তড়াক। চেহারায় রাগ-রাগ একটা ভাব পরিষ্কার। 'তুমি জামানকে আশ্বাস দিয়েছিলে এ দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাবে ওকে, ঠিক?'

'জ্বি, স্যার।'

'এবং সে প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান করে।'

'জ্বি।'

'সে ক্ষেত্রে চরম ব্যবস্থা নিতে পারতে তুমি, সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তোমাকে। কেন নাওনি?'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। এ প্রশ্নের উত্তর নেই ওর কাছে। সতর্ক থাকলে জামান ওকে অস্ত্র দেখিয়ে বাধ্য করতে পারত না। প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাব ছিল ওর মধ্যে তখন। কিন্তু কি করার ছিল রানার? ও কি ভুলেও ভেবেছিল যে ওর-ই হাতে গড়া জামান শেখ অন্যের দুরভিসন্ধিমূলক ফাঁদে পা দিয়ে ওরই বুকে অস্ত্র ধরবে?

তারপরও কথা থেকে যায়, আনমনে ভাবছে রানা। কিরভ যখন দূর থেকে জামানকে আলেকজান্ডার বলে উল্লেখ করেছিল, তখনই সাবধান হওয়া উচিত ছিল রানার। হতে পারেনি সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার কারণে। জামানের দ্বিতীয় পরিচয় তখনও মন থেকে মেনে নিতে পেরেছিল না রানা। মন বলেছে, এ অসম্ভব। হতেই পারে না। যে কারণে ভেতর থেকে সতর্ক হওয়ার গুরুত্ব-ই অনুভব করেনি ও। সাড়া পায়নি বিবেকের। আর সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুযোগে রানাকে নিরস্ত্র করতে সক্ষম হয় জামান শেখ।

'এ লাইনে বিবেক আবেগ ইত্যাদি বিপজ্জনক বিলাসিতা, এ সত্য আর কবে বুঝবে তুমি, রানা?' অনেকটা অভিযোগের সুর ফুটল যেন রাহাত খানের কণ্ঠে।

রানা নিরুত্তর। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। জামান শেখের ভয়ঙ্কর প্ল্যানটা জানতে পেরে এখন মনে হচ্ছে আরও হাজার গুণ সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

'মোসাডের মস্কো সেল ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় ইহুদীদের এই নোংরা ষড়যন্ত্র। কল্পনা করতে পারো, জামানের পরিকল্পনা সফল হলে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে? লেখাপড়া বা চাকরির জন্যে এ দেশে অবস্থানকারী হাজার হাজার বাংলাদেশীকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে সংক্ষিপ্ততম সময়ের

নোটিসে, যখন এরা জানতে পারবে যে কাণ্ডটি ঘটিয়েছে এক বাংলাদেশী, বিসিআইয়ের মস্কো এআইপি। এ তথ্যটি, আমার ধারণা দুদেশের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্যে মোসাড-ই সরবরাহ করবে কেজিবি-কে। কি হবে তখন আমাদের অবস্থা? স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের পর এই দেশটিই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিল আমাদের। কি করে মুখ দেখাব আমরা? সাথে আমাদের প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলেও পরিস্থিতির খুব একটা হেরফের হবে বলে মনে হয় না আমার। এদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বর্তমানে চমৎকার, অনেক ক্ষেত্রে এদের ওপর নির্ভর করতে হয় আমাদের...'

পাইপ ধরালেন রাহাত খান। লক্ষ করল রানা হাত কাঁপছে তাঁর একটু একটু। 'দেশের কথাই ধরা যাক। সরকারি কি বিরোধী দল, কেউ কি ছেড়ে দেবে আমাদের?'

অনেকক্ষণ থেকে উশখুশ করছিল হ্যারল্ড টিলসন। আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'আই বেগ ইওর পার্ডন, স্যার।'

'বলুন!'

'এ ব্যাপারে কেজিবি-কে সতর্ক করে দেয়ার কথা ভেবেছেন নিশ্চই?'

'ভেবেছি। কিন্তু ব্যাপারটা বুমেরাঙ হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'আমি দুঃখিত, স্যার,' নিচু গলায় বলল মাসুদ রানা। 'বড্ডো ভুল হয়ে গেছে। কথা দিচ্ছি, জামানকে খুঁজে বের করব আমি। খারাপ কিছু ঘটার আগেই।'

ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকলেন বৃদ্ধ কয়েক সেকেন্ড। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ক্লান্ত চেহারা খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি, রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'আমি জানি। বিশ্বাস করি একমাত্র তোমার দ্বারাই তা সম্ভব।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমি এখন বোরোব।'

'কোথায় যাবে?'

'প্রফেসর ইয়েভগেনি প্রলেকভের সাথে দেখা করতে। তাঁর নতুন ইঞ্জেকশনটির প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। ওটার কোন অ্যান্টিডোট্ আছে কি না জানতে হবে।'

বিস্ময়ের ছাপ পড়ল রাহাত খানের চেহারায়। 'কিন্তু তিনি তোমাকে সহযোগিতা করবেন কেন?'

'প্রফেসরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, স্যার।'

'তাই নাকি? কিভাবে পরিচয় হল?'

উত্তর দিতে সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল রানাকে। 'কয়েক বছর আগে ছোট্ট একটা উপকার করেছিলাম ভদ্রলোকের, রোমে। ওই ঘটনায় খুশি হয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, যদি কখনও তাঁর কোন সাহায্য প্রয়োজন পড়ে, আমি যেন বিনাদ্বিধায় যোগাযোগ করি।'

'আচ্ছা! কি উপকার করেছিলে?' মজা পেয়ে গেছেন যেন বৃদ্ধ। সবটা

শোনা চাই তাঁর।

লজ্জায় পড়ে গেল রানা। আমতা আমতা করতে লাগল। 'তেমন কিছু না, স্যার। মেয়ে নাতনীসহ কলোসিয়াম দেখতে গিয়ে গুণ্ডা বদমাশের খপ্পরে পড়েছিলেন।'

'বুঝেছি।' পকেট থেকে একটা খুদে অ্যাম্পুল এবং একটা সিরিঞ্জ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন রাহাত খান। 'এই নাও।'

'কি ওদুটো, স্যার?' বিস্মিত হল রানা।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ, 'তুমি যা চাইছ, অ্যান্টিডোট্।'

হাঁ হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'আপনি···স্যার, মানে···'

মুচকে হাসলেন রাহাত খান। 'আমারও পরিচয় আছে প্রলেকভের সাথে। আমার বন্ধু। ওর সেই ইঞ্জেকশনের থিওরি যে মোসাড হাতিয়ে নিয়েছে জানতাম আমি। ব্যাপারটা টের পেয়ে ওটার অ্যান্টিডোট্ আবিষ্কার করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল প্রলেকভ। মাসখানেক আগে তৈরি করে সে এটা। তবে এতে কাজ কতটা হবে নিশ্চিত নয় সে নিজেও।'

চোখ কপালে উঠেছে রানার আগেই। 'কিন্তু, স্যার, আপনি জানলেন কি করে যে এ জিনিস দরকার হতে পারে? কখন জোগাড় করলেন?'

'জামানের পরিকল্পনার কথা যেভাবে জেনেছি, এটাও সেভাবে জেনেছি,' আবার গম্ভীর হয়ে গেছেন বৃদ্ধ।

মনে মনে জিভ কাটল রানা। প্রশ্নটা এক্কেবারে হাঁদার মত হয়ে গেছে। 'আমি ঠিক ওভাবে মীন করিনি, স্যার।' তাড়াতাড়ি জিনিস দুটো হাতে নিল মাসুদ রানা, উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। কোন লেবেল নেই অ্যাম্পুলের গায়ে। ভেতরের তরল পদার্থটা কালচে রঙের।

'এখানকার ইহুদী অ্যানার্কিস্টদের সব রকম ডেভেলপমেন্টের সংবাদ-ই কানে গেছে আমার,' বললেন রাহাত খান। 'তবে একটু দেরিতে, এই যা। একটা চোখ তেল আবিবেও রেখেছিলাম। তবে আমি শুধুই শুনেছি, তুমি হয়ত দেখতেও পাবে।'

'কি, স্যার?'

'বিখ্যাত আমেরিকান সাইকিয়াট্রির প্রফেসর, চাইম হেরযোগ এখন মস্কোয়। সে-ই হিপনোটিক সাজেশন দিয়েছে জামানকে।'

'ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের···'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ। মোসাড চীফ দান শমরনও আছে, খুব সম্ভব। তিন দিন আগে হাওয়া হয়ে গেছে সে তেল আবিব থেকে। টেলিফোন করে অফিস থেকে, বাসা থেকে একই জবাব পাওয়া যাচ্ছে, সে অসুস্থ।' তিক্ত হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে।

মাথা চুলকাল টিলসন। চেহারাটা বোকা বোকা লাগছে। 'আশ্চর্য! অথচ এসব আমাদেরই আগে জানার কথা। কিন্তু কি করব, স্যার। পেঙ্কোভস্কির বিচারের রায় বেরুবার পর হঠাৎ করে দাঙ্গা বেধে যায়, ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

এমন সাংঘাতিক কঠোর করা হয়েছে যে কেজিবি-র নজর বাঁচিয়ে এক পা ফেলাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের তো আরও করুণ অবস্থা, এমব্যাসি থেকে বেরোবার আগে শতবার চিন্তা করতে হয়। কাউকে এতটুকু ছাড় দিচ্ছে না কেজিবি।'

'স্বাভাবিক। তাই হওয়া উচিত।'

দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠল। থেমে গেল ভেতরের কথাবার্তা। একযোগে ঘুরে তাকাল সবাই। টুক্ টুক্ মৃদু নকের শব্দ শোনা গেল। 'কে?' বলল টিলসন।

'আমি, তানিয়া।'

'ভেতরে এসো।'

দরজা খুলে গেল। ভেতরে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, হাতে একটা মিনি যুভারেভ সাব মেশিনগান। রানার উদ্দেশে বলল, 'এক লোক জানতে চাইছে আপনি এখানে আছেন কিনা। বলছে, আপনাকে মিডনাইট রেড মেসেজ জানাতে।'

'নিয়ে আসুন ওকে, প্লীজ।'

'নিশ্চই।' দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে গেল মেডিক।

'কে ও?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'আমির, স্যার।'

পাহারা দিয়ে তাকে নিয়ে এল তানিয়া। পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে আমিরের। খাটো, কিন্তু পাশে বিশাল। পা পড়ে তার বেড়ালের মত নিঃশব্দে। হাঁটে হেলেদুলে, গদাই লস্করি চালে। সেরপুখেভ থেকে এসেছে ছেলেটি রানার তলব পেয়ে। ওখানকার এক অভিজাত নাইটক্লাবের মালিক। প্যাভিলন অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ওপর যে দুজনকে নজর রাখার দায়িত্ব দিয়েছে রানা, এ তাদের একজন। তাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল মেয়েটি দরজা লাগিয়ে। পায়ের আওয়াজ দূরে সরে গেল তার।

সামনেই রাহাত খানকে দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল আমির। যদিও সামলে নিতে দেরি হল না। তাঁকে সালাম দিয়ে রানার দিকে ফিরল সে।

'কি ব্যাপার, আমির। চলে এলে যে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি বলেছিলেন এক ঘণ্টা পর যোগাযোগ করবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দুটো শিডিউল মিস করায় ভাবলাম খোঁজ নিয়ে আসি। তাই এলাম।' অত্যন্ত সাবলীল বাচনভঙ্গি আমিরের।

'দুঃখিত। একটু অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিলাম, তাই পারিনি। ওদিকের খবর কি? কোন অগ্রগতি?'

'না। তিনজনের কেউ-ই ফিরে আসেনি এখনও পর্যন্ত। আমার ধারণা ওরা আর আসবেও না, মাসুদ ভাই।'

'আবহাওয়ার অবস্থা কিরকম?'

'খুব খারাপ। একটা ভলগাও নেই আজ রাস্তায়। ভালই হয়েছে। বেশ

নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারছি।'

টুকটাক দুয়েকটা আলাপ সেরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে গেল আমির। সকালে যোগাযোগ হবে বলে বেরিয়ে গেলেন রাহাত খানও। আধঘণ্টা পর খিদে পেল রানার হঠাৎ করে। লক্ষণটা ভাল, পুষ্টিকর সলিড কিছু পেটে গেলে দেহে আরও শক্তি ফিরে আসবে। ব্যাপারটা তানিয়াকে জানাতেই ছাগলের দুধের পনির এবং কালো রুটি এনে দিল সে রানাকে। 'অবস্থা কি?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল সে, 'ক্ষতগুলোয় ব্যথা অনুভব করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল। ব্যথা যদি দুপুর পর্যন্ত থাকে তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে যে গ্যাঙগ্রিন হবে না।'

দুটো বুলেটের ক্ষতেই ব্যথা আছে। পালসের সঙ্গে সমানতাল রেখে দপদপ করছে কাঁধ আর ঘাড়। দুটোই মাস্‌ল আর টিস্যুর ওপর দিয়ে গেছে, ভাগ্য ভাল কোন হাড় স্পর্শ করতে পারেনি বুলেট। 'হয়ত জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না আপনার সঙ্গে,' সামান্য পনির মুখে দিয়ে বলল রানা। 'তাই এখনই ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি আপনাকে, ডক্। সত্যিই আপনার হাতের কাজ খুব উন্নতমানের। আমি কৃতজ্ঞ।'

মনমরা চেহারা হল তানিয়া ফিওদরভার। আনমনে বলল সে, 'যে আগুনে পড়েছেন, সহজে নিস্তার পাবেন না হয়ত। কে বলতে পারে নিশ্চিত হয়ে যে দেখা হবে না?'

'হ্যাঁ, সে নিশ্চয়তা অবশ্য নেই।' রুটির দিকে পুরোপুরি মন দিল ও এবার। সূত্র হারিয়ে গেছে, আবার তা পাওয়া যেতে পারে, সেই অপেক্ষায় আছে রানা। চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে যদি কোন সঙ্কেত আসে ভাল, নইলে নিজেই আবার বেরুবে। কিভাবে কি করবে, মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে রানা আগেই।

কিন্তু ঝামেলায় যাওয়ার দরকার হল না। চারটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি, এই সময় এল কাঙ্ক্ষিত সঙ্কেত।

আট

যতটা রানা ভেবেছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে পড়েছে গাড়ি চালানো। বেরোবার আগে সুবিধে হবে বলে কাঁধে একটা স্লিং বেঁধে তাতে বাঁ হাতটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল তানিয়া। ওটা উল্টে অসুবিধে সৃষ্টি করছে বলে হাত মুক্ত করে নিল মাসুদ রানা। দুর্বল হয়ে পড়েছে ও প্রচুর রক্ত হারিয়ে। ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসছে। বারবার মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুম তাড়াতে হচ্ছে।

ঝোড়ো বাতাস বইছে সামনে। এদিক-ওদিক এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি

করছে বড় বড় তুষার কণা। সামনে কড়া নজর রাখতে হচ্ছে, যদিও বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না। একটি গাড়িও চোখে পড়ছে না রানার, খাঁ খাঁ করছে চওড়া সড়কগুলো। যেন কোন মৃতপুরীতে এসে পড়েছে ও পথ ভুলে। কিন্তু সতর্কতা রক্ষায় সামান্যতম ঢিল দিল না রানা। হয়ত সামনে বা আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে বিপদ–দেখা দেবে আচমকা।

বেলোকামেন্নায়া এবং চেরকিযোভো স্টেশনের মধ্যবর্তী লজিনূতস্ত্রভস্কায়া উলিসা থেকে এসেছে সঙ্কেত। সেখানে পৌঁছুল রানা চারটা একুশে। বড় একটা বিল্ডিঙের পেছন দিকে অন্ধকারমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে গাড়ি পার্ক করল। এঞ্জিন বন্ধ করে জানালার কাঁচ সামান্য একটু নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ফাঁক গলে হু হু করে ঢুকছে অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাস।

বিল্ডিঙটার সামনের বড় রাস্তার ওপাশে বিশাল এক ওয়্যারহাউস, দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দূর থেকে রেলগাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শব্দটার জন্যে আশেপাশের অন্য সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে। বাধাটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক এরকম পরিস্থিতিতে। মৃত্যু ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার আগে হয়ত কিছুই টের পাবে না রানা।

গাড়ি ছেড়ে আর কোন সুবিধেজনক স্থান খুঁজে নিয়ে অপেক্ষা করবে কি না ভাবল ও একবার। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে গাড়ি ত্যাগ করা ঠিক হবে না। ট্রেনের শব্দ ছাড়া ধারেকাছে আর কোন শব্দ ওঠে কি না, শোনার জন্যে কান খাড়া করে বসে থাকল ও।

প্রায় পনেরো মিনিট পর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। হঠাৎ করেই পাল্টে যেতে লাগল সামনের ভিজুয়াল প্যাটার্ন। ওপারের ওয়্যারহাউসের একটা দরজা খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল, এক লোক এসে দাঁড়াল সামনের খোলা জায়গায়। ভেতরে কোন আলো জ্বলছে না ওয়্যারহাউসের, অতএব আবছা কাঠামোটা কেবল দেখা যাচ্ছে লোকটার, আর কিছু নয়।

কয়েক মুহূর্ত পর ওপরমুখো করে ধরা একটা টর্চ জ্বলে উঠল লোকটার হাতে। পর পর তিনবার জ্বলল আলোটা। প্রথমবার এক সেকেন্ড, পরের দু বার সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের একভাগ সময়ের জন্যে। এবার নেমে পড়ল মাসুদ রানা। রাস্তা পার হয়ে সেদিকে চলল দ্রুত পায়ে। এ ধরনের রাতের কাজ ভীষণ বিপজ্জনক। শেষ মুহূর্তে হয়ত দেখা যাবে সরাসরি কোন অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে গেছে। যখন আর ফেরার উপায় থাকবে না।

সামনের ছায়াটা একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। ছায়াটার দশহাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'ব্লু লেগুন।'

গলাটা রবিনের, মোবাইল ওয়াচার। পায়ে পায়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল রবিন। খিমকির এক প্রসিদ্ধ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। যেখানে সাধারণত পশ্চিমা বিশ্বের পণ্য-দ্রব্য বিশেষ করে পানীয় বিক্রি হয়ে থাকে প্রকাশ্যে। তার ক্রেতাদের প্রায় সবাই-ই পার্টির স্থানীয় হোমরাচোমরা এবং

সরকারের আমলা। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা রবিন। হালকা-পাতলা গড়ন। চওড়া হাড়ের অধিকারী। কথা বলে বেশি। খানিকটা চঞ্চল প্রকৃতির।

'বলো,' বলল মাসুদ রানা।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রবিন। ভিড়িয়ে রাখা দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ওয়্যারহাউসের ভেতরে। প্রথমে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রবিন, তারপর টর্চ জ্বালল। আলোটা দু তিনটে উঁচু ভাঙা প্যাকিং বাক্সের পাহাড় এবং লুজ টিম্বারের স্তূপের ওপর দিয়ে ঘুরে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড এক কুচকুচে কালো যিল লিমুজিনের ওপর স্থির হল। আলো লেগে ঝিকিয়ে উঠল গাড়িটার পালিশ করা গা।

'ঘণ্টাখানেক আগে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলল রবিন। 'হঠাৎ করেই চোখ পড়ল একটা মস্কভিচের ওপর, উল্টোদিক থেকে সবে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়্যারহাউসের সামনে। দু জন আরোহীকে নামতে দেখি ওটা থেকে। আমার হেডলাইটের আলোয় একদম পরিষ্কার দেখা গেছে লোক দুটোকে। তাদের একজনের সঙ্গে আপনার কিরভের দেয়া বর্ণনার হুবহু মিল।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'অন্যজন? জামান নিশ্চই?'

'না। আর কেউ হবে। লোকটা প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা হবে, দেখতে ঠিক গরিলার মত। গালে এলোমেলো খোঁচাখোঁচা দাড়ি।'

কে হতে পারে? ভাবল রানা। 'বলে যাও।'

'গাড়ি না থামিয়ে চলে যাই আমি ওদের পাশ কাটিয়ে। চেহারা দেখে বুঝতে পারি, আর কোন গাড়ির মুখোমুখি হতে হবে বলে তৈরি ছিল না লোক দুটো, ভয়ে ভয়ে চেয়ে ছিল আমার গাড়ির দিকে। ঘাবড়ে গিয়েছিল। ওদের পাশ কাটিয়ে কিছুটা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখি, ওয়্যারহাউসে ঢুকছে দু'জনেই। পাঁচ মিনিট পর ঘুরে এখানে আসি আবার। দেখি আগের জায়গায়-ই দাঁড়িয়ে আছে মস্কভিচ। কিন্তু কিরভ আর তার সঙ্গী নেই। সাথে সাথে কিরভের বাসার পাহারায় থাকা মার্শাল আর তারেককে এখানে আসার জন্যে সিগন্যাল পাঠাই।

'তারপর আপনি যেখানে গাড়ি রেখেছেন, ওখানে বসে অপেক্ষা করতে থাকি। দশ মিনিট পর এখানে পৌঁছায় মার্শাল আর তারেক। ওরা আসার পাঁচ মিনিট আগেই চলে গেছে কিরভ আর সেই লোক।'

'মার্শাল আর তারেক কোথায়?'

'আছে বাইরে।'

অন্যমনস্কের মত ঝকঝকে লিমুজিনটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। 'কি করছিল লোক দুটো ভেতরে?'

'দেখব বলে এসেছিলাম, কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ দেখে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি গাড়িতে।'

'পরে ঢুকলে কিভাবে?'

'তালা খুলে। টাম্বলার লক্।'

'ওদের হাতে কিছু ছিল? কোন প্যাকেট বা কনটেইনার?'

'হাতে কিছু ছিল না। তবে পকেটে ছিল কি না বলতে পারব না।'

'যাওয়ার সময়?'

'না। হাত খালি ছিল দু জনেরই।'

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা নীরবে। বাইরে ওয়্যারহাউসের দেয়ালে মাথা খুঁড়ছে প্রচণ্ড বাতাস। ডীপ ফ্রিজের মত ঠাণ্ডা ভেতরে, কিন্তু সেদিকে ওর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। অন্য ভাবনায় এতটাই ডুবে আছে যে ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি দেহকে জানান দেয়ার ফুরসত-ই পাচ্ছে না মস্তিষ্ক।

দালানটা বেশ প্রাচীন। ভেতরে নজর বোলালে মনে হয় পরিত্যক্ত। জঙ ধরা পুরানো টিনের চালা বেশ কয়েক জায়গায় ভেতরদিকে দেবে গেছে জমে ওঠা বরফের ভারে। চালা ঠেকা দেয়ার আড়া-দাড়াগুলো আছে ঠিকই নিজের নিজের জায়গায়, কিন্তু অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা যে তারা অনেক আগেই হারিয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। থেকে থেকে এখানে-সেখানে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলছে চালা মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম গোঙানির মত। যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে হয়ত ওদের মাথায়।

ভেতরে নানা রকম গন্ধ। তার মধ্যে পচা টিম্বার, ভেজা বস্তা, পচে বিষাক্ত হয়ে ওঠা খাদ্যশস্য এবং পেট্রল আর রবারের গন্ধ আলাদা আলাদাভাবে সনাক্ত করতে পারল মাসুদ রানা। বারবার গাড়িটার ওপর পড়ছে গিয়ে ওর নজর। হেডলাইট জোড়া ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে ওর দিকে। যেন নীরবে প্রশ্ন করছে, কে তুমি? কেন এসেছ এখানে? কি চাও? অস্বস্তি লেগে উঠল রানার। হঠাৎ করেই একটা সন্দেহ উঁকি দিল মনে।

'ঠিক আছে,' রবিনকে বলল ও। 'তুমি বাইরে যাও, নজর রাখো চারদিকে। আমি এখানে একা থাকতে চাই। ঘণ্টাখানেক। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে সঙ্কেত দেবে।'

'জ্বি।'

'তোমার গাড়িটা কোথায়?'

'ওয়্যারহাউসের পিছনে।'

'ওখানে বসে দরজার ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়। ওটা যেখানে আছে থাকুক, তুমি আমারটায় গিয়ে বসো।'

'আচ্ছা।'

'তোমার টর্চটা দাও আমাকে। আমারটা আছে আমার গাড়ির গ্লাভ পকেটে। দরকার হলে ওটা ব্যবহার করবে। আর যদি হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে দেখো, কাছে এগোবে না কেউ। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে।'

ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য চিন্তা করল রবিন। 'আর আপনি?'

'আমি কি?'

'আমি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখব, আর আপনি নিকটত্ব বহাল রাখবেন? যদি গুলি খেয়ে মারা যান, লাশটা নিতেও আসব না?' বেশ গম্ভীর স্বরে কথা বলছে রবিন, মনেই হয় না প্রশ্নটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রসিকতার ছোঁয়া আছে।

'না,' মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'সে-ক্ষেত্রে এসো।'

'জ্বি, আচ্ছা।' ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেল রবিন। বাইরে থেকে টেনে দিল দরজা। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা একই জায়গায়। চালার ক্যাঁচ-কোঁচ শুনল মন দিয়ে। তারপর পা বাড়াল যিল লিমুজিনের দিকে। কেন যেন মন বলছে, জামান শেখের প্ল্যানের কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে এই যিলা। হয়ত বোমা···।

গলা শুকিয়ে উঠল মাসুদ রানার। কপালে চিকন ঘাম দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সেন্ট্রাল কমিটি এম ও টু-র প্লেট ঝুলছে যিলের নাকে। তবে নম্বরের জায়গাটা ফাঁকা। হয়ত পরে ইচ্ছেমত বসিয়ে নেয়া হবে। দীর্ঘ হুইলবেস, চার দরজা। পবেদা, বা সিরেনা বা মস্কভিচের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম বড়। সুন্দর এবং মজবুত এর বডিওঅর্ক। জানালা দিয়ে টর্চের আলোয় ভেতরে নজর বুলিয়ে নিল রানা আসল কাজে হাত দেয়ার আগে।

প্রথমেই দৃষ্টি কাড়ল ওর সামনে পিছনের ব্রাশড্ ভিনাইল ক্লাব সীট এবং পুরু নীল রঙের ফ্লোর কার্পেটিং। দুটো টেলিফোন সেট—একটা সামনে, একটা পিছনে। বিল্ট-ইন টেপ ডেক, এয়ারকন্ডিশনিং ভেন্ট এবং কন্ট্রোল। অত্যন্ত দামী কাঠের তৈরি ককটেল কেবিনেট। পিছনের দুই জানালা এবং রিয়ার শীল্ডের সঙ্গে ঝুলছে নীল নাইলন কার্টেন, শোফার এবং আরোহীর মাঝখানে পুরু কাঁচের পার্টিশন।

যিলের তলা দিয়ে আরম্ভ করল রানা। খুঁজেপেতে একটা চলনসই বস্তা নিয়ে এল ও। বস্তাটা নোংরা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বিছিয়ে ঢুকে পড়ল ওটার পেটের নিচে। ডান হাতে টর্চ। যিলের জেনারেল লে আউট বিশাল কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। এগজস্ট সাইলেন্সার পাইপ দুটো দৈত্যাকার, একেকটা প্রায় ওসমানী উদ্যানের কামানের ব্যারেলের মত মোটা।

বাঁ হাতে অত্যন্ত সন্তর্পণে বডির প্রতিটি খাঁজ-ভাঁজ, ফাঁক-ফোকর, সংযোগস্থল হাতড়ে দেখল রানা। এতেই ঘেমে নেয়ে ওঠার অবস্থা। কারণ সত্যিই যদি এতে কোন বোমা পেতে রেখে থাকে জামান শেখ, এবং তা যদি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাহলে কিছু টের পাওয়ার আগেই ফুরিয়ে যাবে জীবন। সাবধান, নিজেকে শোনাল রানা। আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

এরপর রিয়ার অ্যাক্সেল কেসিঙ, প্রপেলার শ্যাফট টানেল, ফ্লাইহুইল হাউজিঙ, ক্র্যাঙ্ককেস ফ্ল্যাঞ্জ এবং টায়ারগুলো চেক করল রানা এক এক করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে। যতবড় ডেমোলিশন এক্সপার্ট-ই হোক, জামান শেখও মানুষ। ভুল ত্রুটি তারও হতে পারে। হয়ত সে যেভাবে ফিট্ করতে চেয়েছে, ঠিক সেভাবে হয়নি। তাই সতর্কতার মাত্রা অজান্তেই বেড়ে গেছে ওর বহুগুণ।

দশ মিনিট পর থামল রানা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। বাঁ কাঁধের ব্যথার জায়গাটা দপ্-দপ্ করছে ভীষণভাবে। পুরো হাত টনটন করছে ব্যথায়। ওপরে ক্যাঁচ-কোঁচ করছে ওয়্যারহাউসের ছাত। গাড়ির নিচে তেল কালির বিচ্ছিরি

দুর্গন্ধ। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা। দুটো হাত ছাড়া শরীরের সব জায়গা অসাড় হয়ে গেছে, জমে গেছে ঠাণ্ডায়।

এরমধ্যে চারটে গাড়ি গেছে সামনের রাস্তা দিয়ে। প্রতিবার-ই মোটরের আওয়াজ কানে আসামাত্র টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে রানা। অপেক্ষা করেছে দূরে সরে যাওয়া পর্যন্ত। কয়েকশ' গজ দূরের রেললাইন দিয়ে একটা ট্রেনও গেছে এর মধ্যে।

ভেজা বস্তায় হাতের ঘাম মুছল রানা ডলে ডলে। তারপর বেরিয়ে এল তলা থেকে। বিসমিল্লাহ বলে ড্রাইভারের দরজা খুলল। পুরো বিশ মিনিট তন্ন তন্ন করে খুঁজল ভেতরে। সবগুলো সীট কুশন, কার্পেটের তলা, ককটেল কেবিনেট, টেলিফোন, ডেক সেট, এয়ার কন্ডিশনিং ভেন্ট এবং সীটের তলা হাতড়ে দেখল। সবশেষে পড়ল ফরওয়ার্ড কম্পার্টমেন্টের প্যানেল, ওয়্যারিঙ, টার্মিন্যাল এবং ফিউজ বক্স নিয়ে।

নেই। কোথাও কোন চিহ্ন নেই বোমার।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ড্রাইভারের আসনে বসে থাকল পরিশ্রান্ত, হতাশ রানা। চোখ সামনের সুদৃশ্য প্যানেলে। দরজা খোলা, এক পা রয়েছে বাইরে। সত্যিই কি বোমা ফিট্ করা হয়েছে এটায়? হয়ে থাকলে কোথায়? এঞ্জিনের কেবিনেটে? কপালের ঘাম মুছে বেরিয়ে পড়ার জন্যে উঠল রানা, তার আগে হাত বাড়িয়ে চেপে দিল প্যানেলের বনেট লক রিলিজ বাটন।

এখানেও ঝাড়া আধঘণ্টা পণ্ডশ্রম হল। সুবিশাল এক কেবিনেট। অসংখ্য সাবসিডিয়ারি ট্যাঙ্ক, রিজারভয়ের, চেম্বার এবং ছোট ছোট বাক্সবন্দী প্রচুর কমপোনেন্ট। তার কয়েকটিতে লেবেল স্টিকার লাগানো আছে, অন্যগুলো ফাঁকা। ঝামেলা! ওগুলোর কি কাজ, জানার জন্যে সংযুক্ত তার, পাইপ আগড়ম বাগড়ম সবকিছু পরখ করে দেখতে হল। নেই!

বনেট বন্ধ করে পিছনে এসে বুট খুলল মাসুদ রানা। দুটো স্পেয়ার হুইল শুয়ে আছে ভেতরে। ও দুটো চেক করতে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হল। এরপর ফার্স্ট এইড বক্স এবং টুল কিটে সংক্ষিপ্ত সন্ধান চালাল রানা। টর্চের জোর কমে এসেছে ততক্ষণে, লাল হয়ে গেছে আলো। কোথায় থাকতে পারে? সীট কুশনের মধ্যে? রুফ লাইনিঙের ভেতর? নাকি ডোর প্যানেলিঙের কোথাও?

শেষবারের মত আরেকবার কাজ শুরু করল মাসুদ রানা, ফাইন্যাল চেক্। রেডিয়েটর গ্রিলের পিছনের সরু ফাঁকা জায়গাটা খুঁজল প্রথমে অপর্যাপ্ত আলোয়। তারপর দু পাশের উইঙের ওপর নজর বোলাতে গেল, এই সময় আচমকা টোকার আওয়াজ উঠল বন্ধ দরজায়। চট্ করে আলো নিভিয়ে দিল রানা, আস্তে করে নামিয়ে দিল বনেট কভার।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে দরজার কাছে পৌঁছে গেল তিন লাফে। কান পাতল দরজায়। 'মাসুদ ভাই?' নিচু গলায় ডেকে উঠল রবিন। 'খুলুন।'

দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে এল ও ছেলেটিকে। 'কি হয়েছে?'

'সেই লোক আসছে, কিরভ।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়িয়ে থাকো,' হাত তুলে দরজার ওপাশটা নির্দেশ করল রানা। নিজে দাঁড়াল এপাশে। সংবাদটা পরম এক স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছে দেহমনে। ওর অনেক ঝুট ঝামেলা বাঁচিয়ে দিয়েছে ব্যাটা নিজে এসে। বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠল। ওপরদিককার গুঁড়ো বরফে মুড় মুড় শব্দ।

'মার্শাল, তারেক কোথায়?'

'বাইরে গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

দরজার তালায় চাবি ঢোকানো হল, 'ক্লিক্' 'ক্লিক'! থেমে গেল চাবি ঘোরানো। তালা খোলা দেখে নিশ্চয়ই ভীষণ অবাক হয়েছে কাপিস্তা কিরভ, কঠোর হাসি ফুটল রানার মুখের একপাশে। ব্যান্ডেজের জন্যে অন্যপাশটা নড়লেও বোঝা যায় না। খুব ধীরে ধীরে দু ইঞ্চি ফাঁক হল দরজা। একটু থামল, তারপর আরও দু ইঞ্চি খুলল। কষ্ট করে পা বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে হল না কিরভকে, রানাই সারল ওটুকু। কোটের কলারে আচমকা রানার বজ্রমুষ্টির হ্যাঁচকা টান খেয়ে উড়ে চলে এল সে ওয়্যারহাউসের ভেতরে।

'মিশা আর তিশাকে জীবিত দেখতে চাও?' ঝুঁকে কিরভের মুখের সামনে মুখ নিয়ে এল রানা। 'ম্যালেনকভকে? তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে, কিরভ। পরিস্থিতির ওপর এখন আর তোমাদের হাত নেই, এ মুহূর্তে আমি নিয়ন্ত্রণ করছি পরিস্থিতি। কেউ তোমাকে রক্ষা করবে সে আশা কোরো না। ঠিক দু মিনিট সময় দিলাম তোমাকে মনস্থির করার জন্যে। এর মধ্যে যদি মুখ না খোলো, আমার লোক যাবে তোমার বৌ-ছেলেমেয়েদের তুলে আনতে। এখানেই নিয়ে আসা হবে তাদের। তোমার চোখের সামনে তোমার স্ত্রীকে...' বক্তব্য শেষ করল না ও ইচ্ছে করেই। ভিলেন মার্কা হাসি ফুটল মুখে। শিউরে উঠল ভ্যালেরি কাপিস্তা কিরভ।

'তোমার সাথে আমার ব্যক্তিগত দেনা-পাওনাও আছে কিছু, ওটাও শোধ করে দেব এবার কড়ায়-গণ্ডায়। এ দুটো আমাকে ভোগাচ্ছে খুব,' কাঁধ এবং ঘাড়ের বুলেটের ক্ষত দুটো দেখাল তাকে মাসুদ রানা। 'চাইলে এর প্রতিশোধ এখনই নিতে পারি আমি। কিন্তু সেরকম ইচ্ছে আমার নেই। অবশ্য তুমি যদি বাধ্য করো, সেক্ষেত্রে হয়ত নিজেকে ঠেকাতে পারব না।'

সিধে হল রানা। ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল। 'রেডি? নাও, কাউন্ট শুরু হয়ে গেছে। দু মিনিট, মাইন্ড ইট।'

মিনিট পনেরো হল লোকটিকে ধরে নিয়ে এসেছে রানা তানিয়ার ডেরায়। চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা এবং মুখ বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে যে রুমে সাময়িক হাসপাতাল তৈরি করেছিল তানিয়া কয়েক ঘণ্টা আগে। এ মুহূর্তে রানা রবিন এবং তানিয়া ফিওদরভা ছাড়া কেউ নেই এখানে।

ঠিক দু মিনিট পর আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। এগিয়ে এসে খুলে দিল কিরভের মুখের বাঁধন। 'কি ঠিক করলে, কমরেড? মুখ খুলবে?'

মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকল লোকটা। চোখ কুঁচকে ভাবছে কিছু। মনে হল কি করবে স্থির করতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল তাকে রানা। ঝট্ করে পিছনে দাঁড়ানো রবিনের দিকে ফিরল ও, পরিষ্কার রুশ ভাষায় বলল, 'তুমি যাও। ওর বৌকে নিয়ে এসো এখানে। বাচ্চাগুলোকে আনার দরকার নেই, ওখানেই শেষ করে রেখে এসো। কুইক!'

রবিনও কম যায় না অভিনয়ে। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত পায়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ইয়েস, স্যার।'

'নিয়েত্!' চেঁচিয়ে উঠল কিরভ। 'প্লীজ, ওকে থামান। ওরা···ওরা অবুঝ দুধের শিশু। ওরা কি অন্যায় করেছে!'

খেঁকিয়ে উঠল রানা রবিনের উদ্দেশে। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ? যাও!'

'দাঁড়ান!' হাত ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে টানা হেঁচড়া করছে কিরভ, কিন্তু কাজ হচ্ছে না তাতে। আরও বরং চেপে বসল বাঁধন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সারামুখ ভিজে উঠেছে তার ঘামে। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা। ফুঁপিয়ে উঠল কিরভ, 'দাঁড়ান!'

চরম বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তুমি···'

'ওরা আমাকে জেলে দেবে,' নিচু ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠল কিরভ। ভীত কণ্ঠ।

'কি?'

'আমি মুখ খুললে সব ফাঁস করে দেবে ওরা। দশ বছরের নির্বাসন হবে আমার উরালের লেবার ক্যাম্পে।'

কথাগুলো নিয়ে ভাবল রানা কয়েক মুহূর্ত। নতুন একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে যেন ওর মধ্যে। 'কি ফাঁস করে দেবে? কি করেছ তুমি?'

চুপ করে থাকল কিরভ। আপনমনে মাথা দোলাচ্ছে এপাশ-ওপাশ। যেন নিজেকে বোঝাচ্ছে, এসব কথা বলা ঠিক হবে না। চমকে উঠল সে রানার ধমক খেয়ে।

'বলো!'

'আগে কথা দিন আমার বৌ-বাচ্চার কোন ক্ষতি করবেন না।'

'এখনই সে ব্যাপারে কথা দেয়া সম্ভব নয়। আগে তোমার বক্তব্য শুনি। যদি বুঝি সত্যি কথা বলছ, কোনকিছু লুকাচ্ছ না, সেক্ষেত্রে অবশ্যই, তাদের ক্ষতি করব না।'

'ওরা···'

'ওরা কারা?' লোকটার মুখোমুখি বসল আবার মাসুদ রানা। ওর পিছনে, দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রবিন আর তানিয়া।

'ইহুদীরা।'

বিস্মিত হল রানা। 'তুমি ইহুদী নও?'

'না। আমি ক্যাথলিক।'

ব্যাপারটা হজম করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল রানার। 'ওদের সাথে ভিড়লে কিভাবে?'

পলকের জন্যে নাকমুখ লাল হয়ে উঠল কাপিস্তা কিরভের। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লজ্জা পেয়েছে। 'সে কথা না শুনলেই নয়?' আমতা আমতা করতে লাগল সে।

'বলে ফেলো। এটা জীবনমরণের প্রশ্ন, এখন লজ্জা করলে চলবে না। ওরা তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে?'

রানার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত, ঘনঘন মাথা দোলাতে শুরু করল কিরভ। 'হ্যাঁ।'

'কিভাবে বাগে পেল তোমাকে? করেছিলে কি?'

'মিথ্যে কথা বলে সেন্ট্রাল কমিটি ভেহিকেল স্টোর থেকে দুই লিটার তেল নিয়েছিলাম নিজের গাড়ির জন্যে।' আবার মাথা নিচু হয়ে গেল লোকটির। 'ধরে ফেলে ব্যাপারটা বোরোডিনস্কি।'

'বোরোডিনস্কি কে?'

'আমার মতই পলিটব্যুরোর অফিশিয়াল ড্রাইভার। ইহুদী আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিমিন্যালদের সাথে সম্পর্ক আছে এর, ভাব দেখে মনে হয় ওদের নেতা গোছের কেউ হবে। সবাই খুব সম্মান করে লোকটাকে।'

'ওর চেহারা বর্ণনা করো।'

বলা শুরু করতে না করতেই বলে উঠল রবিন, 'বুঝেছি। মাঝরাতে এই লোকটিই তোমার সাথে ওয়্যারহাউসে গিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'এদের এই ভয়ঙ্কর প্ল্যান কখন থেকে শুরু হয়?' বলল রানা। 'এর উদ্দেশ্য কি?'

'মোসাডের মস্কো এআইপি ওলেগ পেঙ্কোভস্কি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিচারের রায় ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই। উদ্দেশ্য প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে হত্যা করা।'

চোখ বুজে বসে থাকল রানা। মাথার ভেতরটা তুলোর মত হালকা হয়ে গেছে। চিন্তাভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে বারবার। থেকে থেকে দুচোখ লেগে আসতে চাইছে ঘুমে, আঁধার হয়ে আসছে সব। উঠে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিল ও। দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে নাকেমুখে। দেরি আছে এখনও ভোর হতে। আবহাওয়া শান্ত হয়ে এসেছে অনেকটা।

'ইহুদীদের দাবি, পেঙ্কোভস্কিকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছে,' বলল কিরভ। 'অনেকবার বিক্ষোভ জানিয়েছে ওরা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, তাদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছে। শেষে কাজ না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

মোসাড নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য এক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, ভাবল রানা।

ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমি জানো আজ একজন বিদেশী মেহমান আসছেন এ দেশে? অন্য এক দেশের প্রেসিডেন্ট?'

'জানি, বাংলাদেশের। আপনাদের প্রেসিডেন্ট, শুনেছি আমি।'

'প্রফেসর চাইম হেরযোগ কোথায়?'

'জানি না।'

ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'বারো ঘণ্টা পর পর এসে আলেক্সকে ইঞ্জেকশন দিয়ে যেত লোকটা, সে সময় দেখা হত তার সঙ্গে। তাও সব সময় নয়, কখনও কখনও। লোকটা কোথায় থাকে জানা নেই আমার। কেউ কখনও উল্লেখ করেনি তার আস্তানার কথা।'

'জামানকে আলেকজান্ডার নাম কে দিয়েছে?'

'বোরোডিনস্কি।'

'কেন?'

'জানি না। তবে সবার প্রতি নির্দেশ ছিল যেন এই নামে ডাকা হয় তাকে।'

'বোরোডিনস্কি কোথায় থাকে?'

'তাও জানি না। এই মাসেই বাসা পাল্টেছে লোকটা।' রানার চোখের ভাষা বদলে যেতে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'যিশুর কিরে। আমার ছেলেমেয়েদের কসম খেয়ে বলছি, জানি না। তবে অফিসের রেকর্ড চেক করে ঠিকানা বের করে ফেলতে পারব দরকার হলে।'

ঠিকানা হয়ত জানা যাবে, ভাবল মাসুদ রানা। তবে সেখানে যে বোরোডিনস্কিকে পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে তিল পরিমাণ সন্দেহও নেই। 'তোমার সাথে জামান শেখের পরিচয় হয় কিভাবে?'

'মস্কোর বাইরে একদিন পথের মাঝে গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল জামানের। খুব ঝড় বৃষ্টি ছিল সেদিন। ওই পথেই আসছিলাম আমি। লিফট দিয়ে শহরে নিয়ে এসেছিলাম জামানকে, বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। সেই থেকে পরিচয়। অনেকটা বন্ধুর মত ছিলাম আমরা দুজন।'

'জামানকে কতগুলো ইঞ্জেকশন পুশ করেছে হেরযোগ?'

'পনেরো ষোলোটা হবে।'

'ব্রেজনেভের রাষ্ট্রীয় মোটর শোভাযাত্রার ধরন সম্পর্কে বলো এবার। কিভাবে চলাফেরা করেন তিনি?'

'চারটা যিল লিমুজিন থাকে বহরে। সামনে পিছনে বারোজন করে রাইডার। এরা গার্ডস ডিরেক্টরেটের। সবশেষে থাকে সচিব আর আমলারা।'

'চারটে একই রঙের যিল?'

'হ্যাঁ, কালো।'

'কোনটায় বসেন ব্রেজনেভ?'

'চার নম্বর যিলে।'

'লজিনূতস্ত্রভস্কায়ার ওই ওয়্যারহাউসের যিলটা আগামীকালের রাষ্ট্রীয়

মোটর শোভাযাত্রায় অংশ নেবে?'

'না। ওটায় শক্তিশালী বোমা ফিট করা হবে। ক্রেমলিনের গ্র্যাণ্ড প্যালেসের সামনে কাল সন্ধেয় ব্রেজনেভ যখন আপনাদের প্রেসিডেন্টকে রিসিভ করবেন, তখন ওটা গিয়ে ধাক্কা মারবে অতিথি বহনকারী গাড়িটিকে। বিস্ফোরণ ঘটলে একশো গজের মধ্যে প্রত্যেকে মারা পড়বে। ছাতু হয়ে যাবে।'

'আমাদের প্রেসিডেন্ট যদি সামনের কোন যিলে বসেন?'

'না। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। তিনি ক্রেমলিন আসবেন হোটেল থেকে। তাঁর গাড়ির বহরে তখন যিল থাকবে দুটো। একটায় তিনি এবং তাঁর স্ত্রী থাকবেন। অন্যটিতে আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।'

'প্রেসিডেন্ট সামনের যিলে বসবেন নিশ্চই?'

মাথা দোলাল কিরভ। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে পরের গাড়িটা একটা বাধা হয়ে থাকবে...,'

'না,' রানার মুখের কথা কেড়ে নিল লোকটা। 'জামান যে বিস্ফোরক বেছে নিয়েছে, তার কাছে অমন গোটা কয়েক বাধাও কোন কাজে আসবে না।'

থমকে গেল মাসুদ রানা। 'কি ধরনের বিস্ফোরক ওটা?' অজান্তেই ভীষণরকম কর্কশ হয়ে উঠেছে কণ্ঠ। মনে হল যেন কোলাব্যাঙ ডেকে উঠল ঘরের মধ্যে।

'কম্পোজিশন সি-থ্রী প্লাস্টিক। চার কোনা আটটা স্ল্যাব। চারটা ফিট করা থাকবে যিলের সামনের ফেন্ডারের ভেতরদিকে, বাকিগুলো বনেট কভারের নিচে। সেই সঙ্গে পঞ্চাশ কেজি স্টীলের বল বেয়ারিঙ।'

'কোথায়?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি নিজে তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছি ওই গাড়ি। কোথাও কোন চিহ্ন নেই বিস্ফোরকের।'

'এখনও ফিট্ করা হয়নি। তাছাড়া অন্য কোথাও গাড়িতে ফিট করা হবে ওগুলো, ওখানে নয়।'

'এত খবর জানলে কি করে? তুমি বললে ওরা তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। সেক্ষেত্রে তোমার সামনে নিশ্চই এত ডিটেল আলোচনা করেনি ওরা?'

'আড়ি পেতে শুনেছি।'

কম্পোজিশন সি-থ্রী, ভাবছে মাসুদ রানা, এবং বল বেয়ারিং–চমৎকার! প্রফেশন্যাল জামান শেখের কোন তুলনা হয় না। সেজন্যে মনে মনে খানিকটা গর্বও হল রানার। ওই বিস্ফোরণে আশেপাশের প্রত্যেকে ছাতু হয়ে যাবে, কারও চেহারা চেনার উপায়ও থাকবে না। 'গ্র্যান্ড প্যালেসে তখন আর কে কে থাকবেন?' নানান ঝামেলায় গত ক দিন এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার সময় পায়নি ও। পত্র-পত্রিকায় চোখ বোলানোর সুযোগও জোটেনি।

'প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন থাকবেন। আর থাকবেন আঁদ্রোপভ এবং কিরিলেঙ্কো।'

হঠাৎ আঁতকে উঠল রানা একটা কথা মনে পড়তে। সামনে ঝুঁকে এল ও। 'গাড়িটা চালাবে কে?'

'জামান নিজে।'

টক টক পানিতে মুখের ভেতরটা ভরে উঠল রানার। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের টান পড়েছে যেন, হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস টানতে আরম্ভ করল। 'কিন্তু বিস্ফোরণে যে ওরও···,'

আবারও বাধা দিল কাপিস্তা কিরভ। 'জামান জানে। ও নিজেই করেছে এই প্ল্যান।'

বমি বমি লাগছে। তাড়াতাড়ি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আবার রানা। নদীর অস্পষ্ট কুলুকুলু শুনতে লাগল কান পেতে। সেই সঙ্গে নাকে আসছে মরা পচা মাছ, পচা কাঠ এবং ডিজেলের গন্ধ। সারফেসের ভাসমান আলগা বরফ মৃদু মুড় মুড় আওয়াজ তুলে একে অন্যের গায়ে জোড়া লেগে যাচ্ছে। 'বিকল্প কোন পরিকল্পনা আছে জামানের?'

একটু ভাবল কিরভ। 'না, আমার জানামতে নেই অন্তত। আসলে নেই-ই। থাকলে কিছু না কিছু আভাস অবশ্যই পেতাম।'

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। 'তোমার একটা কথাও যদি মিথ্যে হয়, কি ঘটবে বুঝতে পারছ?'

সামান্য বিস্ফারিত হল কিরভের দু চোখ। 'একটা অক্ষরও মিথ্যে বলিনি, সব সত্যি।'

'আমার মনে হয় ব্যাটা সত্যি কথাই বলছে, মাসুদ ভাই,' বাংলায় মন্তব্য করল রবিন।

'আমারও,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আমি ভাবছি জামানের বিকল্প কোন পরিকল্পনা আছে কি না। হয়ত আছে, এ জানে না। হয়ত নেই।'

'গাড়িটার ব্যাপারে কি ঠিক করলেন?'

'ওখানেই থাকুক ওটা। মার্শাল আর তারেক আছে ওখানে তুমিও যাও। আড়ালে থেকো। যদি দেখো আর কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যিল, বাধা দেবে না। তাতে বিপদ বরং বাড়বে। বিকল্প প্ল্যান বাস্তবায়নে হাত দেবে তাহলে মোসাড। অনুসরণ করবে কেবল।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'একে কি করবেন?'

'ছেড়ে দেব ভাবছি। বেশিক্ষণ লোকটাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না। তাতেও সন্দেহ করে বসতে পারে ওরা।' কিরভের দিকে ফিরল রানা। 'ওয়্যারহাউসে কেন এসেছিলে?'

'গাড়িটা দেখার জন্যে।'

হঠাৎ করে সঙ্কেত দিতে শুরু করল তানিয়ার হাতঘড়ি–টেলিফোনে ডাকা হচ্ছে। 'মাফ করবেন,' বলে স্টোররুমের উদ্দেশে দ্রুত পা বাড়াল সে। ফিরে এল ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে। চেহারা থমথমে।

'কি ব্যাপার?' এক পা এগোল রানা তার দিকে।

'টিলসন ফোন করেছিল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল তানিয়া ফিওদরভা। নজর ঘুরে এল কিরভের ওপর থেকে।

'কোন দুঃসংবাদ?'

'আপনার দুই সহকারীকে হত্যা করে যিলটা নিয়ে গেছে ওরা ওয়্যারহাউস থেকে।'

থমকে গেল মাসুদ রানা ও রবিন। 'হত্যা করা হয়েছে!' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'দুজনকেই?'

'লাশ দুটো সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিলসন আসছে।'

'বিস্ফোরক প্ল্যান্ট করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গাড়িটা,' মৃদু কণ্ঠে বলল কাপিস্তা কিরভ। ভয়ে ভয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে।

ডোরবেল বেজে উঠল এই সময়। বেরিয়ে গেল তানিয়া। কয়েক সেকেন্ড পর ফিরে এল রাহাত খানকে নিয়ে। সকালের অপেক্ষায় থাকতে পারেননি বৃদ্ধ, চলে এসেছেন নতুন কোন খবর আছে কি না জানতে। কিরভের ওপর চোখ পড়তে থমকে গেলেন তিনি দোরগোড়ায়। 'কে এই লোক, রানা?'

নয়

৫:৪১

নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই সন্ধে হয়ে গেছে। আকাশে তারা নেই। দুপুর পর্যন্ত বরফ পড়া বন্ধ ছিল। তারপর শুরু হয়েছে আবার। তাপমাত্রা দশমিক শূন্য দুই। ঢাকা থেকে সরাসরি ফ্লাইটে এক ঘণ্টা দেরিতে মস্কো পৌঁছেছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ স্বয়ং রিসিভ করেছেন তাঁকে চেরেমেতেভো আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে।

সন্ধে সাড়ে ছ টায় ক্রেমলিনের গ্র্যান্ড প্যালেসে বিদেশী রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানানো হবে। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসবেন দুই প্রেসিডেন্ট। এরপর রাষ্ট্রীয় ভোজসভা। অবশ্য যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে। যদি না থাকে, তাহলে কি হবে ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল মাসুদ রানার।

পাশে পড়ে থাকা মিনি-ট্রানজিস্টর সাইজের ওয়াকি-টকিটা পিক পিক করে উঠল। ব্রিটেনের তৈরি আলট্রাভক্স ওয়াকি-টকি। ওদের সবার কাছে রয়েছে একটা করে।

'সি-চালি···সুচারেভস্কায়া রিঙ রোডের দিকে যাচ্ছি। ওভার।'

হ্যারল্ড টিলসনের সাঙ্কেতিক নাম সি-চার্লি। ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। ওরা মোট আটজন রয়েছে পথে। রানা, রবিন, মেহফুজ, হাবিব, আরমান এবং রাহাত খান স্বয়ং। অন্যদিকে টিলসন এবং গডফ্রে-মস্কো এয়ারপোর্টে যে রিসিভ করেছিল রানাকে। ক্রেমলিনের চারদিকে চরকির মত ঘুরছে সবাই। ঠিক পাঁচটায় শুরু হয়েছে ওদের এই টহল।

বিসিআইয়ের অন্য দুই এআইপি, মার্শাল ও তারেককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আজ ভোরে। ওয়্যারহাউসে ছিল ওরা, যিল লিমুজিনটাকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল তাদের রানা। খোলা রাস্তায় পড়ে ছিল লাশ দুটো। সরাসরি মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয় হতভাগ্য দুই যুবককে।

তারেককে খিমকি এবং মার্শালকে জাগরস্ক থেকে আনিয়ে নিয়েছিল মাসুদ রানা ওকে সাহায্য করার জন্যে। বিসিআইয়ের দুটো অমূল্য রত্ন, ঝরে গেল অকালে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো স্থাপনায় নিয়োজিত ছিল ওরা।

ভোরের দিকে কৌতূহলবশত সেখানে গিয়ে লাশ দুটো আবিষ্কার করে টিলসন। তক্ষুণি সরিয়ে ফেলে সে ও-দুটো, তারপর রানাকে খবর দেয়ার জন্যে ফোন করে সেফ হাউসে। সে ভোর পাঁচটার কথা, বারো ঘণ্টারও বেশি পার হয়ে গেছে তারপর। কোত্থেকে কিভাবে এতগুলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেল টেরও পায়নি রানা।

মন থেকে অতীত মুছে ফেলল রানা জোর করে। রাস্তার দিকে নজর দিল। এদিকের রাস্তায় গাড়িঘোড়ার আনাগোনা এখন অনেক কম। আরেকটা রাশ আওয়ার প্রায় কাটিয়ে উঠেছে মস্কো। কয়েকটি বড় ইন্টারসেকশনে ক্রুসহ কর্পোরেশনের স্যান্ডট্রাক বহর কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাস্তার বরফের ওপর বালু ছড়াচ্ছে তারা।

ওয়াকি-টকি তুলে নিল মাসুদ রানা। 'এ-অ্যাবেল··· ক্রাসনোকলমসস্কায়ার দিকে যাচ্ছি···ব্রিজ পার হচ্ছি এখন।'

জামান শেখকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্যে বৈঠক বসেছিল দুপুরে। পরিকল্পনা ঠিক করেই রেখেছিল মাসুদ রানা। 'যদি বিকেল পাঁচটার মধ্যে জামানের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে ক্রেমলিনের আউটার রিঙ রোডগুলোয় টহল শুরু করব আমরা।' রানা মোটামুটি নিশ্চিত যে এ-ছাড়া আর কোন পথ নেই ওদের সামনে। কারণ যেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকুক জামান শেখ, নির্ধারিত সময়ের আগে বের হবে না। হতে দেবে না মোসাদ।

যেজন্যে এখনকার এই টহলের পরিকল্পনা অনেক ভেবেচিন্তে করেছে রানা। এটাই শেষ সুযোগ। বৈঠকে রাহাত খানও ছিলেন। ঘন ঘন লম্বা টান দিচ্ছিলেন পাইপে আগুন না ধরিয়েই। মিনিটে মিনিটে বাড়ছিল তাঁর উদ্বেগ। 'তারপর?' ধমকের সুরে প্রশ্ন করেন তিনি।

'তাতে আগে হোক, পরে হোক যিলের দেখা পাওয়া যাবেই। কারণ নির্দিষ্ট একটা সময়ে জামানকে ক্রেমলিন পৌঁছুতেই হবে। এবং আমাদের কারও না কারও চোখে সে পড়বেই। নিজেদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলব আমরা। প্রথমে যার চোখেই পড়ুক যিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে সে। বাকি কাজ আমি করব। আর সবাই রাস্তা থেকে সরে পড়বে তখন। কেউ রাস্তায় থাকবে না।'

প্রথমে ঠিক করেছিল রানা টহল না দিয়ে যে পথে ক্রেমলিনে ঢুকতে হবে জামানকে, সেই রেজিনা উলিসায় ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে ওরা সবাই। ওই পথেই গ্র্যান্ড প্যালেসে পৌঁছুবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রা। ক্রেমলিনে ঢুকবে বেকলেমিশেভস্কায়া টাওয়ার এন্ট্রান্স দিয়ে।

ঠিক সাড়ে ছটায় গ্র্যান্ড প্যালেসের সামনে গাড়ি থেকে অবতরণ করবেন অতিথি রাষ্ট্রপতি। এবং গাড়ির দোরগোড়াতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ। কিরভের কাছে জানা গেছে, সেই মুহূর্তে পিছন থেকে অতিথি রাষ্ট্রপতির পিছনের যিলের ওপর গিয়ে পড়বে জামান শেখের গাড়িবোমা। অর্থাৎ সেই একই সময় তাকেও রেজিনা উলিসা দিয়ে এসে একই টাওয়ারের তলা দিয়ে প্রাসাদ আঙিনায় ঢুকতে হবে। অতএব ওখানে কোথাও অবস্থান নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, অনায়াসেই মোক্ষম ফল পাওয়া যেত।

কিন্তু চিন্তাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিতে হয়েছে, কারণ সে-সময় ওই পথে এবং টাওয়ারের আশেপাশে গিজ গিজ করবে অসংখ্য ভলগা। দাঁড়ানোই যাবে না ওই এলাকায়। কাজেই টহল ছাড়া উপায় নেই। ক্রেমলিন থেকে যথাসম্ভব তফাতে পাকড়াও করতে হবে জামানকে। সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে।

'গাড়িটাকে চেনার উপায় কি?' প্রশ্নটা ছিল আরমানের। কালিনিনের বিসিআই এ আই পি।

'নিঃসঙ্গ থাকবে যিলটা। সাথে কোন এসকর্ট থাকবে না।'

'ট্যাগ নম্বর জানা যায়নি ওটার?' এবার প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'না,' মাথা দুলিয়েছে মাসুদ রানা। 'নম্বর ছাড়া ট্যাগ ঝুলছিল ওটায়। নিশ্চই ইচ্ছেমত একটা বসিয়ে নেয়া হবে। তবে ওটা এম ও সি ট্যাগ অবশ্যই।

আধঘণ্টা পর পাইপ ধরাবার কথা মনে পড়ল বৃদ্ধের। কাজ সেরে গ্যাস লাইটার পকেটে পুরলেন তিনি। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমিও যাব।'

বিস্মিত হল মাসুদ রানা। 'কোথায়?'

'পেট্রলিঙে।'

সবাই মিলে হাজার বুঝিয়েও নিরস্ত করতে পারল না ওরা বুড়োকে। তাঁর এক কথা। 'আমি যাবোই।'

শেষে বাধ্য হয়ে প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয়েছে রানাকে। ঝাড়া একটি ঘন্টা ব্রিফ করেছে ও সবাইকে। তারপরও খুঁতখুঁতে ভাব খানিকটা রয়েই গেছে মনে। মনে হচ্ছে কোনটা হয়ত বলা হয়নি। হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে কোনটা। অমুক ব্যাপারটা আরেকটু খোলাখুলি আলোচনা করলে হয়ত বুঝতে সুবিধে হত সবার।

বাঁ হাতের অবস্থা বর্তমানে কিছুটা ভাল, তবে দেহে বল পাচ্ছে না রানা। সবচেয়ে বেশি কাহিল করেছে ওকে রক্তহীনতা এবং ঘুমের অভাব। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। চোখ লাল। নিচে গাঢ় কালির ছোপ। থেকে থেকে লম্বা

হাই তুলছে ও।

ব্রিজ পেরিয়ে এসে মিররে চোখ রাখল রানা। একটা ভলগা দেখা যাচ্ছে পিছনে। ওটাকে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ব্রাঞ্চ রোডের সন্ধানে। কিন্তু তার দরকার পড়ল না। তীর গতিতে ওকে পাশ কাটাল ভলগা, এগিয়ে চলল ওকে পিছনে ফেলে। ক্রমেই ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগল দুটো গাড়ির। রানাও গতি বাড়াল এবার।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল নাকবোঁচা, কামেনস্‌সিকি স্ট্রীট জংশনে পৌঁছে ধরে ফেলল। কিন্তু গতি কমাতে বাধ্য হল রানা সঙ্গে সঙ্গে। সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে মেট্রো স্টেশনের কাছে। জ্যাম লেগে গেছে। একটা মস্কভিচ-কাত হয়ে পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। রেডিয়েটর দিয়ে গরম নোংরা পানি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। উল্টোদিক থেকে আরেকটা সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল রানা।

রাস্তা ভিজে আছে, বেশি গতি তোলা সম্ভব হচ্ছে না। সামনে যেমন নজর রাখছে রানা, তেমনি পিছনেও। বলা যায় না, পিছন থেকেও আসতে পারে যিল।

'জি-জর্জ···সামোটকনায়ার পশ্চিম দিকে চলেছি। এইমাত্র সার্কাস বিল্ডিং পেরিয়ে এসেছি।' ওটা রবিন। বুড়োর কাছাকাছি আছে ছেলেটি। ওর সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে প্লানেটরিয়ামের কাছাকাছি কোথাও আছেন তিনি।

'কলিং জি-জর্জ। রিপিট সিগন্যাল।'

রেডিও সঙ্কেত একেক সময় একেক রকম। হঠাৎ করে জোরাল হচ্ছে, আবার মিইয়ে পড়ছে। শহরকেন্দ্রে অসংখ্য আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের নির্মাণ কাজ চলছে। ওগুলোর লোহার কাঠামো এর কারণ। রিপিট করতে আরম্ভ করেছে রবিন, কিন্তু এবার শোনা গেল না কিছুই।

৫.৪৩

নিজের সেট তুলে নিল মাসুদ রানা। 'এ-অ্যাবেল···উত্তরে যাচ্ছি নারোদনায়া ধরে। হোটেল কোটেলনিসেসকায়া বাঁয়ে, পিছনে রেখে এগোচ্ছি। এফ-ফ্রেডি কোথায়, সাড়া নেই কেন?' ওটা রাহাত খানের সাঙ্কেতিক নাম।

'এফ-ফ্রেডিকে ডাকছি। অবস্থান জানান।'

উত্তর নেই। ব্যাপার কি? ভুরু কোঁচকাল রানা, ওয়াকি-টকি সেটটা ঠিক আছে তো তাঁর। নাকি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছেন? মিলিশিয়া বা পুলিস ধরে নামিয়ে নিয়ে যায়নি তো?

৫.৫৯

ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল কলজে, আঁতকে উঠল রানা। ওর একশো গজ সামনেই একটা কালো লিমুজিন। সেটটা নামিয়ে রেখেছিল, থাবা মেরে তুলে নিল আবার। কিন্তু কি ভেবে মেসেজ পাঠানো বন্ধ রাখল। চইকা লিমুজিনও হতে পারে ওটা। নিশ্চিত হতে হবে আগে। পবেদার গতি বাড়িয়ে দিল ও। সামনের গাড়িগুলোকে একের পর এক ওভারটেক করে এগিয়ে চলল। শক্ত, জমাট বরফের ওপর দিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে ছুটছে খুদে

গাড়িটা।

ঝাঁকির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাফাচ্ছে রানাও। মাঝে মাঝে নিচু ছাতে ঠুকে যাচ্ছে মাথা। ব্রেক পেডালে পা রেখে খুব সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। একচুল এদিক ওদিক হলেই উল্টে যাবে পবেদা। অন্যসব গাড়ির ধমক উপেক্ষা করে গাড়িটার বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। ডানদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে তখন ওটা।

বাঁক নিতেই নিশ্চিত হল রানা। চইকা লিমুজিন-ই, যিল নয়। গতি কমাল ও পবেদার। সামনে লাল সঙ্কেত দেখে দাঁড় করিয়ে ফেলল তিন-চারটে গাড়ির পিছনে। উদ্বিগ্ন চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

৬.১৫

সবগুলো রেডিও নীরব এ মুহূর্তে। কেউ কথা বলছে না। ওদিকে ঘনিয়ে আসছে সময়, আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। হঠাৎ করেই ঘামতে শুরু করল মাসুদ রানা। জামান শেখ একজন প্রফেশন্যাল, একজন এক্সপার্ট। তাকে বাধা দিতে পারবে ওরা? এতক্ষণে কি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট? তাঁর মোটর শোভাযাত্রা রওনা হয়ে গেছে ক্রেমলিনের গ্র্যান্ড প্যালেসের উদ্দেশে?

দুই বগলের তলা দিয়ে, লোমশ বুক বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে ঘাম। নিজের অজান্তেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল রানার। গরম লাগছে খুব। তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা যেন 'চড়াৎ' করে থাপ্পড় মেরে বসল গালে। ফাঁক দিয়ে দুই এক কণা তুষার ঢুকে পড়ল ভেতরে। আজেবাজে চিন্তা ক্রমেই চেপে বসছে মনের মধ্যে।

যেখানেই থাকুক জামান শেখ, সে-ও নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গেছে যিল নিয়ে। হিপনোটিক সাজেশন এবং ইঞ্জেকশন ওর স্মৃতি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু প্রতিভা কেড়ে নিতে পারেনি। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে মোসাদের কূটবুদ্ধি। এবং জামান শেখ হাইলি ট্রেইনড্ এসপিওনাজ এজেন্ট, ও ভালই জানে কি করতে হবে ওকে।

বিশেষ একটা বিকার চালিত করছে তার অবচেতন মনকে, অতএব যে কোন মূল্যে ও যে সফল হওয়ার চেষ্টা করবেই, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির অ্যাসাসিনেশনের ঘটনা লেখা আছে, হাজারো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও তাদের রক্ষা করতে পারেনি। জামানও আরেকবার ঘটাতে চলেছে সেই একই কাজ--নতুন কিছু নয়।

ক্রেমলিন হাতের বাঁয়ে রেখে অন্যান্য সবার মত গোল হয়ে ঘুরছে মাসুদ রানা। বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে দূরের আলোকিত সোনালী গম্বুজগুলোর দিকে। বিদেশী অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত ক্রেমলিন। কিন্তু তারপর? তারপর যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটতে চলেছে তাতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে তার?

ট্রাফিক আরও কমে গেছে। এতে সুবিধেই হয়েছে বেশ। একযোগে

বেশি গাড়ির ওপর নজর রাখার প্রয়োজন পড়ছে না। কোটের বুক পকেটে ওপরমুখো করে রাখা সিরিঞ্জটা অনুভব করে দেখল হাতে চেপে। অ্যান্টিডোট ভরে এনেছে রানা ওতে। যদিও কাজ কতটা হবে জানে না।

ওষুধটা হস্তান্তর করার সময় প্রফেসর প্রলেকভ রাহাত খানকে বলে দিয়েছেন যে এতে কাজ আদৌ হবে কি না, হলে কতটা হবে, তিনি নিজেও জানেন না। ওষুধটা সবে আবিষ্কার করেছেন তিনি, ভালমত পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি।

৬·১৮

'এফ-ফ্রেডি···আমার সেটে খানিকটা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। সরি।'

যাক! হাঁফ ছাড়ল মাসুদ রানা। ভাবিয়ে তুলেছিল ওকে বুড়ো। পরক্ষণেই রেডিওর আর্ত চিৎকারে ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

'ডি-ডোনাল্ড···যি···যি···একটা যিল দেখতে পেয়েছি এইমাত্র!' ডি-ডোনাল্ড টিলসন। উত্তেজনায় সপ্তমে চড়ে গেছে তার গলা।

খাবলা মেরে নিজের সেটটা তুলে আনল রানা মুখের কাছে। 'এ-অ্যাবেল···ওটার লোকেশন! লোকেশন বলো!'

'উলজানভস্কায়া দিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছে!' মনে হল যেন কেঁদেই ফেলেছে টিলসন। 'আমার সামনে ছিল। লাল সিগন্যাল পার হয়ে গেল এইমাত্র···আমি আটকে গেছি।'

দশ

হায় হায় করে উঠল মাসুদ রানা। এই ব্যাপারটা প্ল্যান করার সময় একবারও কেন মনে পড়ল না? কেন ভাবল না লাল সিগন্যালে যিল লিমুজিন আটকায় না? কি করা যায় এখন?

'ওটার নম্বর কত?'

'দেখতে পাইনি। আমার বেশ কিছুটা সামনে দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে ওটা।'

নিজেরই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল রানার গলা ছেড়ে। নিষ্ফল আক্রোশে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কারণ ও নিজেও আটকে গেছে আরেক ধরনের ফাঁদে। উলজানভস্কায়া একটু আগেই পিছনে ফেলে এসেছে রানা। যত বড় প্রয়োজনই পড়ুক, এখন আর ঘোরার পথ নেই। সামনের টার্নিং পয়েন্ট পর্যন্ত যেতেই হবে ওকে ঘুরতে হলে। অন্যথা হলেই পুলিসের খাওয়া খাওয়ার ভয় আছে।

'ওটার সঙ্গে কোন এসকর্ট আছে?' তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম আঁচড়ে

নিয়ে আঙুলটা ঝাড়া দিল মাসুদ রানা।

'না, নেই। এসকর্ট নেই।'

'কীপ ওয়াচিং। আমি যাচ্ছি।' এক্সিলারেটর পাটাতনের সঙ্গে ঠেসে ধরল ও। শ'খানেক গজ সামনে একটা টার্নিং পয়েন্ট আছে, ঘুরতে ঘুরতে মুখস্থ হয়ে গেছে। ওটা হয়ে ঘুরে আসতে হবে। গোঁয়ারের মত তুমুল গতিতে ছুটছে পবেদা ঝাঁকি খেতে খেতে। ওয়াকি-টকি ফেলে দুহাতে স্টিয়ারিঙ হুইল জড়িয়ে ধরে আছে মাসুদ রানা। দেহ ঝুঁকে আছে সামনের দিকে।

মুহূর্তের জন্যেও সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না। দড়াম দড়াম করে আছাড় খাচ্ছে পবেদা সেকেন্ডে সেকেন্ডে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাফাচ্ছে রানাও। নিচু ছাতে ঠাস্ ঠাস্ বাড়ি খাচ্ছে চাঁদি। মনে হল যেন সমতল হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট সরে গেছে দুপাশে, ঘেয়ো কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রানার।

যতটা পারা যায় ঘাড় কুঁজো করে বসার চেষ্টা করল ও। তাতে আরেক বিপদ দেখা দিল। হুইলের সঙ্গে থুতনির পর পর কয়েকটা বেমক্কা সংঘর্ষ ঘটল। ঘিলু নড়ে গেল যেন ভেতরে। সেই সঙ্গে ঘাড় এবং গালের ক্ষত দুটোয় নতুন করে তীব্র ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেল। সারাদেহে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল যন্ত্রণা।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সহ্য করে নিল মাসুদ রানা। তিন-চারটে গাড়ি ছিল সামনে। ট্রাফিকের চাপ নেই, কাজেই তাদেরও চলায় কোন তাড়া নেই। সাঁই সাঁই করে তাদের পাশ কাটাল রানা। টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছে বাঁক নিল অত্যন্ত বিপজ্জনক ভঙ্গিতে।

দমকা বাতাসের মত ঘুরে গেল পবেদা স্কিড্ করে। অন্য সময় হলে কোনমতেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত না। ঘুরেই ছুটল রানা উল্টোদিকে। একটা করে সেকেন্ড পার হচ্ছে, সেই সঙ্গে একটু একটু করে বাড়ছে হৃৎপিণ্ডের গতি। আবার সেটটা তুলে নিল রানা। 'এ-অ্যাবেল টু ডি-ডোনাল্ড, স্পীড কিরকম ছিলের? আমি টার্ন নিয়েছি। কার্ল মার্কস উলিসা দিয়ে কোনাকুনি গেলে সোলাঙকা ইন্টারসেকশনে ধরতে পারব ওটাকে?'

'পারবে!' রুদ্ধশ্বাসে বলল টিলসন। 'বোধহয়! বাট্ হারি আপ, ফর গড'স সেক!'

কামানের গোলার মত ইন্টারসেকশনের দিকে ছুটছে খুদে পবেদা। রাস্তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রানার। যথাসম্ভব শক্ত বরফের সঙ্গে টায়ারের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিপদ ঘটল নরম বরফের তরফ থেকেই। দুটো ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে মুহূর্তখানেকের জন্য রাস্তার ওপর থেকে সরে গিয়েছিল নজর। ঝপ্ করে বসে পড়ল পবেদা পিছনের দুই চাকা আটকে গেছে দেড় ফুট উঁচু নরম বরফের ভেতর।

আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল রানার চেহারা। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে সারা মুখ। দম ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পুরো চেপে ধরল ও এক্সিলারেটর। কাজ হল না, দু তিন ইঞ্চি এগিয়ে আরও আটকে গেল চাকা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কয়েকবার সামনে পিছনে করল পবেদা, তারপর অনড় হয়ে গেল। গোঁ-ও-ও, গোঁ-ও-ও আওয়াজ তুলছে অক্ষম এঞ্জিন।

ঝট্ করে ব্যাক গিয়ার দিল মাসুদ রানা। এক্সিলারেটর চাপতেই কাজ হল এবার। পিছিয়ে এল গাড়ি। পিছন থেকে ধমকে উঠল একটা হর্ন—একটা ট্যাক্সি। তাকাল না রানা। সাঁ করে গাড়িটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়েই ছুটল তুষারের স্তূপের পাশ কাটিয়ে।

আবার ওয়াকি-টকি তুলল রানা। 'অল স্টেশনস্···বী কেয়ারফুল, আমি যিলের পিছু নিয়েছি। কিন্তু এখনও চোখে পড়েনি। সতর্ক থাকো সবাই। যার চোখে পড়বে, সাথে সাথে জানাবে আমাকে। পশ্চিমে যাচ্ছে ওটা, "কে"-র দিকে। উলজানভস্কায়া ছেড়ে বুলেভার্ড রিঙের দিকে। দেখা পেলে সামনে গিয়ে গতি কমাতে বাধ্য করবে শুধু, আর কিছু না। কুইক! প্যাটার্ন ভাঙো, সবাই ছোটো! রিপিট, সবাই ছোটো পশ্চিমে।'

হাঁ-হাঁ করে ছুটছে পবেদা। পথের দুপাশে বড় বড় সবুজ গাছ লোহারঙা আকাশের পটভূমিতে মাথায় বরফের বোঝা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না একটুও-বাতাস নেই। কার্ল মার্কস উলিসায় সেঁধিয়ে গেল রানা 'সাঁৎ' করে। মনে মনে কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ দিল হাজারবার। এরমধ্যেই এ পথে বালু ছড়ানো হয়ে গেছে—ফুল স্পীডে ছুটতে পারছে ও নিশ্চিন্তে।

সামনের ইনার বুলেভার্ডের সিগন্যাল পয়েন্টে লাল সঙ্কেত দেখে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল ও। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। পয়েন্টে দাঁড়ানো ওভারকোটমোড়া ট্রাফিক পুলিসটির দিকে এক পলক তাকাল মাসুদ রানা। ওর দিকেই চেয়ে আছে। পাত্তা দিল না রানা, না তাকে, না তার সিগন্যালকে। হেডলাইট হাই করে বিদ্যুৎবেগে পয়েন্ট পেরিয়ে গেল কলা দেখিয়ে।

শেষ মুহূর্তে পুলিসটিও সম্ভবত টের পেয়ে গিয়েছিল ওর মনোভাব, তাই আগেভাগেই নোটবই বের করার জন্যে পকেটে হাত ভরে দিয়েছিল। টুকে রাখবে পবেদার নম্বর। মুচকে হাসল রানা। পথে নামার আগে সবগুলো গাড়ির নম্বর প্লেটের ওপর কারিগরি ফলিয়েছিল রবিন। চাকুর ডগা দিয়ে ঘষে ঘষে এমন অবস্থা করেছে যে নম্বর থাকা সত্ত্বেও লেটারিঙ বা সংখ্যা ঠিকমত বুঝতেই পারবে না কেউ। কোনটার লেজের দিক নেই, কোনটার মাথা নেই, কোনটার পেট নেই।

পিছন থেকে টানা হুইস্‌ল-এর আওয়াজ শুনল রানা। মিয়া ভাই, মনে মনে আবেদন জানাল ও, দোহাই লাগে, মোবাইল পেট্রল ডেকে বসিস্‌নে। যিল এতক্ষণে নিশ্চয়ই উত্‌জিনস্কি প্রস্‌পেক্টে পৌঁছে গেছে, উত্তর পুবে মুখ ঘুরিয়ে সোলাঙ্কা ইন্টারসেকশনের মেজর ফর্কের দিকে এগোচ্ছে। সোলাঙ্কাই মাসুদ রানার একমাত্র ভরসা এখন।

একমাত্র ওখানেই যিলটার পথরোধ করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, যদি সময়মত পৌঁছানো সম্ভব হয়। নইলে বিপদ। বড় রাস্তায় উঠে আবারও একটার পর একটা লাল সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে এগোতে থাকবে জামান শেখ। রানার সে

পথ নেই। তেমন কিছু করতে গেলেই পেট্রল কারের তাড়া খেতে হবে। আসল উদ্দেশ্যই যাবে বানচাল হয়ে।

বড় রাস্তার ওরা ইনার বুলেভার্ডের পুলিসটির মত ঠুঁটো জগন্নাথ নয়।

৬·২০

'এ-অ্যাবেল···লোকেশন···আমি এখন পদকোভাজেভস্কি ডানে রেখে এগোচ্ছি,' বলল রানা। 'অনর্থক রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করবে না কেউ। কারও চোখে পড়েছে গাড়িটা?'

কেউ কোন জবাব দিল না।

'অ্যাকনলেজড্।'

হঠাৎ করেই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল রানা। গ্যাস পেডাল ছেড়ে চট্ করে পা রাখল ব্রেকে। ওর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ সামনে পেভমেন্ট থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এইমাত্র ট্যাক্সি লেনের উদ্দেশ্যে বাঁক নিয়েছে একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভারের বাচ্চা প্রয়োজনের অনেক বেশি জায়গা নিয়ে, অনেক বেশি কোনাকুনি ভাবে যেতে চাইছে তার বরাদ্দ লেনে।

হর্ন বাজিয়ে বা ব্রেক চেপে সংঘর্ষ এড়ানর সময় চলে গেছে বুঝতে পেরে সে চেষ্টা বাদ দিল রানা। কোনমতে খানিকটা ঘুরিয়ে নেয়া গেল পবেদা। সামনের ফেন্ডার মাঝারি শক্তিতে গুঁতো খেল ট্যাক্সির পেটে। বিশ্রী একটা আওয়াজ উঠল, প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল পবেদা। সামনে থেকে সরে গেল ট্যাক্সি। পিছনে তাকাল না রানা, সময় নেই। ভিউ মিররে চোখ রাখল। ধাক্কা খেয়ে পেভমেন্টের দিকে ছুটে গেল ট্যাক্সি, আছড়ে পড়ল ওটার ওপর। তবে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে উল্টে পড়ার হাত থেকে।

৬·২২

'এ-অ্যাবেল···লোকেশন···ইভানোভস্কি ডানে রেখে সোলাঙ্কা ফর্কের দিকে এগোচ্ছি। গাড়িটা আর কারও চোখে পড়েছে?'

নীরবতা।

'অ্যাকনলেজড।'

অপ্রত্যাশিতভাবে কথা বলে উঠলেন রাহাত খান, এফ-ফ্রেডি। 'অ্যাটেনশন, অল আদার স্টেশনস্···অ্যাটেনশন অল আদার স্টেশনস্। সবাই এ-অ্যাবেলকে অনুসরণ করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোলাঙ্কা ফর্কে পৌঁছার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে ট্রাফিক সিগন্যাল অগ্রাহ্য করো।'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। ঘোষণাটা আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ও নিজেই প্রচার করার কথা ভাবছিল। কিন্তু ভাবনার দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছেন ওকে বৃদ্ধ। রানার সবচেয়ে কাছে রয়েছে সম্ভবত ই-এডওয়ার্ড-আরমান। ওর বাঁ দিক থেকে পদকোলোকলনি বুলেভার্ড হয়ে রিঙ রোডে পড়েছে সে রানা রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখার ঘোষণা দেয়ার অল্প আগে। ওদিকে টিলসন রয়েছে ঠিক তার উল্টোদিকে, চকালোভায়। ইন্টারসেকশনে ফিরে আসার জন্যে একটা বেআইনি ইউ-টার্ন নিয়েছিল সে।

ব্যাপারটা কিভাবে ম্যানেজ করল টিলসন সে-ই জানে। এ সময় এ ধরনের বেআইনী টার্নিং ট্রাফিক পুলিসের চোখে পড়তে বাধ্য, কারণ ওটা ব্যস্ত এলাকা। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পড়েনি। পড়লে আর যা-ই হোক, অন্তত পেট্রল কারের সাইরেন অবশ্যই কানে আসত।

৬·২৩

গরম রক্তের ছোটাছুটি টের পাচ্ছে রানা দেহের ভেতর। শোঁ-শোঁ আওয়াজ করছে কান। প্রচণ্ড উত্তেজনায় মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারবে ওরা যিলটিকে। সম্ভবত। ডান হাতে আরেকবার সিরিঞ্জটার স্পর্শ নিল মাসুদ রানা। জামান শেখের মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

এ মুহূর্তে জামানের মনের অবস্থা কিরকম? মিশন সফল করে তোলার জন্যে সে-ও নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে আছে ওদের মত? জামান যদি গাড়ি থামাতে সম্মত না হয়, কি করবে তখন রানা? কি করে বাধা দেবে? গুলি করে আহত করার চেষ্টা করবে? পবেদা দিয়ে গুঁতো মেরে বসলে কেমন হয় যিলের নাকে?

কম্পোজিশন সি-থ্রী, ভাবল রানা, এমনিতে খুব একটা স্পর্শকাতর নয়। কিন্তু জোরালো ধাক্কা লাগলে ডিটোনেশন ডিভাইস অ্যাকটিভেট হয়ে যেতে পারে। নাহ, অমন কাজ করা যাবে না। বরং ওকে যিল দাঁড় করাতে বাধ্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬·২৪

'এ-অ্যাবেল···লোকেশন···সোলাঙ্কা ইন্টারসেকশনে পৌঁছেছি এইমাত্র-স্ট্যাণ্ড বাই।'

দূর থেকে একটা সাইরেনের আওয়াজ আসছে। কাউকে ধাওয়া করছে পেট্রল কার। কাকে, ওকে না তো? ইনার বুলেভার্ডের পুলিসটি কি ওর অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে নিকটস্থ পোস্টে? নাকি ট্যাক্সি ড্রাইভার? নাকি দলের আর কেউ কোন অকাজ করতে গিয়ে চোখে পড়ে গেছে ওদের? অথবা আর কোথাও কোন দুর্ঘটনা? তাই হবে, নিজেকে প্রবোধ দিল মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই এর সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই।

পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে সোলাঙ্কা ফর্ক ধরে ছুটছে পবেদা। যদি সময় মত পৌঁছে থেকে থাকে রানা, তাহলে এখন যে কোন মুহূর্তে যিলের দেখা পাবে। যদি না এরমধ্যেই ফর্ক রোড অতিক্রম করে ওটা আওতার বাইরে চলে গিয়ে থাকে। এ মুহূর্তে ওর ডানে রয়েছে আলোয় আলোয় ঝলমলে ক্রেমলিন। চট্ করে এক পলক সেদিকে তাকাল রানা।

৬·২৫

একটু একটু করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে আবার ও। স্নায়ুর ক্রমাগত চাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। গাড়ি চালাতে গিয়ে চাপ পড়ছে বাঁ হাতে, ফলে কাঁধের ব্যথা বেড়ে গেছে। দপ্ দপ্ করছে ক্ষতস্থান।

'এ-অ্যাবেল···লোকেশন···সোলাঙ্কা অতিক্রম করছি। এখনও দেখা

পাইনি ওটার।'

ওর সামনে, একশ গজ দূরে একটা পঞ্চান্ন নম্বর দোতলা বাস এবং একটা ট্যাক্সি ছাড়া আর কোন যানবাহন চোখে পড়ছে না। এতবড় কসমোপলিটান শহরের অন্যতম প্রধান সড়কের এই অবস্থা হতে পারে ভর সন্ধেয় কল্পনাই করা যায় না।

৬·২৬

মরীচিকার পিছনে ঘুরে মরছে ওরা? আশঙ্কাটা মন থেকে তাড়াতে পারছে না রানা কিছুতেই। তা না হলে কোথায় গেল যিল? এদিকটায় এখনও বালু ছড়ানো হয়নি রাস্তায়। এদিকে কর্পোরেশনের নজর কেবল যে পথে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ক্রেমলিনে পৌঁছুবেন, সেটার ওপর। যদি এমন হত একা তিনি-ই জামানের লক্ষ্য, তাহলে এভাবে ছোটাছুটি করে হয়রান হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না মোটেই, ভাবতে লাগল রানা।

কোন পাবলিক কল বুদ থেকে পরিচয় গোপন রেখে কেজিবি-কে একটা টেলিফোন করে দিলেই সতর্ক হয়ে যেত ওরা। শেষ মুহূর্তে হলেও বদলে দিতে পারত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের হোটেল-ক্রেমলিন রুট। অথবা তা না করে রানা ওর দলবল নিয়ে নিজেই সামাল দেয়ার চেষ্টা করতে পারত সম্ভাব্য হামলা।

অবশ্য প্রথম কাজটা কখনই করত না মাসুদ রানা। ওতে বরং সবার বিপদ হত। ফোন পেয়ে গোপনে রুট পরিবর্তন করত হয়ত কেজিবি, সেই সঙ্গে একটা নকল মোটর শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা করত পূর্ব নির্ধারিত রুটে, যাতে ব্যাপারটার সত্যমিথ্যা যাচাই করা যায়। সত্যি হলে পাকড়াও করা যায় দুষ্কৃতকারীকে। সেক্ষেত্রে জামান ধরা পড়লে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ত বাংলাদেশ।

এগারো

৬.২৭

অহেতুক চিন্তা দূর করে দিল রানা মাথা থেকে। কি হতে পারত আর কি হতে পারত না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় এটা। সামনের দিকে মন এবং নজর কেন্দ্রীভূত করল ও। মুখের সামনে ধরে রেখেছে আলট্রা ভক্স ওয়াকি-টকি। 'এ-অ্যাবেল কলিং অল আদার স্টেশনস্। এখন পর্যন্ত দেখা পাইনি যিলের। আর কোন রুট দিয়ে···।' কথা আটকে গেল রানার।

বলতে বলতে ভিউ মিররে চোখ পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল যেন। তীব্র একটা ঝাঁকি খেল সর্বাঙ্গ। মিররে ঝাপসা বিশাল একটা ছায়া স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে সাড়া দিল না মন। দূর! ভাবল মাসুদ রানা, এ হতেই পারে না। ভুল দেখেছে ও। অতি দুর্বলতার কারণে উল্টোপাল্টা দেখতে

আরম্ভ করেছে চোখ।

চোখ বুজে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল রানা কয়েকবার। আবার তাকাল। নাহ্! আছে ছায়াটা! পালিশ করা অতিকায় বপুটা ক্ষণে ক্ষণে ঝিকিয়ে উঠছে রাস্তার আলোয়। অনিয়মিত ছন্দে দুলছে, সাবলীলগতিতে এগিয়ে আসছে এক যিল লিমুজিন। নিঃসঙ্গ। এসকর্টহীন।

দীর্ঘ সময় ধরে সর্বান্তকরণে প্রার্থিত বস্তুটিকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চোখে পড়তে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল রানা, মুখের সামনে যন্ত্র ধরে থাকা হাতটা নেমে গেছে কোলের ওপর। সংবিৎ ফিরতে চট্ করে তুলল আবার। থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে সারা দেহ। গরম রক্তের উন্মত্ত ছোটাছুটি শিরায় শিরায়। ভাপ বেরোচ্ছে কান দিয়ে।

এ মুহূর্তের করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে অমূল্য কয়েক সেকেন্ড সময় ব্যয় হয়ে গেল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মাঝখানের ব্যবধান বেশ কিছুটা কমে গেছে দুটো গাড়ির। বড় চাকার দ্রুতগতি যিল দেখতে দেখতে পুরো মিরর দখল করে নিয়েছে। রানার বাঁ দিকে চইকা লেনে রয়েছে গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে দীর্ঘ একটা ছায়া বসা। মাথায় পীক ক্যাপ। পরনেও নিশ্চয়ই অফিশিয়াল শোফারের ইউনিফর্ম আছে। গাড়ির দুলুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওপর-নিচ করছে ছায়াটা। জামান শেখ? হাজার চেষ্টা করেও চেহারাটা চেনা গেল না।

'কারেকশন···রিপিট, কারেকশন। দেখতে পেয়েছি ওটাকে। দেখতে পেয়েছি আমি···ওটাকে।' স্টিয়ারিঙ ধরা বাঁ হাতের কবজি সামান্য ঘুরিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। ছটা সাতাশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড। যে কারণেই হোক সামান্য দেরি করে ফেলেছে জামান শেখ। এখান থেকে সোলাঙ্কা ফর্কের মাথায়, রেজিনা উলিসায় পৌঁছুতে কম করেও দুমিনিট লাগবে। ওখান থেকে তিন মিনিটের পথ গ্র্যান্ড প্যালেস। তাই বেশ তাড়াহুড়োয় আছে যিল।

রাহাত খানের গলা শুনতে পেল মাসুদ রানা। ব্যাড স্ট্যাটিকের জন্যে আওয়াজটা ক্ষীণ শোনাল, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বভাবসুলভ ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ। পরিষ্কার বাংলায় বললেন তিনি, 'আবার বলো। আবার বলো।'

'যিলটা দেখতে পেয়েছি আমি। আমার পঞ্চাশ গজ পিছনে রয়েছে। স্পীড খুব ফাস্ট। কোন চিন্তা নেই, আমি সামলাচ্ছি ওকে। কাছে আসার দরকার নেই কারও, দূরে থাকুন সবাই। কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। ওটা একটা জীবন্ত বোমা। ওভার।'

প্রত্যেকে নীরবে অ্যাকনলেজ করল, মেনে নিল রানার নির্দেশ। কিন্তু রাহাত খান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। ইনার বুলেভার্ডের মাঝামাঝি ছিলেন তিনি, ভদ্র গতিতে এগোচ্ছিলেন সোলাঙ্কা ফর্কের দিকে। আচমকা লাফ দিল তাঁর ছদ্ম নামে ভাড়া করা মস্কভিচ। সামনের লাল সঙ্কেতটা দেখেও পাত্তা দিলেন না বৃদ্ধ। ছুটলেন তীরবেগে। খানিক আগে রানাও একই অকাজ করে গেছে এখানে।

তবে এবার কোন বাঁশী বেজে উঠল না পিছনে। তলপেটের অসহ্য চাপে

ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল বেচারী ট্রাফিক পুলিসটি। রাস্তা ট্রাফিক শূন্য, তাছাড়া অন্যান্য দিনের মত পেট্রল কারেরও তেমন আনাগোনা নেই আজ এদিকে, তাই রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে ভারমুক্ত হওয়ার জন্যে। এই সময় দ্বিতীয় দফা আইনভঙ্গের বিষয়টি ঘটল চোখের সামনে। অভ্যেসবশে তাড়াতাড়ি বাঁশীটা তুলতে গিয়েও থেমে গেল সে। লাভ নেই, ভাবল সে। তারচেয়ে বরং হাতের কাজটা শেষ করা যাক।

ঘাড় ঘুরিয়ে ধাবমান গাড়িটার দিকে তাকাল সে। পরক্ষণেই কুঁচকে উঠল ভুরু। কি ব্যাপার! এটার নম্বর প্লেটটাও দেখছি আগেরটার মত ঘষা। চিন্তায় পড়ে গেল লোকটা। একই ভাবে নিয়মভঙ্গ করেছে গাড়ি দুটো এবং দুটোরই নম্বর প্লেট ঘষা। কাজ সেরে ব্যাপারটা রিপোর্ট করল সে কাছের আলেকজান্দারস্কি পার্ক পেট্রল পোস্টে। মুহূর্তে হুলস্থুল পড়ে গেল সেখানে। সোলাঙ্কা ফর্কের দিকে সাঁই সাঁই ছুটল দুটো ভলগা।

আওয়াজটা রানার কানেও পৌঁছল। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। বাসটা ওভারটেক করল ও দ্রুত। চোখ সেঁটে রয়েছে ভিউ মিররে। যিলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অনেক বাড়াতে হয়েছে পবেদার গতি। ওটা আরেকটু এগোতে কার লেন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। কোনরকম সঙ্কেত না দিয়েই আচমকা উঠে এল চইকা লেনে। যিল তখন মাত্র দশ গজ পিছনে।

হর্ন বাজিয়ে ধমক লাগাল লিমুজিন। তার লেন ছেড়ে সরে পড়তে বলছে পবেদাকে। কিন্তু তেমনি থাকল ওটা, পথ ছেড়ে দেয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পথম থেকেই খেয়াল করেছে রানা যিলের হেডলাইট ডীপ করা। অথচ সন্ধের পর এদেশে যিল এবং চইকার লাইট হাই করে চলার নিয়ম। কারণ তাতে দূর থেকে তাদের জোরালো আলো চোখে পড়বে ট্রাফিক পুলিসের এবং সময় থাকতে তাদের জন্যে পথ তৈরি রাখতে পারবে তারা।

কিন্তু এ করছে উল্টোটা, হর্ন বাজাচ্ছে। ওটার ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটির ছায়া দেখতে পাচ্ছে রানা আয়নায়, খুব আবছা ভাবে। কে ওটা? জামান তো? না আর কেউ? আবার হর্ন বাজাল যিল। আর মাত্র শ'খানেক গজ দূরে আছে ইন্টারসেকশন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, এখনই বাধা দেয়া উচিত ওকে। গতি কমাতে শুরু করল রানা।

পিছনে তীরবেগে ছুটে আসছেন রাহাত খান। যিল এবং পবেদা বড়জোর আর পঞ্চাশ গজ সামনে তাঁর। এই সময় একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। যিলের সামান্য পিছনে, কার লেনে সম্ভবত একটা লাদা এইট হাণ্ড্রেড, ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে। যেন ঠিক করতে পারছে না বর্তমান লেনেই থাকবে, না চইকা লেনে গিয়ে উঠবে।

দু'তিনটে সাইরেনের জোরালো আওয়াজ কানে আসছে। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারে পেট্রল কার, অথচ তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই বৃদ্ধের। লাদার ড্রাইভারটিকে লক্ষ করছেন তিনি নিবিষ্টমনে। লোকটি প্রায়

কুঁজো হয়ে বসে আছে, নিচু ছাতের জন্যে সোজা হয়ে বসতে পারছে না। আরেকবার ডানে-বাঁয়ে করল লাদা, তারপর স্থির হয়ে গেল নিজের লেনে। কেবল গতি আরও বেড়ে গেল। বৃদ্ধ সন্দেহ করলেন হয়ত পবেদার পাশে পৌঁছুতে চাইছে ওটা।

হর্ন বাজাল যিল, সাইড চাইছে রানার কাছে। কিন্তু সাইড তো দিলই না, বরং পবেদার গতি কমতে শুরু করেছে বলে মনে হল বৃদ্ধের। হঠাৎ আঁতকে উঠলেন তিনি। লাদার জানালা গলে একটা হাত বের করে দিয়েছে লোকটা, চকচকে একটা কিছু ধরা সে হাতে।

দেখামাত্রই চিনতে পেরেছেন বৃদ্ধ। ওটা আগ্নেয়াস্ত্র। রিভলভার বা পিস্তল যা-ই হোক, মোটকথা আগ্নেয়াস্ত্র–খেলনা নয়। পলকে চিনে ফেললেন অস্ত্রধারীকেও। ও বোরোডিনস্কি। ফিওদর বোরোডিনস্কি। এখানকার ইহুদী অ্যানার্কিস্টদের নেতা। এর সম্পর্কে আজই শুনেছেন বৃদ্ধ রানার মুখে, দৈহিক বর্ণনা মিলে যাচ্ছে পুরোপুরি।

চট্ করে পাশের সীটে রাখা জিনিসটা তুলে নিলেন রাহাত খান–একটা বেরেটা। সবার অনুরোধ আশ্বাস অগ্রাহ্য করে তিনি যখন যিল অপারেশনে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন আজ দুপুরে, তখন উপায়ান্তর না দেখে রানাই জোগাড় করে দিয়েছিল এটা তাঁর আত্মরক্ষার জন্যে। জিনিসটা কাজে লাগবে ভুলেও ভাবেননি রাহাত খান।

গুলি করল বোরোডিনস্কি। কিন্তু কোন আওয়াজ উঠল না। তার মানে সাইলেন্সার লাগানো আছে। পবেদার পিছনে জানালার একটা কাঁচ চুরমার হয়ে গেল ঝন ঝন শব্দে। এই অপ্রত্যাশিত বিপদ হকচকিয়ে দিল রানাকে। চমকে উঠল ও, সামান্য কেঁপে গেল স্টিয়ারিঙ। চট করে বাঁ দিকে তাকাল রানা। পবেদার পিছনের দরজার কাছেই আরেকটা গাড়ির নাক দেখা যাচ্ছে, সমান তালে এগোচ্ছে যিলকে ওভারটেক করে এসে।

রাহাত খানের মত ও-ও কেবল চেহারার বর্ণনা শুনেছে বোরোডিনস্কির। আবার ঘাড় ঘোরাতেই চোখাচোখি হল লোকটার সঙ্গে। প্রচণ্ড রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার। যিলকে নিরাপদে রেজিনা উলিসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বোরোডিনস্কিকে। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। ঘটনাস্থলের একেবারে কাছে পৌঁছে এ ধরনের বাধা পড়বে ভাবেনি সে।

রানার মত সে-ও রানার চেহারার বর্ণনা জানে, দেখামাত্রই মাসুদ রানাকে চিনে ফেলেছে সে। আবার অস্ত্র তুলল বোরোডিনস্কি, ওদিকে রানার হাতেও দেখা দিয়েছে ওর প্রিয় অস্ত্র, সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট থ্রী এইট ওয়ালথার পি পি কে। চোখের পলকে গুলি করল ও। এরমধ্যেও যিলের ওপর কড়া নজর রেখেছে, ঘন ঘন ভিউ মিররে তাকাচ্ছে গাড়িটা ওকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে কি না দেখার জন্যে।

মিস্ হয়ে গেল গুলিটা। রানাকে অস্ত্র তুলতে দেখেই এক্সিলারেটর থেকে পা তুলে নিয়েছিল বোরোডিনস্কি। ফলে মুহূর্তের জন্যে পিছিয়ে পড়েছিল লাদার

নাক, উইন্ডশীল্ড ঘেঁষে বেরিয়ে গেল গুলিটা। এই সময় অন্য একটা দৃশ্য তাজ্জব করে দিল ওকে। লাদার ওপাশে আরেকটা গাড়ি চোখে পড়ল, একটা মস্কভিচ ওটা।

কে চালাচ্ছে ওটা বোঝা গেল না। ওদের মধ্যে তিনজনের আছে ওই মডেল–রাহাত খান, টিলসন এবং রবিনের। তাদের ভেতর কেউ? না বোরোডিনস্কির সঙ্গীরা? এ নিয়ে আর চিন্তা করার সময় পেল না ও খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। পিছিয়ে গিয়েই আবার গতি বাড়াল লাদা, দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত বোরোডিনস্কি।

কিন্তু তার আগেই ট্রিগার টানল মাসুদ রানা। এটাও কোথাও লাগল না। গুলি ছোঁড়ার আগ মুহূর্তে পবেদা সামান্য ঝাঁকি খেয়ে ওঠায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

'ঠুশ্!'

মাকড়সার জালের মত শত সহস্র ফাটলে ভরে গেল রানার সামনের উইন্ডশীল্ড। মুহূর্তে সামনের সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। পাশ থেকে সতর্কতার সঙ্গে বোরোডিনস্কির বড়সড় তরমুজের মত মাথার সামান্য নিচে তাক করলেন রাহাত খান। বহু বছর ধরে এসবে অভ্যস্ত নন, তাই প্রচুর সময় লাগল তাঁর এই সামান্য কাজটুকু করতেই।

তবে ট্রিগার টানতে সময় লাগল না। তৃতীয় গুলি ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত হতে যাচ্ছে বোরোডিনস্কি, হঠাৎ সামনের দিকে তীব্র একটা ঝাঁকি খেল তার মাথাটা। স্টিয়ারিঙ হুইলের সঙ্গে দড়াম করে বাড়ি খেল থুতনি। আর উঠল না সে। দু'হাত ছুটে গেছে হুইল থেকে, হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন সে হুইলে মাথা রেখে। বাঁক নিয়ে পেভমেন্টের দিকে ছুটে গেল নিয়ন্ত্রণহীন লাদা। যে-ই করে থাকুক কাজটা, মনে মনে ধন্যবাদ জানাল তাকে রানা।

সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে গতি আরও কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল মাসুদ রানা। এবার দ্রুত ওয়ালথারের বাঁট দিয়ে ঠুকে কাজ চালাবার মত ছোট একটা ফোকর তৈরি করে নিল উইন্ডশীল্ডের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার তীব্র কামড়ে কুঁকড়ে গেল ও আপনাআপনি। ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল প্রাণপণে। অন্যদিকে মনটাকে ব্যস্ত রাখতে চাইল। পিছনের দিকে তাকাল এক পলক আয়নার মধ্যে দিয়ে। অনেক কাছে এসে পড়েছে যিল।

আরও সতর্ক হয়ে উঠল মাসুদ রানা। কোনমতে যিল ওকে ওভারটেক করতে পারলে সর্বনাশ ঠেকানর আর কোন পথই থাকবে না। পুরো দুই মাইলও নেই এখন ক্রেমলিনের দূরত্ব। রেড স্কয়ারের সেন্ট ব্যাসিলস গির্জার ঝলমলে চুড়ো দেখতে পাচ্ছে রানা। সোজা সামনে রেজিনা উলিসা, এখন যে-কোন মুহূর্তে ওই পথে দেখা দেবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী মোটরগাড়ির শোভাযাত্রা।

পিছনে মরিয়া হয়ে উঠেছে যিল ওকে ওভারটেক করার জন্যে। নাক প্রায় ঠেকিয়ে রেখেছে পবেদার লেজে। টানা হর্ন বাজাচ্ছে। ওটার সামান্য পিছনে

রাহাত খানের মস্কভিচ। এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে অন্যরাও সোলাঙ্কা ফর্কে এসে পড়েছে ততক্ষণে, সবাই ছুটছে সামনে, রেজিনা উলিসার দিকে। ওদিকে সাইরেনের সংখ্যা বেড়ে ছয়-সাতটা হয়েছে। চতুর্দিকে তাদের টানা হুঙ্কার চলছে, এসে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে।

সামনে নিজের গাড়ির বিশাল ছায়া দেখতে পাচ্ছে রানা। হঠাৎ করেই ঘুরে গেল ওটা বাঁ দিকে। অর্থাৎ ডানদিক থেকে ওকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছে যিল। সঙ্গে সঙ্গে ডানে চাপাল রানা, আরও কমিয়ে আনল গতি। পলকে সোজা হল সামনের ছায়াটা, চট করে ঘুরে গেল ডানদিকে-এবার বাঁদিক থেকে ওঠার চেষ্টা করছে লিমুজিন, সেই সঙ্গে ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে।

আবার বাধা দিল মাসুদ রানা, গতি কমিয়ে ত্রিশ কিলোমিটারে নামিয়ে আনতে বাধ্য করল যিলের। ওদিকে আর আধ মাইলও নেই সোলাঙ্কা-রেজিনা ইন্টারসেকশন। কিন্তু ওই পর্যন্ত যেতে দেয়া চলবে না ওটাকে।

অতএব আর ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই থামাতে হবে জামানকে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। পিছনে এখনও টানা হর্ন বাজিয়ে চলেছে সে। গতি কমতে কমতে প্রায় থেমে দাঁড়িয়েছে পবেদা। ঠিক দু গজ পিছনেই রয়েছে লিমুজিন। আচমকা একটা পাশ কাত হয়ে গেল ওটার। বালুর নিচে নরম, আধা জমাট বরফের ওপর পড়েছিল ওপাশটা, ঝপ্ করে দেবে গেছে ভারী গাড়ি।

সুযোগটা চিনতে দেরি হল না। দমকা বাতাসের মত পবেদার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। মাঝখানের ব্যবধানটুকু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে প্রায় উড়ে পেরিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল যিলের ড্রাইভারের দরজা। গিয়ার পাল্টে গাড়ি বরফের ফাঁদ থেকে বের করার চেষ্টা করছিল জামান শেখ, চমকে মুখ তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে একটা হেভিওয়েট পাঞ্চ কষল রানা তার থুতনিতে।

চোখ কপালে উঠল জামান শেখের। পর মুহূর্তে তার বাঁ বাহুতে ঘ্যাঁচ করে সুঁই ঢুকিয়ে দিল রানা। সামান্য দুই দাগ ওষুধ, ঢোকানর সঙ্গে সঙ্গেই পুশ্ হয়ে গেল। আঘাত সামলে নিয়ে নড়ে উঠতে যাচ্ছিল জামান, ডান পা তুলেছিল রানার কুঁচকি সই করে, কিন্তু মাঝপথে আপনাআপনি থেমে গেল পা-টা। কয়েক মুহূর্ত অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বসে থাকল সে একভাবে। তারপর আস্তে করে সীটের ওপর ঢলে পড়ল দেহটা।

'পেরেছ?'

কানের কাছে রাহাত খানের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। আশ্চর্য! ভাবল ও, বুড়ো টিলসন বা রকিন নয়? জ্বি। অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

ঝুঁকে জামানের ঘাড় সোজা করে দিল রানা। সরেছে আঙুল দিয়ে নেড়ে দিল চুল। তারপর হঠাৎ করেই যেন পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হল ও। ঝট্ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। সাইরেনের আওয়াজ আসছে রেজিনা উলিসা থেকে।

উলিসার দক্ষিণ প্রান্তের দিকে তাকাল। দালান কোঠার আড়াল থেকে সাঁ

করে বেরিয়ে এল স্টেটস গার্ডস ডিরেক্টরেটের এক ঝাঁক সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি সি সি সাদা মোটর বাইক। ঢপ্ ঢপ্ ঢপ্ ঢপ্ গম্ভীর আওয়াজ তুলে ছুটছে ক্রেমলিনের দিকে। ওগুলোর পিছনে পর পর দুটো যিল লিমুজিন। তারপর আরেক ঝাঁক বাইক। দেখতে দেখতে ইন্টারসেকশন পেরিয়ে গেল শোভাযাত্রা। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী। ঘড়ি দেখল রানা, ঠিক ছটা আটাশ মিনিট বিশ সেকেন্ড।

হঠাৎ করেই কাঁধের ব্যথাটা বেড়ে গেল ওর।

বারো

ঢাকা। বিসিআই।

সোহেল আহমেদের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। 'তোর মস্কো উপস্থিতির ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল কেজিবি,' বলল সোহেল। 'কর্নেল গরস্কি অবশ্য শেষ পর্যন্ত সত্যিই তোর ব্যাপারটা গোপন করে গিয়েছিল। কিন্তু কার ক্র্যাশে ওরা নিহত হওয়ার পর খবরটা কানে যায় ওদের চীফ, মিখাইলোভিচ সুরায়েভের। এর ব্যাখ্যা চেয়ে অ্যায়সা কড়া নোট পাঠিয়েছিলেন ভদ্রলোক, কি বলব। তখন যদি দেখতি আমাদের বুড়োর চেহারা মোবারক। উফ্! সাফ কথা সুরায়েভের, মাসুদ রানা মস্কোয় কেন, পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাই।'

কফির কাপে চুমুক দিল মাসুদ রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'খুব স্বাভাবিক। বড়রাই বড়দের ব্যাপারে জানতে চায়।'

মুহূর্তে চেহারা বিগড়ে গেল সোহেলের, সঙ্গে মেজাজটাও। 'ওরে আমার বড়রে, শা-লা! তোর কারণে বুড়ো মানুষটার এমন হেনস্তা। ছুটে যেতে হল সেই কোথায়, আবার লম্বা লম্বা কথা। শালা, এক লাথিতে বিষ ঝেড়ে দেব তোমার।'

তেমনি গম্ভীর মাসুদ রানা। কাপ রেখে ধীরে সুস্থে চেয়ার ছাড়ল। 'পারবি তো?' সোহেলের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল ও।

'কি!' দুবার চোখ পিট পিট করল সোহেল। প্রশ্নটির ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে।

'বলছি এক লাথিতে কাজটা সারতে পারবি তো?'

'না হয় আরেকটা অতিরিক্ত লাগবে। ওতে আমি মাইন্ড করব না।'

'ঠিক আছে।' দু হাত মুঠো করে ঘুসি পাকাল মাসুদ রানা। পা বাড়াল সোহেলের উদ্দেশে। 'আমিও মাইন্ড করব না। কিন্তু যদি দুটোর বেশি…,'

তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল সোহেল। 'সাহস দ্যাখ্! শালা কোথায় অন্যায়ের জন্যে মাফ-টাফ প্রার্থনা করবি, তা না করে গুণ্ডামি! দাঁড়া!'

দড়াম করে ঘুসি চালাল রানা সোহেলের পেট সই করে। কিন্তু মারল না

শেষ পর্যন্ত। চট্ করে অন্য হাতের দু আঙুলে ওর নাকের ডগা চেপে ধরল শক্ত করে।

'ওঁরেঁ বাঁবাঁরে···ওঁ রেঁ মাঁরেঁ! ইঁ-ইঁ-ইঁ···।' চেঁচাতে চেঁচাতে খপ্ করে রানার এক কান ধরতে গেল সোহেল, কিন্তু পারল না। 'ছাঁড় শাঁলা, ছাঁড়!'

'সেই সুরায়েভই যে কাল মাসুদ রানাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন বিশেষ দূত মারফত, তা জানিস?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

ব্যথায় চোখে পানি এসে গেছে সোহেলের। বহুকষ্টে মাথা দোলাল ও। 'জাঁনি।'

'ওতে যে মাসুদ রানার কৃতিত্বের জন্যে বুড়ো থেকে নিয়ে বিসিআইয়ের সাধারণ লিফটম্যান পর্যন্ত সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুরায়েভ, জানিস?'

'জাঁনি জাঁনি। আঁরে, সেঁ জন্যেই তোঁ তোঁকে কঁঙগ্রাঁচুলেট করব বলে···'

'পাছায় লাথি মেরে কঙগ্রাচুলেশন?'

'ছিঁ ছিঁ,' জিভ কাটল সোহেল। 'আঁমি কিঁ সঁত্যি সঁত্যি···'

অধিবেশন কতক্ষণ চলত বলা মুশকিল। হঠাৎ করে মুক্তি দিলেন ওদের বিসিআইয়ের কর্ণধার। কি যেন খুশির ব্যাপার ঘটে গেছে। সোহেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। হাতে একটা খোলা চিঠি নিয়ে হাসিমুখে তাঁর এবং সোহেলের রুমের মাঝখানের দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ। দরজাটা পুরোপুরি খোলেনি, চকচকে স্টীলের পাল্লা দুটো এখনও চলছে।

মুহূর্তে মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল বৃদ্ধের। থতমত খেয়ে সামনের দৃশ্যটা দেখতে লাগলেন–সুন্দ উপসুন্দের লড়াই। ততক্ষণে সোহেলও তৃতীয় চেষ্টায় সফল হয়েছে রানার কান পাকড়াও করতে। ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেছেন বৃদ্ধ, কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

এই সময় তাঁর ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। থতমত খেয়ে সোহেলের নাক ছেড়ে দিল ও। চাপাস্বরে সোহেলের উদ্দেশে বলল, 'বুড়ো।'

স্থির হয়ে গেল সোহেল, কান ছাড়েনি রানার। আড়চোখে দরজার দিকে তাকাল একবার। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে 'ইয়াল্লা!' বলেই সাঁৎ করে নামিয়ে নিল হাত। লজ্জায় নাক মুখ লাল হয়ে গেছে দুই শ্রীমানেরই। একই অবস্থা রাহাত খানেরও। তবু যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন রানাকে লক্ষ করে, 'তুমি এখনও এখানে?'

'এখনই যাচ্ছিলাম, স্যার।' আবারও নাক-মুখ গরম হয়ে উঠল রানার।

'থেকে ভালই করেছ। আমি এসেছিলাম সোহেলকে চিঠিটা দিতে। এটার খবর তোমাকে জানাবার কথা বলতে।'

'কিসের চিঠি, স্যার?'

'রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে এসেছে। পড়ে দেখো,' চিঠিটা এমন মুখভঙ্গির সঙ্গে বাড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ যেন এর চেয়ে তুচ্ছ বিষয় আর হতেই

পারে না।

নিল রানা চিঠিটা। এক পলক নজর বুলিয়ে এগিয়ে দিল ওটা সোহেলের দিকে। মাঝের দরজাটা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। চলে গেছেন রাহাত খান। পর পর দু বার চিঠিটা পড়ল সোহেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা। চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে উল্লসিত কণ্ঠে বলল, 'সত্যি, দোস্ত। কি যে আনন্দ লাগছে আমার! যা তা কথা? আমার একমাত্র শ্যালক বীরত্বের জন্যে রাষ্ট্রপতির পদক লাভ করেছে, উ-ফ্!'

এক হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরল সোহেল।

***